কথামৃত — একাদশ পর্ব

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on SriSriRamkrishnakathamrita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষে ভক্তসঙ্গে সুরেন্দ্রভবনে

আজ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা। তারিখ ১৪ই এপ্রিল, ১৮৮৩ রবিবার (পৃঃ ১৭৪)। সুরেন্দ্রের বাড়িতে পূজার আয়োজন হয়েছে। এই উপলক্ষে সুরেন্দ্রের বাড়িতে ঠাকুরের নিমন্ত্রণ। অনেকে এসেছেন। ভক্তরা প্রতিমাদর্শন ও প্রণাম করে ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। আজকের আলোচনাটা খুব সুন্দর, এই পরিচ্ছেদে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলছেন। ঠাকুরদালানে পূজা হয়েছে।

মাস্টারমশাই প্রথমেই খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়ে শুরু করছেন —**সুরেন্দ্রের বাড়ির উঠানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সভা আলো করিয়ে বসিয়া আছেন**। ঠাকুর নিজেই এক জায়গায় বর্ণনা করছেন —শ্রীরামচন্দ্র সভায় উপস্থিত হলে যেন সহস্র সূর্যের উদয় হল।

সভাতে যিনি প্রধান হন, তিনি এলে সভার শোভা বেড়ে যায়। কিন্তু কোন একটি সভাতে, যেখানে সবাই মিলেমিশে আছে, সেখানে যদি কাউকে সভাপতি করে দেওয়া হয়, তিনি কিন্তু সভাকে আলোকিত করতে পারবেন না। যেমন স্কুলের ক্লাশগুলিতে প্রত্যেক ক্লাশে একজন মনিটর আছে, সে এসে গেলেই যে ক্লাশটা আলোকিত হয়ে যাবে, তা না। কিন্তু যেমনি শিক্ষক মহাশয় এসে দাঁড়ান তখন ক্লাশটা আলোকিত হয়ে যায়। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের অনেক জায়গায় এই জিনিসটাকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সভাতে যারাই থাকুন, সেখানে যদি কোন ভিআইপি এসে যান, তাঁর তন্মাত্র বলুন, ব্যক্তিত্ব বলুন, এমন থাকে যে উনি না চাইলেও সবারই দৃষ্টি ওনার দিকে চলে যাবে। কেন এমন হয়, এগুলো বোঝান খুব মুশকিল। আপনার ব্যক্তিত্বে যদি একটা জোর থাকে, বিশেষ করে আপনি যদি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কিংবা আপনি যদি মরালিটিতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, মানুষ আপনাকে না জানা সত্ত্বেও অজান্তেই মাথাটা নত করে দেয়।

ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুলিমালকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলেন, যে অঙ্গুলিমালের ভগবান বুদ্ধের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা, ভক্তি নেই, সেই অঙ্গুলিমাল ভগবান বুদ্ধের পায়ে পড়ে গেলেন। তবে এটা বৌদ্ধ গল্প। বৌদ্ধদের এটা একটা পুরনো সমস্যা। বৌদ্ধরা ভগবান বুদ্ধকে বড় করার জন্য, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বড় করার জন্য বিচিত্র বিচিত্র জিনিসকে তাঁরা বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে নিয়ে আসেন। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এই দুটো ধর্মেরই এই সমস্যা আছে। শুধু হিন্দু ধর্মকে ছোট করার জন্য আর বিশেষ করে নিজেদের বড় করার জন্য এই ধরণের প্রচুর কাহিনী তৈরী করেন। শুধু বৌদ্ধ ধর্মের পরম্পরায় যে রামায়ণ আছে, সেটা যদি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন, এরা কতটা Text torturing করে।

আমাদের চোখের সামনে একটা ঘটনা ঘটেছিল। অনেক আগে আমাদের এক মহারাজ গঙ্গাসাগর গিয়েছিলেন। সেখানে এক ধনী পরিবার সাধুদের প্রচুর কম্বল দান করছিলেন। মহারাজকে দেখে ভদ্রলোক কম্বল দিতে গেছেন, তখন তাঁর স্ত্রী বলছেন, 'দেখে বুঝতে পারছ না যে ইনি কাঙালী সাধু নন? ভিতর থেকে ভাল কম্বল বার করে দাও'। কিছু একটা থাকে, যাতে বোঝা যায় এর মধ্যে অন্য শক্তি আছে। ঠাকুরের ভক্তরা স্বামী অতুলানন্দের নাম শুনে থাকবেন, গুরুদাস মহারাজ বলেই বেশি পরিচিতি ছিল। এক সময় হল্যাণ্ডে ছিলেন। ওনার স্মৃতিকথাতে আছে, স্বামীজী দ্বিতীয়বার যখন আমেরিকা যান, ইনি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের

শিষ্য হয়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলেন, এই প্রথম স্বামীজীকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে; দেখছেন একঘর লোক। গুরুদাস মহারাজ বলছেন, 'আমার স্বাভাবিক দৃষ্টিটা অন্য কারুর দিকে না গিয়ে বারবার স্বামীজীর দিকে চলে যাচ্ছে'। তারপর উনি তাঁর স্মৃতিকথায় বলছেন, 'পরে ভাবলাম, কেন এই রকম হল, আমার দৃষ্টিটা কেন ওনার দিকেই চলে যাচ্ছে। উনি কি উচ্চতায় সবার থেকে বেশি? না। উনি কি দেখতে খুব সৌম্য, সুন্দর? না। সেখানে ওই শহরের খুব সম্ভ্রান্ত বংশের ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা ছিলেন, সবারই চেহারা ঝকঝকে'। অনেক কিছু বলে বলে, শেষে বলছেন –'ওনার চোখ দুটো এমন জ্বলজ্বল করছে যেন সবার দৃষ্টিকে টেনে নিচ্ছে'। বোঝা যায়, এনারা অন্য জাতের। এখানেও মাস্টারমশাই খুব সুন্দর বলছেন –ঠাকুর সভা আলো করে বসে আছেন; যেন ছোট ছোট মাছেদের মধ্যে মৎস্যরাজ বসে আছেন।

মাস্টারমশায় সেখান থেকে আবার খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন –**দালানের ভিতর সুন্দর ঠাকুর-প্রতিমা। মার পাদপদ্মে জবা, বিল্ব, গলায় পুষ্পমালা। মাও ঠাকুরদালান আলো করিয়া বসিয়া আছেন**। ঠাকুরদালানে মা আলো করে বসে আছেন, আর উঠানে ঠাকুর সভা আলো করে বসে আছেন; পুরো ব্যাপারটা এত সুন্দর যে, একটু অনুধ্যান করলেই দৃশ্যটা যে চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। একবার যদি আমরা কল্পনা করি –পূজা হচ্ছে, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার পূজা হচ্ছে; একদিকে ঠাকুর দালান, আর-এক দিকে উঠান, আর সেই উঠানে ঠাকুর আলো করে বসে আছেন। এইসব বলে বলছেন –**ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়াছেন, আসিয়া ঠাকুরদালানে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিমা দর্শন করিলেন, প্রণাম ও দর্শনানন্তর দাঁড়াইয়া মার দিকে তাকাইয়া শ্রীকরে মূলমন্ত্র জপ করিতেছেন**। এই বাক্যটা খুব important বাক্য।

কথায় কথায় একদিন একজন মহারাজকে আমি বলছিলাম –তথাকথিত বেদান্তী যাঁরা আছেন, হরিদ্বারে, উত্তরকাশীতে, নর্মদাতীরে যে বেদান্তীরা আছেন, আমি এনাদের বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস খারাপ অর্থে না, বেদান্ত দর্শনের দিক থেকে। যেমন তোতাপুরী, তোতাপুরী ঠাকুরকে দীক্ষা দিলেন, সবই করলেন; কিন্তু কোথাও একটা কিছু মিসিং ছিল। বেদান্তীরা প্রতিমা মানতেই চান না। ঠাকুর, যিনি অবতার; ঠাকুর, যাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে; ঠাকুর, যাঁর মত অদ্বৈতী আমরা কল্পনা করতে পারি না, তিনি কিভাবে মাকে প্রণাম করছেন, মা মা করছেন। এটাই আসল হিন্দু ধর্ম। স্বামীজী সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য যে বিধি-বিধান দিয়ে গেছেন, সেখানে তিনি বলছেন –শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ঠাকুরের জীবনকে আধার করে করতে হবে, তা নাহলে শাস্ত্র বোঝা যাবে না।

আমি যে বললাম, এনাদের বিশ্বাস করি না; বিশ্বাস এই জন্য করি না, যে কোন দিন ঠাকুরকে পড়েননি, বিশেষ করে লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত; তাঁর বেদান্তের ব্যাখ্যাকে আমি বিশ্বাস করি না। কারণ তখন ওই ব্যাখ্যা হয়ে যাবে –আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে। যে কোন বিষয়কে নিয়ে আপনি যখন আলোচনা করবেন, তখন সেখানে আপনার বক্তব্যে ওই বিষয়ের পুরো ছবিটা দিতে হবে। বেদান্ত আরও গভীর। বেদান্ত মানে ধর্ম, বেদান্ত কোন সম্প্রদায় না। অদ্বৈত একটা পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। হিন্দু বলতে যা, বেদান্ত বলতে তাই, ধর্ম বলতে তাই আর অদ্বৈত বলতেও তাই। হিন্দু বলতে ধর্ম, বেদান্ত আর অদ্বৈত এক। যেখানে ভজহরি হচ্ছে, এরা হল সম্প্রদায়; হিন্দু ধর্ম কোন সম্প্রদায় নয়। স্বামীজী বারবার বলছেন, বেদান্ত পুরো ছবিটা নেয়, হিন্দু ধর্ম পুরোটা নেয়। যখন ব্যাখ্যা করা হবে, তখন পুরোটাকে নিতে হবে।

পুরোটাকে নিতে সমস্যা নেই, সমস্যা হয়, পুরোটাকে আপনি কি বুঝেছেন? বেদান্ত, অদ্বৈত এবং হিন্দু ধর্ম বুঝতে গেলে আপনাকে ঠাকুরে জীবনকে ভাল করে অনুধাবন করতে হবে, কথামৃত পড়তে হবে, পড়ে বুঝতে হবে; লীলাপ্রসঙ্গ পড়তে হবে, পড়ে ধারণা করতে হবে। কথামৃত আর লীলাপ্রসঙ্গ না পড়া থাকলে পুরো ছবিটা আপনার কাছে পরিষ্কার হবে না। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী বলে যে এই কথা বলছি তা না; কারণ আমার সব জিনিসটা জানা হয়ে গেছে বলেই আজ এই

কথা বলতে পারছি। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ আমার জানা আছে, বাইরের সাধু-সন্ন্যাসীদের অনেক সঙ্গ করেছি। সেখানে দেখেছি অনেকরই কথাবার্তায় প্রচুর ফাঁক এসে যায়, অনেকেরই চিন্তা-ভাবনা খাঁচে খাঁচে বসে না।

রামকৃষ্ণ মিশন সবাইকে একটা প্যাটার্নে নিয়ে গিয়ে ফেলছে, সবাইকে একটা ডিসিপ্লিনে রাখছে, সবাইকে কাজের মধ্যে রাখছে। যার জন্য সঙ্ঘে টিকে থাকাটাই একটা সাধনা। ফলে কি হয়, মনের একটা গঠন তৈরী হয়। আর সেখানে যখন এই ভাবগুলি যাবে, তখন বেদান্ত বুঝতে সহজ হয়ে যাবে। যেখানে প্রথম কথা হল, যিনি সব সময় অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত, যিনি অবতার, তিনি এখন ভক্তরূপ ধারণ করে ঠাকুর-প্রতিমার সামনে গিয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করছেন।

আর তারপর, 'মার দিকে তাকাইয়া শ্রীকরে মূলমন্ত্র জপ করিতেছেন'। এই সেকেণ্ড পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা ঠাকুরের অবতার ছেড়ে তাঁর সমাধিটুকু মনে রাখি, তাহলে তো এটাই উঠে আসে –ঠাকুরের তো আর এসব করার দরকার ছিল না। যাঁর অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁর আর শ্রীকরে জপ করা কিসের প্রয়োজন। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন –*তীর্থীংকুর্বন্তি তীর্থানি*। যেখানে যেখানে তীর্থ আছে, এই সমাধিবান পুরুষরা যখন সেইসব তীর্থে যান, সেই সব তীর্থে তাঁরা শক্তি সঞ্চার করে দেন। আর যেখানে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার নিতান্ত অভাব, সেখানে গিয়ে এনারা বীজ বপন করে দেন। ফলে যে স্থানকে কেউ তীর্থস্থান বলে মনে করত না, সেই স্থানই মহাতীর্থ রূপে স্বীকৃতি পায়। যেমন বাংলায় লক্ষ লক্ষ গ্রামের মধ্যে কামারপুকুর আর জয়রামবাটী দুটো ছোট্ট গ্রাম, কেউ কোন দিন এই স্থান দুটোর নামও শোনেনি। কিন্তু আজ মহাতীর্থ হয়ে গেল, সারা বিশ্বের লোক এখন এখানে ছুটে ছুটে আসছে।

কিন্তু যেটার জন্য এত কথা বলা, আপনাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, আমি নিজে করি, আপনাদেরও অনুরোধ করছি করবেন। যেখানেই যাবেন, সেখানেই আপনার শ্রীকরে জপ করে দেবেন। ট্রেনে যাচ্ছেন, ট্রেনে বসে জপ করে দিলেন। জপ করে আপনি ট্রেনকে শুদ্ধ করে দিলেন। বাসে যাচ্ছেন, ট্যাক্সিতে যাচ্ছেন, একটু জপ করে দেবেন। কোন বন্ধুর বাড়িতে গেলেন, কোন রেঁস্তোরাতে গেলেন, যেখানেই গেলেন একটু জপ করে দেবেন, বারো বার হোক, একশ আটবার হোক। আপনারা যাঁরা এই শাস্ত্রের কথা শুনছেন, আপনারা আর যাই হন, আপনার আর কেউ সাধারণ মানুষ নন। এখানে প্রমাণ শুধু আমার কথা। আমার কথাকে যদি বিশ্বাস করেন, এটাই প্রমাণ, এছারা অন্য কোন প্রমাণ নেই। কারণ এই ধরণের শাস্ত্রকথা যেখানে খোসগপ্প নেই, যেখানে হাসিঠাট্টা মজার কাহিনী নেই, আর কোন তরলীকরণ, সহজীকরণ নেই। এই ধরণের বক্তব্য দ্বিতীয়বার শুনছেন, মানে একই বক্তব্য না; ভিতরে কিছু বস্তু না থাকলে শুনতেই পারতেন না।

আমি আমার অনেক পরিচিতদের বলতে শুনেছি, তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা এই ধরণের বক্তব্য নিতে পারেন না, বড্ড কঠিন লাগে। তাই বুঝতে অসুবিধা নেই যে, আপনাদের মধ্যে শক্তি আছে। শক্তি অর্জন করুন আর শক্তি বিতরণ করবেন। এই শক্তি যখন বিতরণ করা শুরু করবেন, এতে আপনার আরও শক্তি অর্জন হবে। ঠাকুরের নূতন করে অর্জন করার কিছু ছিল না, উনি শুধুই বিতরণ করে যেতেন। আপনাদের ক্ষেত্রে এই যে বিতরণ, এটাই শক্তি অর্জনের একটি মাধ্যম। আমরা আগে আগে দেখেছি, ব্রাহ্মণরা কোন মন্দিরে গেলে সেখানে কীর্তন করবেন, স্তব করবেন, পাঠ করবেন; সব করে একশ আটবার জপ করতেন, কিংবা বসে এক হাজার বার জপ। আপনারাও ঠাকুরের মন্দিরে বা যে কোন মন্দিরে যখন যাবেন এই কাজগুলো করবেন। যে মন্দিরে গেলেন, সেখানে প্রণাম করলেন, তারপরে জপ। যতটা সম্ভব করবেন, সময় নেই, অন্তত দশবার করবেন।

কিন্তু তার থেকেও বেশি –যদি কারুর বাড়ি যান, যে আপনাকে পছন্দ করে না, তার বাড়ি হোক; যে আপনাকে পছন্দ করে, তার বাড়ি হোক আর ট্যাক্সি হোক, বাস হোক, ট্রেন হোক; একটু জপ করে দেবেন। আপনি যে এই একটু জপ করে দিচ্ছেন, এটা আপনি নিঃস্বার্থ ভাবে করছেন। এই যে

নিঃস্বার্থ ভাবে করা, এটা বোঝা যায় না, কিন্তু মঙ্গল হয়। যাঁরা যাচ্ছেন, যাঁরা পরে গিয়ে বসবেন, যাঁরা পরে দর্শন করতে আসবেন, তাঁদের সবারই এতে মঙ্গল হয়। আমাদের মনে হতে পারে, অতটুকু করে লোকেদের কি আর চেতনা হবে? কিন্তু এটাই হল, তিল তিল করে দান করা। এটাও একটা মনুষ্য যজ্ঞ, পঞ্চ মহাযজ্ঞে যেটা বারবার বলা হয়েছে। এটা করতে গিয়ে মানবকল্যাণে আপনি নিজেকে নিয়োজিত করছেন। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, গুহায় বসে যিনি ধ্যান করছেন, ধ্যানে বসে তিনি উচ্চ চিন্তনের তরঙ্গ উৎপন্ন করে সমস্ত জগৎকে তরঙ্গায়িত করে দিচ্ছেন; আর এই ভাবে গুহায় ভিতর বসেও তিনি মানবজাতির মঙ্গল করে যাচ্ছেন। এই কাজগুলো অবশ্যই করবেন, এটা আপনার এখন ধর্ম।

মন্দিরে বসে যখন জপ করছেন, তখন এটা আপনার নিজের জন্য করছেন, কারণ আপনার এখনও সেই শক্তি হয়নি যে, আপনি ওই সমষ্টি শক্তিতে গিয়ে শক্তি যোগ করবেন; পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকে। জিনিসটা উঁচু থেকে নিচুর দিকে যায়। নিচের থেকে উপরে পাঠাতে গেলে পাম্প লাগে। আপনার তো পাম্প নেই যে, বেলুড় মঠের মন্দিরে এসে আপনি চার্জ আপ করে দেবেন। সেখানে আপনি ঠাকুরকে প্রণাম করে জানাচ্ছেন, হে ঠাকুর তোমার জন্য আজ এতটুকু জপ করলাম। আর অন্যান্য জায়গায় যখন যাবেন, সেখানে প্রসাদ যেমন বিতরণ হয়, ঠিক সেইভাবে জপরূপী প্রসাদ বিতরণ করবেন। কক্ষণ যেন এই প্রসাদ বিতরণ বাদ না যায়; আমি সব সময় করি। রিক্সা, অটো, টোটো, বাস যেখানেই যাই, বসে জপ করে দেব। জপটাও ঠাকুরের প্রসাদ মনে করে, একটু একটু বিতরণ করে দিলাম। কেউ নিল কি না নিল, তাতে আপনার কি। যেখানে যাবেন, মৃত্যুশয্যায় কেউ পড়ে আছেন, তাঁকে দেখতে গেলেন। দরকার হলে কায়দা করে তাঁর মাথা স্পর্শ করে বা শরীরটা স্পর্শ করে, যেমন আপনার মন অনুমতি দেয়, জপ করে দিলেন। সেটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে জপ করে দিলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের বাড়িতেও জপ, বাইরেও জপ, অবশ্যই করতে হয়। ঠাকুর নিজে করে দেখিয়ে দিলেন, তাই এটা আমাদের কর্তব্য। বাজারে দোকানীর কাছ থেকে আনাজ কিনলেন, একটু সময় ছিল, জপ করে নিলেন। এতে তার মঙ্গল হচ্ছে কি হচ্ছে না, এত ভাবার কি আছে, আপনি তো প্রসাদ বিতরণ করছেন। সাধারণ ভাবে আমাদের ভিতরে ক্রোধ, হিংসার আগুন জ্বলছে, আমাদের ভিতরে যে অশান্তির আগুন জ্বলছে সেটাই আমরা চারিদিকে বিতরণ করে বেড়াই। যাঁরা অজান্তে চুপচাপ ঠাকুরের নামজপের প্রসাদ বিতরণ করে যাচ্ছেন, শ্রাবণ মাসের মেঘ যেমন নিঃশব্দে বারি বর্ষণ করে চলে যায়, তাঁরাও তেমনি নিঃশব্দে চুপচাপ প্রসাদ বিতরণ করে যাচ্ছেন। অন্যান্য ধর্মে এ-সবের ধারণাই নেই। এগুলো একমাত্র হিন্দু ধর্মের সম্পদ।

খোল-করতাল নিয়ে কয়েকটি বৈষ্ণব বসে আছেন, সংকীর্তন হবে। **ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে একটি তাকিয়া লইয়া বসিতে বলা হইল। তিনি তাকিয়ার কাছে বসিলেন না। তাকিয়া সরাইয়া দিলেন,** বলছেন–

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) –তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসা! কি জানো, অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার কচ্ছ, অভিমান কিছু নয়। আবার কোথা থেকে এসে পড়ে! অমনি মুখ ভার করে বলে, আমায় খাতির কল্লে না। তাকিয়া, তাতে ঠেসান দিয়ে বসা, এগুলো অভিমান, অহংকারের লক্ষণ। আগেকার দিনে সাধারণ লোকেরা তাকিয়া এসব বড় একটা রাখতেন না; যারা জমিদার, বড়লোক তারা রাখতেন। শেঠজীরা এখনও তাকিয়া রাখে, ওরা 'গদ্দি' বলে; সেখানে ঠেসান দিয়ে বসে থাকে। ঠাকুর এগুলো পছন্দ করতেন না।

ছাগলকে কেটে ফেলে গেছে, তবু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ছে। আমি দেখিনি, শুনেছি; মুরগির মুণ্ডু কেটে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, মুণ্ডু ছাড়াই মুরগী দৌড়াতে থাকে। মুরগীর মুণ্ডু কাটার পর ও ছটফটানি থামতে সময় লাগে।

স্বপ্নে ভয় দেখেছ; ঘুম ভেঙে গেল, বেশ জেগে উঠলে তবু বুক দুড়দুড় করে। অভিমান ঠিক সেইরকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে অমনি মুখ ভার করে বলে, আমায় খাতির কল্লে না।

আমি আগেও একটা গল্প বলেছি। কানপুর মঠ থেকে কিভাবে আমাকে একজনের বাড়ি যেতে হয়েছিল। এখনও আমি মনে রেখেছি, সেখানে আমাদের ভাঙা কাপে চা খেতে দেওয়া হয়েছিল। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, এগুলো যায় না। আপনি মনে করছেন চলে গেছে। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, সাধুর সমস্ত অহংকার চলে যায় কিন্তু সাধুত্বের অহংকারটা যায় না। আমি নিষ্ঠাবান না হতে পারি, আমার জ্ঞান-ভক্তির অভাব থাকতে পারে; কিন্তু কেউ যদি আমাকে বলে দেয় ঢঙ্গী, ভিতরে ভিতরে আমার খুব রাগ হয়। তখন মনে হয়, একটু যদি আমার যোগশক্তি থাকত, এক্ষুণি ভস্ম করে ছাড়তাম। এই জিনিস যেতে চায় না, অসম্ভব। ঠাকুরের তো নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে, ওনার আর কি; তাহলেও তিনিও অভিমান হবে বলে তাকিয়া সরিয়ে দিয়ে বসলেন।

ঠাকুর এগুলো করছেন লোকশিক্ষার জন্য, নিজের জন্য কিছু করছেন না। একদিন আমার কাছে একজন এসেছিল, তাকে চা খেতে দেওয়া হয়েছিল। কাপে কোন দাগটাগ ছিল, এখনও সে দেখা হলেই বলবে, 'আপনার ওখানে গিয়েছিলাম, ফাটা কাপে চা দিয়েছিলেন'। ওনাকে কি আমি চা দিয়েছিলাম? আমাদের চায়ের ডিপার্টমেন্ট আছে সেখান থেকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে ভুলবে না; ওইটাই অহংকার, ফাটা কাপে চা দিয়েছিল। অত্যন্ত সাত্ত্বিক যাঁরা, তাঁদেরও যায় না, মুখে দেখায়। আর যে কজন ভক্তিতে গদগদ হয়ে থাকে, এদের সব কটা দু-নম্বরী, সবাই এক একটা অহংকারের ঢিপি। এগুলোকে নিয়ে আমাদের মহারাজদের মধ্যে অনেক মজার মজার কাহিনী আছে।

রাস্থায় দুজনে মিলে ধস্তাধস্তি করছে। কি হয়েছে? একজন বলছে আমি বিনয়ী, অন্যজন বলছে, আমি তোমার থেকে বেশি বিনয়ী। কে বেশি বিনয়ী এই নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি, হাতাহাতি থেকে ধস্তাধস্তি; রাস্থায় এখন দুজনে কুস্তি লড়ছে। কে বেশি বিনয়ী এটা ঠিক করার জন্য আপনাকে মারামারি করতে হচ্ছে? এটাই বিনয়ের অহংকার; এই অহংকার থাকবে, কিছুতেই যাবে না, অহংকার যেতে চায় না। সাধুদের মধ্যে অনেক সময় নানা রকম অদ্ভুততা আসে, সাধুরা একা একা থাকেন কিনা, অস্বাভাবিক কিছু না।

ঠাকুর খবরকাগজ নিয়ে একট বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছেন, ওতে শুধু বিষয়ীদের কথা। আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, উনিও তাই খবরকাগজ ছুঁতেন না। মহারাজ খুব ভাল মানুষ, আর এত প্রেমিক মানুষ যে, সবার জন্য তাঁর দরদ। মঠে একটা জায়গায় খবরকাগজ রাখা থাকে। আমি দেখতাম, উনি খবরকাগজের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি ছোঁবেন না, ওখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খবরকাগজ পড়তে থাকতেন। যিনি পড়ছেন, তিনি যতক্ষণ পাতা না উল্টাচ্ছেন তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। দেখে আমাদের খুব হাসি পেত, এসব না করে বসে পড়ে নিলেই হয়। নিজে থেকে একটা ঠিক করে নিয়েছেন, আমি খবরের কাগজ ছোঁব না। কিন্তু মনে মনে দেখার ইচ্ছে আছে, জানার ইচ্ছে আছে কোথায় কি হয়েছে। এই ধরণের একটা পণ করে নেওয়াও ভাল, মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার এগুলোর মধ্যে অনেক pecualiarties আছে; এই ধরণের পণ করাই বা কেন।

কেদার –তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আমি ভক্তের রেণুর রেণু। এই ধরণের কথা ঠাকুরই বলতে পারেন, আমরা বললে মুখের কথা হয়ে যাবে। আবার বিনয় দেখাতে গেলে তখন রেণুর রেণু, রেণুর রেণুর রেণু, রেণুর রেণুর রেণুর রেণু চলতেই থাকবে। দুই বৈষ্ণবের মধ্যে দেখা হয়েছে। একজন বৈষ্ণব আর-একজনকে বলছে, অধমের প্রণাম নেবে। এই বৈষ্ণব বলছে, ছি ছি ছি, অধমাধমের প্রণাম নেবেন। সে তখন বলছে, ছি ছি

ছি, অধমাধমাধমার প্রণাম নেবেন। এরপর দুজনে অধমা অধমা অধমা অধমার প্রণাম দেওয়া চলতে থাকল। সকাল থেকে দুজনে মিলে অধমা অধমা করে যাচ্ছে, লোকেরা শুনছে, ধমাধমাধমা। সময় কাটাতে হবে, অপরের যে দুটো ভাল কিছু করে দেবেন তার সময় নেই। শুধু অধমাধমাধম করে যাচ্ছে।

[**বৈদ্যনাথের প্রবেশ**]

বৈদ্যনাথ কৃতবিদ্য। কলিকাতার বড় আদালতের উকিল, ঠাকুরকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিলেন ও একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। তখনকার ভদ্রলোক বাবু কিনা, পা ছুঁয়ে প্রণাম করবেন না। একবার এক ভদ্রমহিলা এসে আমাকে হাতজোড় করে প্রণাম করলেন। করে বলছেন, পা ছুঁয়ে প্রণাম করাটা আমি মানি না। আমাকে একজন সন্ন্যাসী মানতে অসুবিধা নেই, কিন্তু পা ছুঁতেই যত আপত্তি, এ এক বিচিত্র ভাব। যতগুলো বাঙালী পড়াশোনা করা ভদ্রলোক দেখি এদের মধ্যেই এই বুদ্ধিগুলো বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

সুরেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর ঠাকুর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ –হাঁ, এঁর স্বভাবটি বেশ দেখছি।

যে কোন লোকের চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায় ভিতরে কি আছে। সুরেন্দ্র বলছেন, **ইনি আপনাকে কি জিজ্ঞেস করবেন, তাই এসেছেন**। বৈদ্যনাথের মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছে। ঠাকুর যেখানে দেখতেন নিষ্ঠা আছে, তাঁকে উত্তর দিতেন।

আমাকে একজন যোগাযোগ করল, ইংল্যাণ্ডে কোন এক ধর্মের কে একজন আছে, সে নাকি হিন্দু ধর্মকে নিচু দেখানোর জন্য ইউটিউব লাইভে আমার সঙ্গে তর্ক করতে চায়। আমি বলে পাঠালাম, আমার এগার'শ খানা ভিডিও আছে, ওগুলো আগে দেখে হিন্দু ধর্মকে জানুন। আর গরু-মোষ খেয়ে নিজের শরীরকে যেভাবে অশুদ্ধ করেছে, আগে এক বছর গঙ্গাস্নান করে নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করুন। তারপরে গিয়ে তিনি কথা বলার একটু পাত্রতা পাবেন, তখন আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে কি তর্ক করব, কথা বলার আপনার যোগ্যতা আছে? আর হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করে আমার সঙ্গে তর্কে করতে চাইছেন? আগে তিনটে ভাষায় আমার এগার'শ খানা ভিডিও আছে, ওগুলো আগে শুনে নিন। আগে আপনি জানুন হিন্দু ধর্ম কি।

আর-একজন যোগাযোগ করে আমাকে বলল, আচ্ছা বেদে তো এই রকম আছে। আমি তাকে বললাম তোমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ কেউ বেদ দেখেছে? তুমি বেদ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসছ? এরা হল দুষ্ট বুদ্ধির। দক্ষিণেশ্বরে একজন তর্ক করতে আসত, এসেই সে 'হা রে রে লম্বোদর' বলে এমন হাঁক দিত যে যারা তাঁর সঙ্গে তর্ক করবে সবাই কেঁচো হয়ে যেত। আমাদের তো সেই যোগশক্তি নেই যে, হা রে রে করে ওদের ছাপিয়ে যাব। কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে যদি কেউ আসে, সত্যিকারের যদি মনে প্রশ্ন জেগে থাকে, তাও যদি পাত্রতা থাকে, তবেই ঠাকুর তার সঙ্গে কথা বলতেন। নরেন ছাড়া আর কাউকে ঠাকুর বললেন না, আমি ঈশ্বর দেখেছি, তোমাকেও দেখাতে পারি। একমাত্র নরেনকেই ঠাকুর এই কথা বললেন। বৈদ্যনাথ কিছু বলার আগেই ঠাকুর বলতে শুরু করেছেন। এই জায়গা থেকে কথাগুলো খুব গভীরে চলে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈদ্যনাথের প্রতি) –যা কিছু দেখছ, সবই তাঁর শক্তি; তাঁর শক্তি ব্যাতিরেকে কারু কিছু করবার যো নাই। ঠাকুর এখানে ভক্ত যে প্রকৃতির, সেই প্রকৃতি অনুযায়ী ভক্ত যেমন বুঝবেন ঠিক তেমনটি ভাবে বলছেন। বেদান্ত এই জিনিসটাকেই অন্য ভাবে দেখে। কৃষ্ণভক্তরা আর-এক রকম দেখে।

তবে একটি কথা আছে, তাঁর শক্তি সব স্থানে সমান নয়। স্বাভাবিক, শক্তি শব্দ নিয়ে এলে এটাই মানতে হবে যে, শক্তি মানেই শক্তির তারতম্য থাকবে। ব্রহ্ম, চৈতন্য এক রস; শক্তি কখন সমান

হবে না। সংসার মানেই শক্তির খেলা। আমাদের সব শাস্ত্রে, আমার যে হিন্দু জীবনধর্ম সেখানেও এটা বারবার বলা হয়েছে –সংসার হল ব্রহ্ম আর শক্তির খেলা। সমান সমান যদি চান, এই যে কম্যুনিজমে সব সমানের কথা বলে, তাহলে তোমরা ব্রহ্মের দিকে যাও। সমাজে সমান সমান কোন কিছুই হয় না, সৃষ্টি হয় inequalityতে। স্বামীজী এক জায়গায় সোস্যালিজিমকে নিয়ে খুব সুন্দর কথা বলছেন, Half a bread is better than no bread। তার সঙ্গে বলছেন, এটা কখন চেষ্টা করা হয়নি। সমাজের ভালর জন্য কাল যদি যে কেউ একটা আইডিয়া নিয়ে আসে, সেটা তুমি করে দেখাও না, কে বারণ করছে। কিন্তু তুমি যদি বল সবাই সমান, আমরা মানব না। এটাকে আমার ধর্মই মানছে না। যারা সবাই সমান বলতে চায়, সবাইকে সমান করতে চায়, বোঝা যায় এরা ঢপবাজ। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, সমাজে কারুর বেশি টাকা থাকবে, কারুর কম টাকা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই তফাৎ যদি একটা সীমাকে ছাড়িয়ে যায়, তখন বিপ্লব হবেই। তখন শক্তির উৎস হবে বন্দুকের নল।

লক্ষ্য করলে খুব মজার ব্যাপার দেখা যাবে, এই যে হিন্দুরা এত শান্ত, সৌম্য একটা জাতি; কারণটা কি আমরা জানি। এই যে তুমি বলছ বন্দুকের জোরে সবাইকে সমান করবে, তা কখনই সম্ভব না। কম্যুনিস্টরা এত সাম্যবাদের কথা বলে, তারাও ক্ষমতা ভোগ করছে, তাদেরও পলিটব্যুরো আছে, তাদেরও হায়ারারকি থাকবে। কম্যুনিস্ট শাসিত রাজ্যে চিফ মিনিস্টার আছে, ডেপুটি চিফ মিনিস্টার আছে, এটা থাকবেই। অন্য দিকে রয়েছে আমেরিকা, সে আর-একটা ধুরন্ধর, ক্যাপিটলিজমকে এমন করে রেখেছে যে, বড়লোক বড়লোক হয়ে যাচ্ছে, সাধারণ লোক ডুবে যাচ্ছে।

এই জিনিসটাকে আমরা অনেক আগেই জেনে গেছি যে, এই সমস্যা হয়। সেইজন্য ধর্মের অঙ্কুশ দিয়ে তাদেরকে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমাদের এখানে ধর্ম আফিং না, ধর্ম এখানে অঙ্কুশ। যেখানে বড়লোকরা শক্তিতে টগবগ করছে, তাদেরকে ধর্মের অঙ্কুশ দিয়ে আটকে রাখা হচ্ছে, যাতে তারা মত্ত হস্তির মত অন্যদের পদদলিত না করতে পারে। ধর্ম দিয়ে এখানে সবাইকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

ঠাকুরের কথা –শক্তি বিশেষ। যদি আমরা equalityর কথা বলতাম, তাহলে বলত সবাই সমান। কথামৃতে কোথাও ঠাকুর বলছেন না যে, আমরা সবাই সমান। হিন্দু ধর্মেও কোথাও সমানতার কথা বলা হচ্ছে না। সমান একমাত্র হবে ব্রহ্মে। সমান সমান হবে একমাত্র spiritual equality। নিচে কোন সমান সমান হয় না, সব ধর্ম কখন সমান হয় না। মত পথ, এক-একটা মত এক-একটা পথ, সবটাই ঈশ্বরের। কোন পথ কোথায় যাচ্ছে কে জানে। কোন পথ হয়ত নরকে নিয়ে যাচ্ছে, কোন পথ স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে, কোন পথ সেখানে নিয়ে যাচ্ছে; মত পথ। এই জিনিসটা কোথায় যেন আমাদের মাথায় ঢুকে বসে আছে –সমস্ত ধর্ম এক, ঈশ্বর এক। তা কি কখন হয়? ঈশ্বর কি কখন এক হন, যত মন তত ঈশ্বর। দুটো মন কখন সমান হয় না, দুই ঈশ্বরও কখন সমান নন। দুই ধর্ম কক্ষণ সমান না। হ্যাঁ, আমার পথ তোমার পথ না, তোমার পথ আমার পথ না। তুমি কোথায় যাবে আমি কি করে বলব? তাহলে বিচার করে দেখতে হবে, তোমার আদর্শ কি, তোমার চিন্তা-ভাবনা কি। ঠাকুর এখানে খুব সহজ ভাবে বলছেন –শক্তি বিশেষ।

তবে তাঁর শক্তি সব স্থানে সমান নয়। শক্তি যেমন সমান না, তেমনি সব পথও সমান না, সবার লক্ষ্য সমান না, সবাই এক জায়গায় যাবেও না, সবার ঈশ্বর সমান নয়। **বিদ্যাসাগর বলেছিল; 'ঈশ্বর কি কারুকে বেশি শক্তি দিয়েছেন'? আমি বললুম, শক্তি কমবেশি যদি না দিয়ে থাকেন, তোমায় আমরা দেখতে এসেছি কেন? তোমার কি দুটো শিঙ বেরিয়েছে?** সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর খুব সহজ উদাহরণ on the spot দিয়ে দিলেন।

তবে দাঁড়ালো যে, ঈশ্বর বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন, কেবল শক্তিবিশেষ। এই যে দুটো – বিভুরূপে সব জায়গায়; এই হল সমান। কিন্তু যখন শক্তিবিশেষ আসছে, বৈষম্য থাকবে। এই জগৎ হল সমান আর বৈষম্যের খেলা। জগতে যদি থাকতে চান, জানবেন বৈষম্যের সমস্ত নিয়মকে নিয়েই থাকতে

হবে। জগতে আপনি কিসের সাম্য খুঁজছেন? বাইরের সমাজ হোক, সাধুসমাজ হোক, রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজ হোক; সমাজ মানেই বৈষম্য। আমাদের শরীরের আশি ভাগ অক্সিজেন আমাদের মস্তিষ্ক শুষে নেয়। বাকি কুড়ি ভাগ অক্সিজেন নিয়ে এই পুরো শরীরটা চলছে। সৃষ্টি মানেই বৈষম্য। সাংখ্য দর্শনের যেটা বেদান্ত নিয়েছে, সৃষ্টি যখন হয়, প্রকৃতি যখন সাম্য অবস্থায় থাকে তখন কোন সৃষ্টি হয় না। প্রকৃতিতে বৈষম্য যখন হয়, তবেই সৃষ্টি হবে; সৃষ্টি মানেই বৈষম্য। কিসের বৈষম্য? শক্তির। বৈদ্যনাথের মনে আমাদের মতই প্রশ্ন জেগেছে।

বৈদ্যনাথ –মহাশয়! একটি সন্দেহ আমার আছে। এই যে বলে free will অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা –মনে কল্লে ভাল কাজও কত্তে পারি, মন্দ কাজও কত্তে পারি, এটা কি সত্য? সত্য সত্যই কি আমরা স্বাধীন? এই প্রশ্ন আগেও অনেকবার এসেছে, পরেও আসবে আর যত পণ্ডিত, দার্শনিকরা আছেন, এই বিষয়টাকে এনারা ছোবেনই ছোবেন। তবে, ঠিক স্বাধীন ইচ্ছা রূপে আমাদের শাস্ত্রে নেই। মহাভারতে এটাকে দৈব রূপে বলা হয়েছে। দৈব হল, আমরা যে কর্ম করেছি, সেই কর্মই সামনে আসার জন্য অপেক্ষা করছে। 'স্বাধীন ইচ্ছা' শব্দটা ভারতীয় শব্দই না, এটা হিন্দুদের শব্দই না। ফ্রী উইল, স্বাধীন ইচ্ছা এগুলো ফিরিঙ্গিদের জাহাজে চেপে ভারতবর্ষে এসেছে। ভারতের সমাজে ফিরিঙ্গিরা অনেক রকম বীজ ছড়িয়েছে, তার মধ্যে এটা একটা। আর আমাদের দেশের লোকেরা, বুদ্ধিজীবিরা কোন শাস্ত্র না পড়ে, কিছু না বুঝে তিড়িং তিড়িং করে সাহেবদের সঙ্গে নাচ করছে আর আমাদের দেশের সর্বনাশ করে যাচ্ছে। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও ফ্রী উইল নেই, স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই; এখানে কর্ম আছে, দৈব আছে। কিন্তু দৈব হল, আপনি আগের আগের জন্মে, এই জন্মে যে কর্ম করেছেন বা করছেন। তার মানে আপনার এখন যে জীবন চলছে, এই জীবন চলছে পুরোপুরি আপনার কর্মের উপরে।

তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছা? ঈশ্বরের ইচ্ছাটাই কর্ম রূপ দিয়ে বেরোয়, ঈশ্বর ছাড়া কিচ্ছু হয় না। সবটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাহলে যে শক্তিবিশেষ বলছেন? এগুলোর সাথে যোগ রয়েছে। যে শক্তিবিশেষ বলা হচ্ছে, এই শক্তিটাও তো ঈশ্বরেরই। যে নিজের ভিতরে যতটা শক্তির প্রকাশ করাতে পারছে। আর এই চেষ্টাটা কি? এই যে চেষ্টা করছে, এই চেষ্টাটা ঈশ্বরেরই দেওয়া। আপনি বলতে পারেন, তাহলে তো আমাদের কিছু করার দরকার নেই। ঠিকই এখানে কিচ্ছু করার নেই। আপনি যদি কিছু না করে থাকতে পারেন, সেটা হবে পূর্ণশরণাগতি, আপনি মহাপুরুষ। আপনি কিন্তু তখন খাওয়ারও চেষ্টা করবেন না। আর আপনি যে বাহ্য প্রস্বাব করতে যান, সেটাও আর যাবেন না, কারণ সেখানেও একটা চেষ্টা লাগাতে হয়। পূর্ণশরণাগতিতে কোন চেষ্টাই আর চলবে না। যতক্ষণ ওইগুলোর চেষ্টা থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভের চেষ্টাটাও থাকবে, শক্তি অর্জনের চেষ্টা থাকেব। পনের দিনের বা একমাসের শিশু কোন চেষ্টা করে না, তার মা তার সব কিছু করে দেয়। ওই অবস্থা পর্যন্ত আপনি যতক্ষণ না যান, ততক্ষণ আপনাকে সব রকম চেষ্টা করতে হবে। যতদিন আপনার নিজের রান্না নিজে করছেন, যতদিন শরীরের বিভিন্ন কর্ম আপনি করছেন; ততদিন ঈশ্বরকে পাওয়ার চেষ্টাটাও আপনাকেই করতে হবে। ঈশ্বরকে পাওয়ার চেষ্টা মানেই শক্তি বাড়ছে।

বিদেশীদের কাছে ঈশ্বর আলাদা, আমি আলাদা, জগৎ আলাদা; আমি আর ঈশ্বর চিরদিনের জন্য আলাদা; তিনি মালিক আমি তাঁর ভৃত্য –কোথাও কোন লিঙ্ক নেই। তিনি আমাকে জগতে রেখেছেন, তিনি আমার পাপপূণ্যের হিসাব রাখছেন; তিনি আমাকে স্বর্গে বা নরকে নিয়ে যাবেন; এগুলো বিদেশী মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা, এগুলো আমাদের আইডিয়া নয়। এই বিদেশী আইডিয়ার ফলে আমাদের মনে এই ধারণাটা আসে – তার ইচ্ছা কতটুকু, আমার ইচ্ছা কতটুকু; এটাও হিন্দুদের চিন্তা-ভাবনা না। স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। হয় সবটাই স্বাধীন ইচ্ছা বলে গ্রহণ করুন; তখন কর্মবাদ, দৈব এগুলো এসে যাবে। আর তা নাহলে সবটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। যাঁর ঈশ্বরজ্ঞান হয়েছে, তিনি জানেন সবটাই ঈশ্বর করেন। ঈশ্বরজ্ঞান যার হয়নি, তার কাছে সবটাই হল নিজের ইচ্ছা।

তাহলে যখন অপ্রত্যাশিত কোন অঘটন ঘটে যায় তখন সেটাকে কি বলবেন? আপনার খুশি, আপনি সেটাকে কর্ম বলুন, দৈব বলুন, ঈশ্বরের ইচ্ছা বলুন; যাই বলুন, কিন্তু আপনি যদি এই অর্থে মনে করেন যে; উপরে ঈশ্বর বসে আছেন, তিনি কলকাঠি নেড়ে এই কাজ করছেন; জেনে রাখুন ঈশ্বরের এসব করতে ভারি বয়ে গেছে। আমরা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র, ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে, আমাদের মত সাধারণ লোকের জীবনে এসে তিনি মাথা ঘামাবেন। একটু আগে যে অহংকার নিয়ে কথা হচ্ছিল, এখানেও সেই অহংকার; কি অহংকার! ঠাকুর আমাকে মেরেছে। আমাকে মারার ক্ষমতা কারুর আছে? ঠাকুর আমাকে মেরেছে বলেই মরেছি। অপরকে মারলে তখন বলবে, ঠাকুর তো আমাকে মারলেন না, শেষে তোমাকেই মারলেন? আমরা সবাই অহংকারের এক-একটা ঢিপি। হয় একশ ভাগ বলুন স্বাধীন ইচ্ছা হয়, আর তা নাহলে একশ ভাগ বলুন, সব ঠাকুরের ইচ্ছাতে হয়। মাঝামাঝারি কিছু নেই।

শক্তি বিশেষ, যে যেমন চেষ্টা করছে তার তেমন শক্তির প্রকাশ হয়। যত শক্তি বাড়ে তত মানুষ বোঝে সে কত অসহায়। যাঁরা জীবনে কাজ করেছেন, কাজ মানে সাধারণ অফিসে গিয়ে কাজ করছে, বাড়িতে রান্নাবান্না করছে এগুলোকে কাজ বলে না। হাই লেভেলের কাজ, যে কাজের জন্য আপনাকে এমন লোকেরা জানে, যারা আপনাকে এর আগে কোন দিন দেখেনি, আপনাকে জানে না। আপনাদের মধ্যে নিশ্চয় এই রকম কেউ কেউ আছেন। আপনি হিসেব করে দেখুন, আপনাকে কে জানে, কারা চেনে? যাদের সঙ্গে কাজ করেছেন, বাড়ির লোকজন আর পাড়ার কয়েকজন ছাড়া আপনাকে কজন জানে? যদি না জানে, তাহলে বুঝবেন আপনি কোন কাজ করেননি। কাজ করেছেন মানে; যারা আপনাকে দেখেনি, যারা আপনাকে জানে না; তারা আপনার নাম জানতে পারছে। আমি আপনি রবীন্দ্রনাথকে দেখিনি, কিন্তু তাঁর নাম শুনেছি; কারণ তিনি কাজ করেছেন। পিকাসো, ভ্যান গগ্, এনাদেরকে আমরা দেখিনি; কাজ করেছেন বলে এনাদের নাম শুনেছি।

এই স্তরে যখন কাজ করবেন, যেখানে আপনাকে দশজন জানতে পারবেন, তখন আপনার মনে হবে –এই কাজ করা আমার ক্ষমতার বাইরে। তাহলে কি করে এই কাজ সম্পন্ন হল? এই প্রশ্নের উত্তরে যে শব্দই আপনি নিন না কেন, ভগবান বলুন, আত্মা বলুন, চান্স বলুন, যাই বলুন; এটা আপনার বিষয়। যাঁরা শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে থাকেন, তাঁরা বলবেন, তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে; তাঁদের জন্যই ঠাকুর এবার বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সকলই ঈশ্বরাধীন। তাঁরই লীলা। তিনি নানা জিনিস করেছেন। ছোট, বড়, বলবান, দুর্বল, ভাল, মন্দ। ভাললোক; মন্দলোক; এ-সব তাঁর মায়া, খেলা। এই দেখ না, বাগানের সব গাছ কিছু সমান হয় না।

ভগবান কোনটাই করেন না, এগুলো হল সব উপাচার। উপাচার মানে কথার কথা, বোঝানর জন্য বলা। ভগবান সব কিছুর পারে, ঠাকুর এখানে যেটা বলতে চাইছেন –ঈশ্বর বই কিছু নেই। এই জগৎ ঈশ্বর আর শক্তির খেলা। এই যে ভাল আর মন্দ; আলাদা ধরণের শক্তি; তিনিই করেছেন। কারণ তিনি বই আর কিছু নেই কিনা।

যতক্ষণ ঈশ্বরকে লাভ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন।

এই হল একরস, এটাই বেদান্ত। আপনার যদি মনে হয়, আজকে ঝালমুরি খাব, বেলুড় মঠে গিয়ে খিচুরি খাব; তার মানেই আপনি স্বাধীন নন। স্বাধীন হননি মানেই, ঈশ্বরলাভ হয়নি। যত ঈশ্বরের দিকে এগোবেন, যত ঈশ্বরে ডুবে যাবেন, তত অসহায় মনে হবে; এই যে আমি বোধ, এটা মুছে যেতে শুরু হয়। আমি বোধ যত মুছে যাবে, তত এই বোধটা দৃঢ় হতে থাকবে –তিনিই আছেন, তিনিই সব করেন।

এ-ভ্রম তিনিই রেখে দেন, তা না হলে পাপের বৃদ্ধি হত। পাপকে ভয় হত না। পাপের শাস্তি হত না।

স্বাধীন ইচ্ছাটা কি? এটা ভ্রম। ঠাকুরের কথা। এই কথা আপনি কি সমাজে বলতে পারবেন, স্বাধীন ইচ্ছা এটা একটা ভ্রম? একটা গাছের পাতা যে নড়ছে, সেটার জন্য একটা শক্তি লাগে; আর এই শক্তি সব সময় চৈতন্যের উপর নির্ভর। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। কিন্তু যতক্ষণ আপনি ঈশ্বরজ্ঞানের অবস্থায়, আত্মজ্ঞানের অবস্থায় না পৌঁছে যাচ্ছেন, ততক্ষণ এ-সব কথা বলা মুখের কথা, না হলে ঢপের কীর্তন। যারাই কথায় কথায় বলে, ঠাকুরের ইচ্ছা, সব কটা ইন্টারন্যাশানাল ফ্রড। খাওয়া-দাওয়া, থাকা, শোওয়া, নিজের সুবিধা আদায় করা সব কিছুতে আমি, আমি। আর অপরকে যখন শুষে নিতে হবে, তখন বলবে, ঠাকুরের ইচ্ছা। নিজের অপকীর্তি, কুকীর্তি, দুর্নীতি সব ঢাকা দেওয়ার জন্য এদের একটাই ঢাল –ঠাকুরের ইচ্ছা। ভিতরে এই বোধটা সর্বক্ষণ জাগিয়ে রাখা, ঠাকুরই সব করেন, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছুটি হবার জো নাই।

সত্যিই কি ঠাকুরই সব করেন? এটাকে নিয়ে যদি চিন্তন শুরু করেন, দেখবেন এটাই আপনার ধ্যানের একটা বিষয় হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, ভাবের ঘরে চুরি করো না। কিন্তু আমরা ভাবের ঘরে চুরি করছি। একটু আগে যে বললেন, ছাগলকে কেটে ফেলা গেছে, তবু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ছে, তার মানে আমিত্ব থেকে যাচ্ছে। ভিতরটা আমিত্বে গিজগিজ করছে আর বলছেন, মহারাজ, সব ঠাকুরের ইচ্ছা। জপ নেই, ধ্যান নেই, তপস্যা নেই, ওর মধ্যে ডুবে যাওয়া নেই; তারপরেও বলবে, ঠাকুরের ইচ্ছা। 'হিমালয়ে কবে বেড়াতে যাচ্ছেন'? 'এই পূজোর ছুটিতেই যাব মহারাজ'। 'বাঃ হিমালয় বেড়াবার সময় পূজোর ছুটিতে যাব আর বেলুড় মঠে অনেকদিন আসছেন না কেন জিজ্ঞেস করলে বলবে –ঠাকুর আনছেন না, তাই আসা হচ্ছে না'। নিজেরাই একটু বিচার করে দেখবেন কত ফ্রডগিরি করছেন। এটাকেই বলে ভাবের ঘরে চুরি। কত জন্ম লাগবে এদের, ভগবানই জানেন।

যিনি ঈশ্বরলাভ করেছেন, তাঁর ভাব কি জানো? আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন চালাও, তেমনি চলি। যেমন বলাও, তেমনি বলি। এটা কোন ভাব না, সত্যিই এই রকমই দেখেন। ঠাকুর এবার বৈদ্যনাথকে জিজ্ঞেস করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈদ্যনাথের প্রতি) –তর্ক করা ভাল নয়; আপনি কি বল? ঠাকুরের কথা বলাতে একটা বিশেষ ভঙ্গি ছিল, একই ব্যক্তিকে আপনি আর তুমি মিশিয়ে সম্বোধন করতেন। এখানে বলছেন, 'আপনি কি বল', 'আপনি'র জায়গায় 'তুমি' হওয়ার কথা বা 'বল' না বলে 'বলেন' বলতে হত।

বৈদ্যনাথ –আজ্ঞে হাঁ, তর্ক করা ভাবটি জ্ঞান হলে যায়। আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে তর্ক করার আর ভাব থাকে না। বৈদ্যনাতের কথা শুনে ঠাকুর খুব খুশি।

শ্রীরামকৃষ্ণ –Thank you (সকলের হাস্য)। তোমার হবে! বৈদ্যনাথকে বলছেন, তোমার হবে, এত সুন্দর কথা। বৈদ্যনাথ কলকাতা হাইকোর্টের উকিল, পড়াশোনা আছে। অত পড়াশোনা থাকলে অহংকার হওয়া স্বাভাবিক। ঠাকুর বলছেন –**ঈশ্বরের কথা যদি কেউ বলে, লোকে বিশ্বাস করে না**। আজ বেলুড় মঠ হয়েছে, রামকৃষ্ণ মিশন হয়েছে; বেলুড় মঠকে পাঁচজন মানে জানে বলে তাও লোকেরা একটু মানছে, জানছে।

আমাদের আগরতলা আশ্রমের একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। আগরতলা আশ্রমকে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিন একটা বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার রাজ্যপাল, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রী তিনজনই এসেছেন। ওখানকার একজন আদিবাসী নেতা, এমএলএ বা অন্য কিছু হবেন, আমার ঠিক মনে নেই, অনেক আগেকার ঘটনা; তিনি বলতে উঠেছেন।

তিনি বলতে লাগলেন, ‘আমি শুনেছিলাম রামকৃষ্ণ মিশন বিরাট কিছু, কিন্তু আমি জানতাম না। কিন্তু আজ এখানে এসে বুঝলাম রামকৃষ্ণ একটা বিরাট জিনিস। কারণ শিক্ষা মন্ত্রী কোথাও গেলে এক ঘণ্টা দেরীতে যান। মুখ্যমন্ত্রী গেলে দু ঘণ্টা লেট, রাজ্যপাল গেলে তিন ঘণ্টা লেট। আজকে এখানে এই সভায় তিনজনই ঠিক সময়ে আছেন। তার মানে রামকৃষ্ণ মিশন বিরাট জিনিস’। সত্যিকারের ঘটনা, এটা উনি ওনার ভাষণে বলেছিলেন। আমরা তখন ব্রহ্মচারী ছিলাম, ঘটনাটা শুনে আমাদের হাসি আর থামতে চায় না। আজকে বেলুড় মঠ হয়েছে বলে অনেক গণ্যমান্য লোকেরা বলছেন দেখে ওদের লোকেরাও বলছে, রামকৃষ্ণ মিশনে কিছু একটা আছে। রামকৃষ্ণ মিশন না থাকলে পশ্চিমবঙ্গের কি হত বলা যায় না। লোকেরা বিশ্বাসই করতে চায় না, এখনও করে না।

যদি কোন মহাপুরুষ বলেন, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি তবুও সাধারণ লোক সেই মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি ঈশ্বর দেখেছে, আমাদের দেখিয়ে দিগ্‌। কিন্তু একদিনে কি নাড়ী দেখতে শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেকদিন ধরে ঘুরতে হয়; তখন কোন্‌টা কফের কোন্‌টা বায়ুর কোন্‌টা পিত্তের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা, তাদের সঙ্গ করতে হয়ে। (সকলের হাস্য)

অমুক নম্বরের সুতা, যে-সে কি চিনতে পারে? সুতোর ব্যবসা করো, যারা ব্যবসা করে, তাদের দোকানে কিছুদিন থাক, তবে কোন্‌টা চল্লিশ নম্বর, কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সুতা ঝাঁ করে বলতে পারবে।

কদিন আগে ফেসবুকে একজন হিন্দু ধর্মকে নিয়ে খুব গালাগাল দিচ্ছিল। আমি দেখলাম, একে একটা উত্তর দেওয়া দরকার। তিনি হিন্দু ধর্মের কোন বই পড়েননি, হিন্দু ধর্মের কারুর সঙ্গ করেননি; কিন্তু নিজের মনের মত করে হিন্দু ধর্মের নামে যা খুশি নিন্দা করে যাচ্ছেন। যারাই দেখবেন, হিন্দু ধর্মকে নিয়ে নিন্দা করে, রামকৃষ্ণ মিশনকে নিয়ে নিন্দা করে; তাদেরকে খালি এই একটি প্রশ্ন করবেন –হিন্দু ধর্ম নিয়ে আপনি কি কি বই পড়েছেন? যারা মুখ দিয়ে হিন্দু শব্দ বার করে, তাদের মুখে ঠুলি লাগিয়ে দেওয়া দরকার। তোমাদের অধিকার নেই, হিন্দু শব্দ উচ্চারণ করার।

বৈদ্যনাথকে ঠাকুর কেন বলছেন, তোমার হবে? কারণ বৈদ্যনাথের মধ্যে একটা পাত্রতা তৈরী হয়েছে। যদি আপনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করতে চান, আগে আপনাকে শক্তি অর্জন করতে হবে; যেটাকে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। শক্তির শ্রেষ্ঠ অবস্থায় গিয়ে বলতে হয়, মা, তোমাকে লাগবে না। তার মানে, সেই বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা, মাথা নত করার ভাব, তার সঙ্গে একটা ইন্টেলিজেন্স এসেছে। লোকে মনে করে, মন ভাল নেই, ধর্মের কথা শুনলে মন ভাল হয়ে যাবে। ঠিক ঠিক ধর্ম একেবারেই তা নয়। ঠিক ঠিক ধর্ম হল, যার সুস্থ মন, তেজী মন, শক্তিমান, বীর্যবান, তাঁদের জন্যই ঠিক ঠিক ধর্ম। এই যে বৈদ্যনাথকে বলছেন, তোমার হবে; তাঁর ইন্টেলিজেন্স আছে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি আছে, আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। যদি আপনি নিজের ব্যাপারে জানতে চান, আমার কি হবে? সূক্ষ্ম বুদ্ধি হয়েছে কিনা দেখুন। আগে বলা হচ্ছে, বৈদ্যনাথ কৃতবিদ্য, বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত। বিনয়ের ভাব রয়েছে আচার্যের প্রতি, ঠাকুরকে আচার্য রূপে দেখছেন কিনা। তার সাথে শ্রদ্ধা রয়েছে। তবেই আধ্যাত্মিক জীবনে এগোন যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনানন্দে - সমাধিমন্দির

১৫ই এপ্রিল, **১৮৮৩** (পৃঃ **১৭৬**)। ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাড়িতে আছেন। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা, সেই উপলক্ষে আজ ঠাকুরের সুরেন্দ্রের বাড়িতে আগমন। ঠাকুর যেখানেই যান, সেখানেই যে কোন অজুহাতে তিনি হরিনামে, ঈশ্বরনামে মগ্ন হয়ে যান। যার যেটা ভাল লাগে। যিনি যেটা পছন্দ করেন, একটু কোন

সূত্র পেলেই তিনি সেটাতে ডুবে যান। ঠাকুর ঈশ্বরীয় ভাবে এমন নিশিদিন ডুবে আছেন যে, যে কোন কথাকে ধরেই তিনি সেটাকে ঈশ্বরীয় কথাতে নিয়ে যান।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষে সুরেন্দ্র কীর্তনাদির আয়োজন করেছেন। **খোল বাজিতেছে। গোষ্ঠ খোল বাজাইতেছে। গায়করা জিজ্ঞাসা কল্লেন, কিরূপ পদ গাহিবেন। ঠাকুর বিনীত ভাবে বলিলেন 'একটু গৌরাঙ্গের কথা গাও'। কীর্তন আরম্ভ হইল**। অনেকক্ষণ কীর্তন হল। **কীর্তন থামিল। ঠাকুর 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বারবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন**।

যিনি ভগবান, তিনি এই তিনটি রূপ ধারণ করেন। তিনি নিরাকার, তিনিই আবার সাকার হন, তিনিই আবার ভক্ত রূপ ধারণ করে পূজা-বন্দনাদি করেন। আবার তিনি বাণীরূপ ধারণ করে শাস্ত্রাদি গ্রন্থ হন। বেদ সাক্ষাৎ ভগবান। তেমনি ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান। কথামৃতও তাই, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু যে ভাগবত-ভক্ত-ভগবান তা না, কথামৃত যা ঠাকুরও তাই। ঠাকুরের ভক্তরাও তাই। ছোটবেলা থেকে আমরা দেখে আসছি, বই, খাতা, পেন হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলে, মাটি থেকে তুলে মাথায় ঠেকানো হয়। বই, খাতা, পেন সব মা সরস্বতী, সাক্ষাৎ বিদ্যাস্বরূপিণী। কথামৃত পাঠ করার পর বইটাকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করি, এখানেও সেই এক ভাব – কথামৃত সাক্ষাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তেমনি গীতা, উপনিষদ আমরা মাথায় লাগিয়ে প্রণাম করি, কারণ এগুলো ভগবানের সাক্ষাৎ রূপ। যিনি ভক্ত, তিনিও সাক্ষাৎ ভগবানের রূপ। ভাগবত-ভক্ত-ভগবান যেমন, তেমনি কথামৃত-ভক্ত-ঠাকুর, যদিও এটা ছন্দে মেলে না, কিন্তু ভাব একই।

বৈষ্ণবরা খুব সুন্দর বলেন –বৈষ্ণব অপরাধ। ভগবানের ভক্তকে যদি কষ্ট দেওয়া হয়, এই কষ্ট ভগবানকেই দেওয়া হল। ঠিক তেমনি, ঠাকুরের নামে যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছেন, ব্রহ্মচারী হয়েছেন, তাঁদেরও ঠাকুরকে যেভাবে সম্মান দেওয়া হয়, সেভাবেই সম্মান দিতে হয়। যিনি সবে ঘরবাড়ি ছেড়ে এসে ব্রহ্মচারী হয়েছেন, তাঁকেও সেই সম্মান দিতে হয়, কাউকে তুমি বলে সম্বোধন করতে নেই। ঠাকুরের নিরাকার রূপ, সাকার রূপ এগুলো আমরা ধ্যানের গভীরে পাবো। আর সাক্ষাৎ ভক্তরূপে এবং বাঙময়রূপ, বাণীরূপ হল শাস্ত্রকথা।

যাঁরা ইউটিউবে আমাদের ক্লাশগুলো শুনছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এটাই বলার যে, ধর্ম পথ অত সহজ নয় যতটা আপনারা মনে করেন; অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কথামৃত সাক্ষাৎ ঠাকুর, গীতা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান, রামায়ণ যে রূপেই নিন সাক্ষাৎ শ্রীরাম এই জিনিসটা প্রথম যখন বুঝতে শুরু করলেন, এবার আপনার ভাগবত জীবনযাত্রা শুরু হল। প্রথমেই আমরা জানতে চাই, ধ্যান কিভাবে করব, মন কিভাবে একাগ্র হবে; এভাবে হয় না। আগেকার দিনের লোকেরা বাচ্চা বয়স থেকে বাড়ির সংস্কৃতি পেয়ে যেতেন। এখন সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে নূতন করে শেখাতে হয়।

একজন ইয়ং ছেলের সঙ্গে দেখা হল, তার সাধু হবার খুব ইচ্ছা। দিল্লির বড় বাড়ির ছেলে। সোস্যাল মিডিয়ায় পপুলার লেকচারগুলো শুনে এখানে আসা-যাওয়া শুরু করে। একদিন সে এসে আমাকে বলছে, 'দেখুন, আমার খুব ইচ্ছে আত্মজ্ঞান পাওয়া। কিন্তু এই যে ঠাকুরের পূজা করছেন, এত বিধি-বিধান করছেন; এগুলোর প্রতি আমার একটুও শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই। আর স্বামীজী যে সমাজসেবার কথা বলেছেন, এতেও আমি এক পয়সা বিশ্বাস করিনা। আমি এখন কি করব'?

শুনে আমি প্রথমে হাসলাম। পরে আমি ছেলেটিকে বোঝালাম কেন এগুলো দরকার। পূজা-অর্চনা করা, বিধি-বিধান পালন করা এগুলো কোনটাই অর্থহীন হয় না। যে আত্মজ্ঞানের কথা বলছ, ওটারাই concretise form হল ritual। অনেক কম বয়স থেকে আমার অভ্যাস, স্নানের পর শরীরে দু ফোঁটা গঙ্গাজল ছিটাই। গঙ্গাজল ছিটালে কি হয়? Meaningless ritual। জগন্নাথ মহাপ্রভুর আঁটকে প্রসাদ দু-দানা খাই। এতে কি হবে? যে কোন ধর্মে যাঁরা ধর্ম পথে আসেন, তাঁরা জানেন, তাঁরা

মানেন যে, আমার স্পিরিচুয়াল ক্লিঞ্জিং দরকার। আমি কোন ভাবে অপবিত্রতাতে জড়িয়ে গেছি, খ্রীশ্চানরা এটাকেই অরিজিন্যাল সিন্ বলে, we are born sinners। আমরা মানি না যে আমরা জন্ম থেকেই পাপী, কিন্তু আমরা মানি যে অশুদ্ধতা, অপবিত্রতাতে আমরা জড়িয়ে গেছি। সেইজন্য আমাদের স্পিরিচুয়াল ক্লিঞ্জিং দরকার। স্পিরিচুয়াল ক্লিঞ্জিং কিভাবে হবে? জপধ্যান করে, তপস্যা করে। ওটারই সিম্বলিক হল, রোজ স্নান করা, যতই ঠাণ্ডা থাকুক রোজ স্নান করা চাই। নিত্য বস্ত্র ধৌত করা। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে উলের জিনিস অপবিত্র হয় না, সেইজন্য উলের জিনিসকে রোজ ধোওয়ার দরকার নেই। শৌচ কেন দরকার? কারণ শৌচ সোজা জড়িয়ে রয়েছে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে।

আপনার কাছে যেটা মনে হচ্ছে অর্থহীন, জেনে রাখুন হিন্দু ধর্মে অর্থহীন বলে কিছু নেই। যার জন্য দেখুন খ্রীশ্চানরা ব্যাপ্টিজিম্ করে, প্রার্থনা করতে যাওয়ার আগে মুসলমানরা ওজু করে হাত-পা ধুয়ে নেয়। আসলে এই সব কিছুই হল স্পিরিচুয়াল ক্লিঞ্জিং। ঠিক তেমনি আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুমি বলছ অহং ব্রহ্মাস্মি, সব কিছু আমার থেকে বেরিয়েছে, সমাজসেবা করার সময় তুমি বলছ, আমি এটা মানিনা। এগুলো হল স্পিরিচুয়াল গ্ল্যামার। কোথাও কোন গ্ল্যামারাস লোকের কথা শুনে নিয়েছে, বা কোন কিছু শুনে নিয়েছে; আমিও সেই রকম হব বলে নেমে পড়েছে। এভাবে কি ধর্ম পথে পা রাখা যায়? কত জন্মের, কত সাধনা, কত পূণ্যের ফলে মানুষ ধর্ম পথে আসে। যখন এগুলো দিয়ে শুরু হয়, তখন বুঝবেন ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, কথামৃত-ঠাকুর-ঠাকুরের সন্তান, সন্তান মানে ঠাকুরের সব ভক্তরা; এরা এক। এগুলো প্রথমে অনুশীলন করতে হয়, সেখান থেকে ধীরে ধীরে এগোতে শুরু হয়। যাই হোক, এগুলো আমরা আগে আলোচনা করে নিয়েছিলাম। এরপর আমরা তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রবেশ করছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাকার-নিরাকার

ঠাকুর এবার সাকার-নিরাকারে নামছেন। রাত প্রায় সাড়ে নটা হয়ে গেছে। সুরেন্দ্রের বাড়িতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরদালান আলো করে আছেন। সেখানে অনেকে আছেন, সুরেন্দ্র, রাখাল, কেদার, মাস্টার, রাম, মনোমোহন। সব হয়ে গেছে। ভক্তরা এবার যে যার বাড়ি ফিরে যাবেন। সেই সময় সুরেন্দ্র হঠাৎ বলছেন –

সুরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) –আজ কিন্তু মায়ের নাম একটিও হল না। সুরেন্দ্র একজন ভক্ত, তবে সেই রকম উচ্চমানের ভক্ত নন, কিন্তু ঠাকুরকে ভালবাসেন। এর আগে যে গান হয়েছিল বেশির ভাগই গানই কৃষ্ণ বিষয়ক হয়েছিল। ঠাকুর সরাসরি উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে কথাটা নিয়ে গেলেন। এই জায়গাটা খুব সুন্দর। মায়ের নাম হয়নি, ঠাকুর কিছু বললেন না, বদলে তিনি সুন্দর করে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঠাকুরের প্রতিমা দেখাইয়া) –আহা, কেমন দালানের শোভা হয়েছে। মা যেন আলো করে বসে আছেন। এসব কথা কত উচ্চমানের কল্পনা করতে পারেন? কত গভীর আলোচনা, কত উচ্চমানের আলোচনা। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আলো করে বসে আছেন, এখানে কোন কল্পনা নেই। **এরূপ দর্শন করলে কত আনন্দ হয়**।

অনেক আগে একবার দূর্গাপূজার সময় আমি হরিদ্বার গিয়েছিলাম। ওখানকার বড় মহারাজ আমাকে একটু একটু চিনতেন, এখনও আছেন। আমাকে বলছেন, 'বেলুড় মঠের আনন্দের হাট ছেড়ে কি করতে ভাই এখানে এলে'? এই ঘটনা পঁচিশ বছরের উপর হয়ে গেছে। আজও আমার কানে এই কথাটা বাজে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত দূর্গাপূজার সময় বেলুড় মঠ ছেড়ে আমি কোথাও যাইনি। তখন অবশ্য আমি বেলুড় মঠে ছিলাম না, কলকাতারই একটা সেন্টারে ছিলাম। আমাকে যদি কেউ বলে,

পূজার সময় আপনি কোথাও যাচ্ছেন? আনন্দের হাট ছেড়ে কোথায় যাব? এই নয় যে আমি সব কাজ ছেড়ে সারাক্ষণ পূজার মণ্ডপে বসে আছি; দিনে দুবার-তিনবার প্রণাম করতে যাই, তার বেশি না। পূজার সময় লোকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে সারা রাত প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে ঠাকুর দেখে, ফুচকা খায়, ফাস্ট ফুড খায়। যারা খাচ্ছে খাক, কিন্তু যিনি ভক্ত তাঁর জন্য জিনিসটা আলাদা।

মায়ের এরূপ দেখলে কত আনন্দ। আর কি হয়? ঠাকুর বলছেন, **ভোগের ইচ্ছা, শোক –এ-সব পালিয়ে যায়**।

আচার্য শঙ্কর গীতার উপর ভাষ্য লিখতে গিয়ে যে উপোদ্‌ঘাৎ দিচ্ছেন, সেখানে তিনি এটাই বলছেন –শোক আর মোহ এটাই সংসার। তার সাথে আচার্য দেখাচ্ছেন আত্মজ্ঞান দিয়ে কিভাবে শোক মোহ নাশ হয়ে যায়। ঠাকুর এখানে একই কথা বলছেন, মায়ের দর্শন হলে কিভাবে শোক আর মোহ চলে যায়। মোহটা এখানে হল কামের ইচ্ছা। যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, আপনাদের সবারই, একজনেরও অন্য রকম হবে না; যদি আপনারা বেলুড় মঠে ঠাকুরের সামনে বসে থাকেন, দূর্গাপূজায় মায়ের সামনে যদি বসে থাকেন; মন থেকে কিছুক্ষণের জন্য জগৎ যে সরে যায়; অবশ্যই আপনারা এই অনুভব করে থাকবেন।

এখান থেকে আর-এক ধাপ এগিয়ে যদি কল্পনা করেন, ঠাকুর যদি সাক্ষাৎ হন, তাহলে কি হবে? শোক মোহ চিরদিনের জন্য চলে যাবে। স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন, বাড়িতে অন্নাভাব। ঠাকুরকে কোন দিন কিছু জানাননি। ঠাকুর বললেন, যা মায়ের কাছে গিয়ে চা, মায়ের কাছে যা চাইবি তাই পাবি। মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে মায়ের চিন্ময় রূপ দেখে স্বামীজীর শোক মোহ চলে গেছে, এরপর তিনি কি আর চাইবেন! কিছু চাইতে লজ্জা করছে, নিজেকে ছোট বলে মনে হয়।

একটা ঘটনা আগেও অনেকবার বলেছি। এক সময় আমি একটা সেন্টারে ছিলাম, তখন বয়স কম ছিল। বয়স কম হওয়াতে যা হয়, ভুলভাল দিকে তেজ বেশি দেখাতাম, ওটা তো আর তেজ নয়, ওটা স্টুপিডিটি। সেন্টারে একটু রাগারাগি হয়েছে। বেলুড় মঠে চলে এলাম, এই ভেবে যে কর্তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। তখন স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ অধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাজ আমাকে খুব স্নেহ করতেন। মহারাজকে প্রণাম করতে গেছি, মহারাজ আমাকে চিনতেন, আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে গেছেন। 'কবে এলে'? জিজ্ঞেস করলেন। ওই দুটি শব্দ, 'কবে এলে', ওর মধ্যে এমন মাধুর্য, স্নেহভাব ঝরে পড়ছে যে, আমি যে বলব সকালে এসেছি, কর্তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে, ভেবেই নিজেকে এত ছোট বলে বোধ হল যে, নিজেকেই ছি ছি করতে লাগলাম। এত বড় মহাত্মা, একজন ঋষি সামনে বসে আছেন, এনার সামনে এই রকম একটা চিন্তা আসাটাও কত বড় হীন মনের পরিচয়! শুধু যে চুপ করে গেলাম তা না, সমস্ত ক্ষোভ পুরো শান্ত হয়ে গেল। আমি প্রসঙ্গটা তুললাম না।

তাঁর কাছে গিয়ে আপনার শোক মোহ যদি দূর না হয়ে যায়, তাঁর কাছে আপনার আর যাওয়ার দরকার নেই। একজন সন্ন্যাসীর কাছে গেলেন, পাঁচ মিনিট বসলেন, শোক মোহ যদি দূর না হয়ে যায়, তাঁর কাছে আপনার আর যাওয়ার দরকার নেই। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ, তাঁর দর্শনেই আপনার শোক মোহ দূরে চলে যাবে। ঠাকুর যেমন বলছেন মা অন্নপূর্ণাকে নিয়ে, ভোগের ইচ্ছা, শোক –এ-সব পালিয়ে যায়। এখানে ভোগের ইচ্ছাটাই কাম, এগুলো হল মোহের বিকার। মা অন্নপূর্ণা তিনি হলেন শুদ্ধ আত্মা। শুদ্ধ আত্মা এত বড় রাজা যে, মন তার কাছে কিছুই না; যেন পাহাড়ের সামনে একটা পিঁপড়ে।

তবে নিরাকার কি দর্শন হয় না –তা নয়। বিষয়বুদ্ধি একটুও থাকলে হবে না; ঋষিরা সর্বত্যাগ করে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা করেছিলেন।

এইজন্যই ভক্তির কথা বলা হয়। বলা হয় কারণ, লোকেদের মনে হয়ত একটু ভোগের ইচ্ছা আছে, কোন শোক বা অন্য কিছু আছে। যেমন ভক্ত ধ্রুবের গল্পে আমরা দেখি, তাঁর ইচ্ছা ছিল সাম্রাজ্য

ফেরত পাওয়া। গীতাতেও ভগবান একই কথা বলছেন, যারা অর্থার্থি তারাও আমার কাছে আসে। কিন্তু নিরাকার চিন্তন যেখানে হবে, সেখানে কিচ্ছুটি চলবে না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, *অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে,* অল্প একটু দেহবোধ যার আছে, তার দ্বারা অব্যক্তের বা নিরাকারের সাধনা হয় না। ঋষিরা সর্বস্ব ত্যাগ করে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা করতেন। আমরা অত্যন্ত গভীর হৃদয়স্পর্শী আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করছি। এগুলো যদি নিজের হৃদয়ে অনুভব করতে পারেন ভাল, এখানে বুদ্ধি দিয়ে বোঝার কিছু নেই।

ইদানিং ব্রহ্মজ্ঞানীরা 'অচল ঘন' বলে গান গায়, –আমার আলুনি লাগে। যারা গান গায়, যেন মিষ্টরস পায় না। চিটেগুড়ের পানা নিয়ে ভুলে থাকলে, মিছরীর পানার সন্ধান কত্তে ইচ্ছে হয় না।

তোমরা দেখ, কেমন বাহিরে দর্শন কচ্ছ আর আনন্দ পাচ্ছ। যারা নিরাকার নিরাকার করে কিছু পায় না, তাদের না আছে বাহিরে না আছে ভিতরে। যাঁদের কাছে কথামৃত আছে তাঁরা এই শেষ বাক্যটা আণ্ডারলাইন করে নেবেন –যারা নিরাকার নিরাকার করে কিছু পায় না, তাদের না আছে বাহিরে না আছে ভিতরে।

রাজা রামমোহন রায় এবং তখনকার আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লোক মনে করলেন যে হিন্দু সমাজে অনেক দোষক্রটি আছে, ওই দোষক্রটিগুলো ওনারা ঠিক করবেন। রামমোহন রায় অনেক কিছু করলেন, তার মধ্যে তখনকার দিনে যে সতীদাহ প্রথা ছিলে সেটাকে তিনি রদ করতে সফল হলেন। সতীদাহ প্রথা সামাজিক ইস্যু ছিল না, পুরোপুরি অর্থনৈতিক ব্যাপার ছিল, সম্পত্তির দায়ভাগের ব্যাপার জড়িয়ে ছিল। সারা ভারতে এই প্রথা ছিল না। সতীদাহ আমাদের ব্যাপার না। যদিও পরের দিকে উপন্যাসাদিতে এই প্রথাকে এমন ভাবে তুলে ধরা হতে শুরু হল যে, মনে হত ভারতের সমস্ত বিধবাদের পুড়িয়ে দেওয়া হত। ব্যাপারটা তা ছিল না। রানী রাসমণী নিজেই সেই সময়কার বিধবা ছিলেন। কিন্তু সতীদাহ প্রথা যে ছিল না তা নয়, ছিল। রামমোহন রায়ের সময় কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। রাজধানী মানেই সেখানে বিভিন্ন ধরণের লোকজনের আসা-যাওয়া হবে।

তখন মুসলমানী প্রভাব ছিল, সেখান থেকে খ্রীশ্চানী প্রভাব আসতে শুরু হয়। মুসলমানরা নিরাকার নিরাকার করে, মুসলমানরা মুসলমান ছাড়া যতজন আছে সবাইকে নিরাকার করবে, আকৃতিটাই সরিয়ে দেবে। আর খ্রীশ্চানরা নিজেরা চার্চে যীশু খ্রীষ্টের পূজা করে, কিন্তু নিজেদের বলে নিরাকার; বিচিত্র ধর্ম। এরা সবাই একদিকে একেশ্বরবাদকে বিশ্বাস করে, ঈশ্বর এক। কিন্তু অন্য দিকে হেভেন আর হেল দুটোই মানে, কি করে হয়? ওদের কিছু যুক্তিতর্ক আছে, সেগুলো দিয়ে একটা উত্তর দিয়ে দেয়। অদ্বৈতী হওয়া অত সোজা না, নিরাকারে অত সহজে যাওয়া যায় না। ঠাকুর বলছেন, না আছে বাহিরে, না আছে ভিতরে; ফলে শুষ্ক হয়ে যায়।

রামমোহন রায়ের মনে হল, তিনি হিন্দু ধর্মকে একটু শোধরাবেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে গিয়ে সেখানেই গত হয়ে গেলেন। তারপর এলেন কেশবচন্দ্র সেন। এনারা সবাই তখনকার কলকাতার সব নামকরা লোক। টাকা-পয়সা, মান-সম্মান, তখনকার দিনের নিউজপেপার সব কিছু এনাদের হাতে ছিল। মানুষের কি হয়, যারা বিখ্যাত লোক, বড়লোক, তাঁরা যেটা করবেন সাধারণ মানুষ সেটাই করবেন আর তাঁদের পিছন পিছন যাবেন। কারণ মহাপুরুষরা যে পথে যান বাকিরা সেই পথে চলে।

যেমন জওহরলাল নেহরু ছিলেন দেশের নেতা, তিনি সোশ্যালিজমের কথা বলতে শুরু করলেন। ভাকরা-নাঙ্গাল ড্যাম উদ্বোধন করে নেহরুজী বললেন –Temple of modern India। আমরাও সবাই তাই বলতে শুরু করলাম –Temple of modern India। তিনি বললেন সেকুলার, আমরাও বললাম সেকুলার। রামমোহন বললেন, নিরাকার; হঠাও সব মূর্তিপূজা। তৈরী হল ব্রাহ্মসমাজ। স্বামীজীকে তাঁর বাবা বলতেন, কোথা থেকে একটা ব্রহ্মদৈত্য এসেছে, ব্রাহ্ম হয়ে গিয়েছিলেন কিনা।

পরে কেশবচন্দ্র সেন এই পথ আরও প্রশস্ত করে দিলেন। কিন্তু কি হয়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ না হয়ে থাকলে তাঁর দ্বারা ধর্ম প্রচার বেশি এগোতে পারে না, একটা জায়গায় এসে অচল হয়ে থেমে যায়।

মোঘল আমলেও ভারতবর্ষে একই জিনিস দেখা গেছে। আকবর এত বড় বাদশা, তাঁর এত ক্ষমতা; তিনি শুরু করলেন নূতন ধর্ম, যার নাম 'দিনে ইলাহী'। রামমোহন রায়ও রাজা ছিলেন, নূতন ধর্ম প্রবর্তনের ব্যাপারে তিনি যেন আকবরের সেকেণ্ড এডিশান এসেছিলেন। আকবর যেভাবে ইসলাম, বেদান্ত থেকে বেছে বেছে সুন্দর সুন্দর কথাগুলো নিয়ে একটা নূতন ধর্ম দাঁড় করাতে চাইলেন; পরবর্তি কালে যেটা ব্রাহ্মসমাজও করতে চাইলেন। অরিজিন্যাল কিছু নেই, কিছুটা ওখান থেকে, কিছুটা সেখান থেকে নিয়ে শুরু করলেন নববিধান। ওই একই পরম্পরায় পরে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই নামগুলো বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের তালিকায় জ্বলজ্বল করছে। আমরা যদি একশ বছর আগের বাংলার ছবিটা কল্পনা করি; ১৯২১ কি ১৯২২ সাল, তখন যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে কজন লোক জানতেন! কিন্তু ধর্ম এভাবে চলে না।

আপনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক হতে পারেন, বড় সাহিত্যিক হতে পারেন, তাই বলে আপনি ধর্মকে বিষয় করে যে লোকেদের মধ্যে প্রচার করতে নামবেন, তা কখনই সম্ভব না। কারণ ধর্ম আপনার বিষয় নয়। ফলে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম কিছু দিন পর থেকে টলমল করতে শুরু করল, ডুবেই গেল। এখনও কিছু ব্রাহ্ম পাবেন, যাঁরা এখনও নিরাকার বলেন, আর শিবলিঙ্গকে লিঙ্গ মনে করেন। অনন্তের আবার লিঙ্গ হয়, এটা ব্রাহ্মদের বুদ্ধিতেই হয়, আমাদের বুদ্ধিতে হয় না। আমরা কৃষিপ্রধান দেশ, আমাদের কাছে ফার্টিলিটি জিনিসটার প্রচণ্ড গুরুত্ব। গরু যদি বাছুর না দেয় আর মাটি যদি ফসল না দেয়, আমরা শেষ। আমরা সামুদ্রিক লোক নয় যে, নৌকা করে মাছ ধরে এনে সেটাকে খাবো। আমাদের এখানে ফার্টিলিটির প্রচণ্ড গুরুত্ব। ফার্টিলিটির যে ক্ষমতা তাতে তাঁর পূজাতে দোষের কি আছে?

ঠাকুর বলছেন, কলকাতার লোকগুলো হুজুগে আর খালি লেকচার। এখনও তাই, কিছু পাল্টায়নি। কিছু গান নিয়ে, দু-চারটে কথাকে নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে, সেটাই হল তাদের ধর্মের সংস্কৃতি আর বলছে, হিন্দুরা ভুল পথে যাচ্ছে। একটাও হিন্দু শাস্ত্র না পড়ে এনারা নাকি হয়ে গেলেন হিন্দু ধর্মের সর্বজ্ঞ। দুটো কবিতা ওখানে পড়েছে, দুটো ছড়া সেখানে পড়েছে, নিউজপেপারে দুটো লেখা পড়ে নিয়েছে, তাতেই হয়ে গেল হিন্দু ধর্মের সর্বজ্ঞ। এসে বলবে, আমি কিন্তু আপনার কথা মানতে পারছি না। মাঝে মাঝে আমাদের সাথে তর্ক করতে আসে।

সব তর্কের ক্ষেত্রে আমার প্রথম প্রশ্ন হল, আপনি যে বক্তব্য রাখছেন, আপনার বক্তব্যের আধার কি? প্রথম কথা, আপনি কি ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করেছেন? না। আপনি তাহলে নিশ্চয় বই পড়ে থাকবেন। আপনি বলুন কি কি বই পড়েছেন, তাহলে আমি উত্তর দিতে পারব। বর্তমান কালে কলকাতা ও তার আশেপাশের লোকেরা নিজেদের বুদ্ধিজীবী, নিজকে যুক্তিবাদী ইত্যাদি নূতন নূতন নাম নিয়ে আসছে, কেউ ওই ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে, কেউ সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে, কেউ রীডার, কেউ অধ্যাপক, সবাই এসে হিন্দু ধর্মকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। যদি আপনি সামাজিক দোষ নিয়ে কথা বলেন, কোন সমাজে দোষ নেই, যদি থাকেই আপনি শোধরাবার চেষ্টা করে দেখুন। আর ধর্মের দিক দিয়ে যদি বলেন, হিন্দু ধর্ম সবারই ঠাকুরদা, ঠাকুরদা বলাটাও খুব ছোট করে বলা হচ্ছে।

স্বামীজী বলছেন, অন্যান্য ধর্মগুলি যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে, সব ধর্ম খুব হলে আমাদের পৌরাণিকের মধ্যে এসে যাবে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ, হিন্দু ধর্মের বিশাল শাস্ত্র ভাণ্ডার থেকে শুধু যদি এইটুকু নিয়ে নেন, দেখবেন বাকি সব ধর্ম ওর মধ্যেই ঢুকে যাচ্ছে। আর হিন্দুদের বাকি যে গ্রন্থরাশি আছে, তার ধারে কাছেই কেউ যেতে পারবে না। ভাগবতে রাসলীলাতে পরিষ্কার বলছেন,

শ্রীকৃষ্ণের তখন মাত্র আট বছর বয়স, সেখানে এরা বলছে কৃষ্ণ নাকি মেয়েদের পিছনে দৌড়াচ্ছে! ভাগবত গ্রন্থটা একবার খুলে দেখুন কি বলছে, কৃষ্ণের তখন আট বছর বয়স।

এখন রাজা রামমোহন রায় যেটা শুরু করলেন, যা কিনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত চলল; সেই ব্রাহ্মসমাজ শুধু নিরাকার নিরাকার করে গেল। অথচ সেই সময় ঠাকুর বলছেন, যারা নিরাকার নিরাকার করে, তারা কিছু পায় না। এই কথা যে শুধু ব্রাহ্মভক্তদের জন্য বলা হচ্ছে তা না, অন্যান্য ধর্মকে নিয়েও বলা যায়। তাদের না আছে বাহিরে না আছে ভিতরে। তাই বলে কি নিরাকার সাধন হয় না? কেন হবে না, অবশ্যই হয়। এর আগের অনুচ্ছেদেই ঠাকুর বলছেন, ঋষিরা সর্বস্ব ত্যাগ করে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের চিন্তা করেছিলেন। আগে ভাই তোমরা সমস্ত ত্যাগ কর। বছর বছর সন্তানোৎপাদন করব, সাথে সাথে নিরাকারের কথাও বলব, আর সাকারবাদীদের আদ্যশ্রাদ্ধ করব, এই জিনিস তো বাপু বেশি দিন চলবে না। কামিনী-কাঞ্চনে মন ডুবে আছে আর তুমি নিরাকারের কথা বলছ? যার মধ্যে একটুও দেহবোধ আছে, যার মধ্যে একটুও আমিত্ব বোধ আছে, নিরাকার সাধন তার জন্য নয়।

আমাদের এখানে অনেক রকম লোক আসে, অনেকে এসেই বলবে, 'আমি ঠিক God with form মানি না, আমি formless God মানি'। ঠাকুর বলছেন, হেলে ধরতে জানে না, কেউটে ধরতে যায়। তোমার মনটা ভোগে গিজগিজ করছে আর তুমি কিনা নিরাকারের কথা বলছ, formless Godএর কথা বলছ? তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসতে পারছ না, তুমি কিনা ঈশ্বরকে ভালবাসবে? আবার বলছ নিরাকারের সাধনা করবে, তোমার সেই দম আছে? ঠাকুর সেইজন্য বলছেন আলুনি লাগছে। এই প্যাসেজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গান লেখার ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য চলে না, কাব্যগুণ চলে না, সেখানে দেখা হয় অনুরাগ। অনুরাগ আসা মানে, ভিতরে ওই ভালবাসা একটু জাগল, তখন যে গানগুলো বেরোবে, সেই গান থেকে মাধুর্য চুয়ে চুয়ে পড়বে। ঠাকুর বলছেন, ইদানিং ব্রহ্মজ্ঞানীরা 'অচল ঘন' বলে গান গায়, –আমার আলুনি লাগে, টেস্টলেস। একটু তীর চালানো শিখেই বলছে উড়ন্ত পাখিকে মারবে।

আমাদের যে কোন সেন্টারে 'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দু ভাই এসেছে রে' এই গান শোনার যদি আপনার সৌভাগ্য হয়, দেখুন আপনার ভিতর কি অনুভূতির উদয় হচ্ছে। নিরাকার বিষয়ক গান শুনে আপনার মন কি নিরাকারে লয় হয়ে যাচ্ছে? যদি না হয়, বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। কিন্তু যেই আপনি শুনবেন 'তারা তারা দু ভাই এসেছে রে', নিজে থেকেই আপনার মনে হবে মনটাকে ছেড়ে দিই, আমিও নৃত্যে নামি। কোথাও আপনাকে ছুঁয়ে দিচ্ছে।

সাকারে কি হয়? সামনে একটা আকার আছে, সেই আকারকে কেন্দ্র করে আপনি একটা আলম্বনকে ধরে ওঠার চেষ্টা করছেন। সেটাই ধীরে ধীরে ভিতরে আসে। আমার ভিতরেও তো নেই। কিন্তু আমি জানি আমার বাইরে আছে, ঠাকুর আমার সামনে আছেন। দেশে বিদেশে যেখানেই থাকি, সেখান থেকে একবার যেই হাওড়া স্টেশনে এসে নামলাম, আমি জানি এবার আমি বেলুড় মঠে এসে যাবো। নিরাকারে কি হবে, কোথায় ফিরবেন আপনি, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার; নিরাকারে আপনি সর্বব্যাপী, ফেরা-ফেরির কোন প্রশ্নই নেই। ভিতরে সেই অনুভূতি যদি না থাকে, যা অল্প একটু আছে সেটাও উড়ে যাবে। থিয়োরেটিক্যালি বড় বড় কথা মুখে বলা যায়।

আর ঠাকুরের এসব তো কিছু ছিল না যে, আমাদের মত পলিট্যাক্যালি কারেক্ট থাকতে হবে। এটা করা যাবে না, সেটা করা যাবে না; ঠাকুরের এসব কিছু ছিল না। ঠাকুর তাই বলছেন –তোমরা কেমন বাইরে দর্শন করছ, আনন্দ পাচ্ছ। যারা নিরাকার নিরাকার করছে তারা কিছুই পাচ্ছে না। তারা বলছে এগুলো পৌত্তলিকতা। আরে ভাই পৌত্তলিক হয়ে মূর্তি পূজা করে যদি ঠাকুরের মত একজন হতে পারে, তাহলে তো চাইব সারা বিশ্ব পৌত্তলিক হয়ে যাক। আমরা পৌত্তলিক হতে পারি, কিন্তু কারুর গলা কাটতে যাই না, কারুর পকেটও কাটি না। সারা বিশ্বের সম্পত্তিকে খ্রীশ্চানরা শুষে ইউরোপে নিয়ে গেল। এখন আর শুষতে পারছে না, অর্থনীতিতে ওদের আজ তাই এই গোলমাল, সেই গোলমাল।

সুরেন্দ্র যখন বলেছেন, মায়ের নাম একটিও হল না। ঠাকুরও তাই মায়ের নাম করে দুটি গান করছেন। প্রথম গান –গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না; দ্বিতীয় গান –বল রে বল শ্রীদুর্গানাম। (ওরে আমার মন রে)। গান করার পর আবার প্রতিমার সম্মুখে এসে প্রণাম করলেন। কিন্তু কেমন একটা ভাবে চলে গেছেন।

এইবার সিঁড়িতে নামিবার সময় ডাকিয়া বলিতেছেন, 'ও-রা-জু-আ'? (ও রাখাল, জুতো সব আছে, না হারিয়ে গেছে?)। এই জায়গাটা এত ফানি। এতক্ষণ নিরাকার সাকারের কথা, মায়ের নাম, স্পষ্ট করে কথা বলতে পারছেন না, মন এমন ডুবে রয়েছে, ভাবে নদে টলমল। রাখাল বলতে পারছেন না, বলছেন 'রা', জুতো বলতে পারছেন না, বলছেন 'জু', মন এমন ডুবে গেছে। ঠাকুর মন্দিরের সামান্য পুরোহিত, টাকা-পয়সা নেই, জুতো চুরি হয়ে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। সংসার মিথ্যা নয়, সংসার পুরো সত্য, নাহলে ঠাকুর জুতো আছে কিনা, এটা নিয়ে ভাবতেন না। লাটু মশলার বটুয়া আনতে ভুলে গেছে, ঠাকুর বকলেন না। যার আছে হেথা তার আছে সেথা। জগৎটাকে আপনার ঠিক রাখতে হবে। কিন্তু অনাসক্ত, অনাসক্ত মানে এই না যে জুতোর খেয়াল রাখবেন না। যদি জুতো চলে যেত তিনি ওই নিয়ে কোন শোক করবেন না, কিন্তু সাবধান থাকতে হবে। 'ও-রা-জু-আ' এটা মাস্টারমশায় ব্রেকেটে লিখে না দিলে আমরা বুঝতেও পারতাম না, ঠাকুর কি বলতে চাইছেন।

ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। সুরেন্দ্র প্রণাম করিলেন। অন্যান্য ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন। রাস্তায় চাঁদের আলো এখনও আছে। ঠাকুরের গাড়ি দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বেণী পালের সিঁথির বাগানে শুভাগমন করিয়াছেন। ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (পৃ-১৭৮)। পনের দিন হয়ে গেছে। এখানেও ব্রাহ্মভক্তরা আছেন। ঠাকুর যেখানেই যেতেন সেখানেই ব্রাহ্মভক্তরা থাকবেন।

ব্রাহ্মভক্তরা ঠাকুরকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন। একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করলেন – **মহাশয়, উপায় কি?**

শ্রীরামকৃষ্ণ –উপায় অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে ভালবাসা। আর প্রার্থনা।

ব্রাহ্মভক্ত –অনুরাগ না প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ –অনুরাগ আগে, পরে প্রার্থনা।

ডাক দেখি মন ডাকার মতন, কেমন শ্যামা থাকতে পারে...

– **শ্রীরামকৃষ্ণ সুর করিয়া এই গানটি গাইলেন**।

এই বিষয়টা কথামৃতের একটা মূল বিষয়, যেমন যেমন আগে এসেছে আমরা আলোচনা করেছি। তবে এই জায়গাতে আরও একবার বলা যেতে পারে। কথামৃতের অনেক জায়গায় দেখবেন, কেউ হয়ত জপ করে যাচ্ছে, কেউ নিয়ম করে মন্দিরে যাচ্ছে বা গঙ্গাস্নান করছে; কিন্তু ঠাকুর এদেরকেও নিন্দা করতেন। দয়ানন্দ সরস্বতী এত বড় পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। সমাজকে যদি ঠিক করতে চান, তাহলে আগে তার ধর্মকে আনতে হবে। দয়ানন্দ সরস্বতী বললেন, আমি বেদের ধর্মকে সামনে রাখব; তৈরী করলেন আর্য সমাজ। রামমোহন রায় থেকে শুরু করে

কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত, তাঁদের কাছেও এটাই ছিল, সমাজকে আগে ঠিক করতে হবে। তিনি সামনে রাখলেন নিরাকার সাধন, একটা নূতন আদর্শ না দিলে সমাজ তো পাল্টাবে না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, রামকৃষ্ণ মিশন কোন ভাবেই সমাজ শোধারক নয়। অথচ স্কুল, কলেজে আমরা ইতিহাস, সিভিক্স পড়ার সময় দেখেছি সেখানে ব্রাহ্মসমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন সবাইকে এক সঙ্গে রাখা হয়েছিল। ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকে অন্যান্যদের সাথে রামকৃষ্ণ মিশনকেও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন অত বুঝতাম না, কিন্তু এখন বুঝি, এটা খুব অন্যায় হয়েছে। আমরা সমাজ সংস্কারক নই। আমাদের কাজ হল মূল হিন্দু ধর্মকে সামনে রাখা, সমাজ নিজেই নিজেকে ঠিক করে নেবে। শিকড়ে জল দিলে গাছ নিজেই ঠিক হয়ে যাবে। অনেক জায়গায় ঠাকুর এই জিনিসগুলিকেই নিন্দা করছেন, বলছেন –এতো তো জপ করে কিন্তু কিছুই তো হয় না।

আমাদের সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা মজার জোক আছে। অন্ধকার ঘরে বসে জপ করে যাচ্ছে। একজন জিজ্ঞেসে করলেন, 'কি খবর, বাইরে যেমন অন্ধকার, ভিতরে তেমনই অন্ধকার তো'? বয়স তখন কম ছিল, তাই তো হওয়ার কথা, চোখ বন্ধ করলে অন্ধকারই দেখব। বাইরে যেমন অন্ধকার ভিতরেও তেমন অন্ধকার। অনুরাগ জিনিসটা কার আসে, কখন আসে, কিভাবে আসে; আসলে এর কোন উত্তর নেই।

ঠাকুর প্রার্থনা করতে বলছেন। আমি এতদিনে নিজে যা বোঝার বুঝেছি তা হল, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ঠাকুরের কাছে গিয়ে মাথা ঠুকে ঠুকে যদি প্রার্থনা করেন; ঠাকুর ভক্তি দাও, ঠাকুর কৃপা কর; ভক্তি হয়ে যেতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কিন্তু তখন আসে অনুরাগ, এই অনুরাগের পর হয় প্রার্থনা। অন্য ধরণের একটা বর্ণনা আছে।

যীশু খ্রীষ্ট, ছোট বয়স থেকে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল। মাঝে মাঝেই তিনি পাহাড়ে চলে যেতেন। সেই সময় জুহুদিদের ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুদ্ধিকরণ করা হত। যিনি শুদ্ধিকরণ করতেন, তিনি বলতেন, 'আমি তোমাদের জল দিয়ে শুদ্ধ করছি। আমাদের পিছনে যিনি আসছেন তিনি তোমাদের আগুন দিয়ে, অর্থাৎ স্পিরিট দিয়ে শুদ্ধ করবেন'। যীশু এলেন শুদ্ধ হওয়ার জন, জন দা ব্যাপটিস্ট দেখেই চিনতে পারলেন। 'আপনাকে আমি কি শুদ্ধি করব'! যীশু বললেন, 'না, যেমন বিধি তেমনটিই হবে'। যেমনি যীশুকে ব্যাপ্টাইজ করা হল, বাইবেলে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে – আকাশ খুলে গেল। আকাশ তো খুলবে না, সবাই আকাশ দেখছে; এখানে ভিতরের আকাশের কথা বলছেন। ঠাকুর যখন মা কালীকে বলছেন, বেঁচে থেকে লাভ কি; খড়্গ তুলে নিলেন, মা কালী সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধরে নিয়েছেন আর ঠাকুর বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন।

এগুলো হল ভাবসাম্রাজ্যের বর্ণনা। যীশু সেই জায়গায় দেখছেন, ভগবান যেন ঘুঘু পাখি হয়ে তাঁর কাঁধে বসে আছেন। যীশু সেখান থেকে সরাসরি চলে গেলেন আর চল্লিশ দিন না খেয়ে উপাসনা করলেন। এটা ঠিক যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যীশুর তুলনা চলে না। তবে এবার যে ভগবানকে দেখলেন, সেখানে যে অনুরাগ, এই অনুরাগ বিষয়ীদের ধারণার বাইরে। ঠাকুরের দেখুন, ঠাকুরের সাধনা শুরু হয়, মা কালীকে জ্যোতির সমুদ্র রূপে দর্শনের পর। তার আগে পর্যন্ত শুধু ব্যাকুলতা আর ব্যাকুলতা। অনুরাগ হলে ব্যাকুলতা আসে, অনুরাগ হলে ভালবাসা আসে। একবার ভালবাসা যদি জন্মে যায়, তখন 'তারা তারা দু ভাই এসেছে রে', এই গান শুনলেই ইচ্ছে হবে দরজা বন্ধ করে দু-হাত তুলে নাচি। এগুলো ভাবের কথা, বলে বোঝান যাবে না। এই ভাব হয় আপনার আছে, নয় আপনার নেই। যদি ভাবছেন আপনার আছে, তাহলে আপনার নেই। যাঁর আছে তিনিই জানেন তাঁর কি আছে, তাঁকে ভাবতে হবে।

জীবনে যদি কাউকে ভালবেসে থাকেন, তাহলে আপনার পক্ষে বোঝা সহজ হবে, যখন আপনি ভাববেন যে, ঠাকুরকে আপনি সেভাবেই ভালবাসেন। ঠাকুর বলতে আপনার যিনি ইষ্ট তাঁর কথাই বলা

হচ্ছে। যদি বোঝেন, তাহলে বুঝবেন কোথাও আপনার অনুরাগ এসেছে। ঠাকুরের কোন একটা কথা, ঠাকুরের কোন একটা ঘটনার কথা মনে এলে আপনার কি একেবারে চুপ করে যেতে ইচ্ছে করছে? আর শরীর যদি নিঃস্পন্দন হয়ে যায়, হাত, পা কোন কিছুই নড়তে চাইছে না, তাহলে বুঝতে হবে অনুরাগ এসেছে; এগুলো হল লক্ষণ। কোন একটিই লক্ষণ নেই, হাজারটা লক্ষণ আছে। মূল হল, কোন ধরণের ইমোশানালিজম্ যেন না থাকে।

যখন এই অনুরাগ আসে তবে প্রার্থনা শুরু হয়। আসল সাধনা সেখান থেকেই শুরু হয়। তাহলে আপনারা এখন কি করছেন? এই যে গুরু থেকে মন্ত্র নিয়েছেন, জপ করছেন, পূজা করছেন, এগুলো তাহলে কি? এগুলো কিছু না, ধরে রাখার জন্য। কোন রেলের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছেন, লোকাল ট্রেন এসে থেমেছে, লোকে ভর্তি, ওঠার জায়গা নেই। হঠাৎ আপনার পরিচিত কেউ আপনাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলছে, 'এই আমাকে ধর, ভাল করে ধরে নে'। তিনি আপনাকে টেনে নিলেন। অনুরাগ ঠিক এই রকম। এই যে শ্রীরামকৃষ্ণরূপী এ্যক্সপ্রেস ট্রেন, সেখান থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে আপনাকে ধরে টেনে নিল। এরপর শুরু হয় আধ্যাত্মিক অভিযান। তার আগে পর্যন্ত আপনি প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক করে যাচ্ছেন –আমাকে একটু দয়া করে জায়গা দিন।

ঠাকুর গান করার পর আবার কথা বলছেন। **আর সর্বদাই তাঁর নামগুণগান-কীর্তন, প্রার্থনা করতে হয়**। এই প্রার্থনা করা হল, যাতে অনুরাগ হয়। অনুরাগ যখন হয়ে যায়, তখনও প্রার্থনা করতে হয়। **পুরাতন ঘটি রোজ মাজতে হবে, একবার মাজলে কি হবে? আর বিবেক, বৈরাগ্য, সংসার অনিত্য এই বোধ**।

কোন রকমে একবার যদি অনুরাগ এসে যায়, তখন ধীরে ধীরে এই জিনিসগুলো আসতে শুরু করে। নিরাকার সাধনাতে সমস্যা কি হয়, অনুরাগ হয় না, হতে পারে না। নিরাকার সাধনা হল বিষয়জ্ঞান। ভক্তিতে ভালবাসাটা দিনে দিনে বাড়ছে। একটা নূতন স্কুলে বাচ্চাকে ভর্তি করার পর সে প্রথম প্রথম স্কুলে যেতে চায় না। কারণ সেখানে কারুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নেই। নূতন ছেলেদের সঙ্গে থাকতে থাকতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরী হয়। ঠিক তেমন ঈশ্বকে নিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর প্রতি ভক্তি জন্মায়, ভালবাসা জন্মায়। ভালবাসা আর ভক্তি একই জিনিস। বন্ধুত্ব, ভালবাসা হয়ে গেলে তারপর সে আর তাকে ছাড়তে চায় না। ঈশ্বরপ্রেম অনেকটা এই রকমই। দিনের পর দিন লেগে আছেন। কি রকম, দিনে ঠাকুরকে দু-বার ভোগ দিচ্ছেন, ভোরবেলা ধূপধুনো দিচ্ছেন, ফুল দিয়ে ঠাকুরকে সাজাচ্ছেন, সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরকে আরতি করছেন।

অনেক আগে ১৯৮২ সাল হবে, সেই সময় দেওঘরে আমি ব্রহ্মচারী ছিলাম। একটা কাজে সেই সময় আমাকে সিন্ধ্রি যেতে হয়েছিল। সেখানে এক বয়স্ক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি রামকৃষ্ণ মিশনের'? আমি বললাম 'হ্যাঁ'। উনি বললেন, 'আপনি আমার বাড়ি চলুন, আমার বাড়িতে ঠাকুরের ছবি আছে'। আমি এমনিতে কারুর বাড়ি যাই না, আর কাজের ব্যাপারে এসেছি, যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। উনি বলছেন, 'রোজ সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে সবাই মিলে আরতি করি'। আমি এই প্রথম শুনলাম কোন ভক্ত বাড়িতে রোজ ঠাকুরের আরতি করেন, গান করেন। এতদিন জানতাম আমাদের আশ্রমগুলিতেই ঠাকুরের আরতি হয়। আর তখন 'ভক্ত' ব্যাপারটাও আমার অত জানা ছিল না। শুনে আমার এত ভাল লেগেছিল যে, এখনও মনে আছে। সন্ধ্যাবেলা দিনের পর দিন ঠাকুরকে আরতি করে যাচ্ছেন, দিনে দু-বেলা ঠাকুরকে ভোগ দিচ্ছেন। এইভাবে করতে করতে ধীরে ধীরে অনুরাগ এসে যায়। একবার যদি অনুরাগ এসে গেল, এরপর আর কি লাগে। ঠিক ঠিক সাধনা তারপরে শুরু হয়। ব্রাহ্মভক্ত আবার জিজ্ঞেস করছে, সংসারত্যাগ কি ভাল? এই জায়গা থেকে আমরা এরপর শুরু করছি।

কয়েকটা ক্লাশ আগে আমরা স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ ও মহাকারণের উপর বিস্তারে আলোচনা করেছিলাম। ঠাকুর অনায়াসে এই চারটেতেই বিচরণ করতেন, চারটেরই কথা আমাদের

বলেছেন। তবে আমাদের মন অত্যন্ত স্থূল। আমাদের মনের যে জাল আইডিয়াসগুলিকে ধরবে, সেই জালের ফোকরগুলো বড় বড়, সূক্ষ্ম জিনিসগুলিকে ধরতে পারে না। সুক্ষ্ম জিনিস ধরার জন্য দরকার সাধন-ভজন, কষ্ট করতে হয়, লেগে থাকতে হয়। ইদানিং বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁদের মনে ধর্মজিজ্ঞাসা কম, জীবনের সমস্যার কথা বেশি বলেন। আমরা সন্ন্যাসীরা জীবনের সমস্যার সমাধান কি দেব! আমরাই জীবন সামলাতে পারলাম না, যার জন্য সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে আসতে হল। আমাদের কাছে এসে যদি জীবনের সমস্যার সমাধান চান, তার মধ্যে সেই হাজার রকম সমস্যা, কার স্ত্রী মানে না, কার স্বামী মানে না, কার সন্তান অবাধ্য, কার নিওরোলজিক্যাল সমস্যা, কার ডিপ্রেসান, কার সন্তানের পড়াশোনায় মন নেই, কার ছেলে বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। এদের সবারই ইচ্ছা যে, ধর্ম করলে যদি সমাধান হয়ে যেত। তা কি কখন হয়! এখন কথামৃতের যে জায়গাতে আমরা আলোচনা করব, একটু যদি মন দিয়ে সেই জায়গাটা পড়েন, মাঝে মাঝে যদি পড়েন; দেখবেন আপনাদের মনে যে অনেক ধরণের সমস্যা আছে, যে প্রশ্নগুলো আসে, সব কটারই সমাধান পেয়ে যাবেন। ঠাকুর এই যুগের অবতার, এই যুগের যত রকম আধ্যাত্মিক সমস্যা, তার সমাধান আগে থেকেই দিয়ে গেছেন। প্রত্যেক অবতারই তাই করেন।

ব্রাহ্মভক্ত –সংসারত্যাগ কি ভাল?

বর্তমানকালে শুধু কলকাতায় না, গ্রামেগঞ্জেও বিভিন্ন কারণে পরিবারগুলো ছোট হয়ে গেছে। স্বামী, স্ত্রী, বাবা, মা সবাই স্বাধীন থাকতে চায়। ফলে একটা বয়স হয়ে যাওয়ার পর দেখে কোন সম্বল নেই। ঠাকুর বলছেন, মা বেড়াল পুষিয়ে সংসার করিয়ে নেন। বর্তমানকালে মানুষ এমন হয়ে গেছে যে এই কুকুর, বেড়াল ছাড়া সংসার চালানোর আর পথই নেই। জীবনে যে পাশে কেউ থাকবে, কেউ নেই, সম্পূর্ণ একা। কুকুর, বেড়ালই সঙ্গী হয়ে আছে। কিছু বলার নেই, বলতেও খারাপ লাগে। আমাদের কাছে অনুরোধ আসে, সবারই এক সমস্যা; জীবন শূন্য হয়ে গেছে, অবসাদগ্রস্ত। গাছের একটি একটি করে ডাল আমরা কেটে দিয়ে চলে গেলাম। এখন বলছি, গাছে একটিও পাতা নেই কেন?

আমি যখন সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম, তখন আমি একটা দিশা ঠিক করলাম। ফলে আমার জীবনেও অনেক সমস্যা আছে। প্রত্যেক সন্ন্যাসীর জীবনে সমস্যা থাকে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল নিরাপত্তাহীনতা। আগামীকাল আমাদের কারুর যদি শরীর খারাপ করে, এক গ্লাশ জল দেওয়ার কেউ থাকবে না। আমাদের সেন্টারগুলিতে সবাই নিজের মত কাজ করছে। শরীর খারাপ হলে হসপিটালে ভর্তি করে দেবে। এসব জেনে বুঝেই আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনিও নিশ্চয় একটা ডিসিশান নিয়েছেন; আপনি ঠিক করলেন, আপনি বিয়ে করবেন না। আপনি ঠিক করেছেন, বিয়ে করব কিন্তু সন্তান নেব না। তাহলে এখন কেন কান্নাকাটি করছেন? 'না, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ভুল হয়ে গেছে'। ভুল হয়ে গেছে ঠিক আছে, তাহলে অন্তত একটা জিনিস করুন –ইংরাজীতে খুব সুন্দর বলে, purpose of life। Goal of life বলছি না, বলছি purpose of life, একটা কিছু রাখুন যেখানে মনটা নিয়ে গিয়ে রাখতে পারবেন।

সারাদিন অফিসে কাজ করছেন, কাজ শেষ হয়ে গেল, একটু কিছু রাখুন যেখানে গিয়ে এবার মনটাকে রাখবেন, যে আপনাকে শক্তি দেবে। কুকুর, বেড়াল যদি পোষেন, আপনাকে সঙ্গ দেবে ঠিকই, কিন্তু হাজারটা ঝামেলাও আপনাকে নিতে হবে। একটা উচ্চ চিন্তন নিয়ে যদি থাকা যায়, কিছু একটা নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগে। এমন কখন হতে পারে না যে, জীবনে আপনার কিছুই ভাল লাগে না। গান শুনতে ভাল লাগে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভাল লাগে, সিনেমার গান শুনতে ভাল লাগে, কোন বইয়ে আগ্রহ থাকতে পারে; একটা বিষয়কে বেছে নিন, আর সেই বিষয়ের প্রতি নিজেকে সমর্পিত করে দিন। গান করুন, গান শুনুন, বাজনা বাজান, পড়াশোনা করে যান, একটা বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করুন। একটা সময় বই লেখার চেষ্টা করুন। আপনার ফুল ভাল লাগে, এক টুকরো জমি নেই যে ফুলগাছ

লাগাবেন; ঠিক আছে ফুল নিয়ে আপনি স্টাডি করুন। মনটাকে একটা কোথাও রাখতে হয়। আর জপধ্যান?

আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, খুব সুন্দর কথা বলতেন। বৈষ্ণবরা হিন্দুদের ঈশ্বরের স্মরণ-মননের জন্য একটা খুব সুন্দর ব্যবস্থা করে গেলেন। কি সেটা? সবাইকে জপের মালা ধরিয়ে দিলেন। বৈষ্ণব কালচারে মালাজপ খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটাকে নিয়ে আবার লোকেরা নিন্দা করে; একদিকে মালাতে ভগবানের নাম জপছে আবার ওদিকে মাছের দরাদরি করছে, নয়তো হাজারটা জায়গায় মন ঘুরছে। ঠিক আছে, তাও ভাল যে মনটা একটা কোথাও আছে। ওটাও যদি না থাকে তাহলে আরও বাজে পরিস্থিতি হবে। সত্যিকারের ভাল হয়, মনকে যদি পুরোপুরি ঈশ্বরে দিয়ে দেওয়া যায়। সেটা নাহলে ঈশ্বর চিন্তনে যদি মনটাকে রাখা যায়; আর সেটাও যদি না পারেন তাহলে এই মালা, নামের সাথে সাথে মালা ঘোরাতে থাকুন। আমি মনের আনন্দে এই তিনটে লাইন রচনা করেছিলাম –

রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ ভগবান।
রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ শুভনাম।
জয় জয় রামকৃষ্ণ ভগবান জয় জয় রামকৃষ্ণ শুভনাম।।

এই তিনটি লাইনকে সুর দিয়ে অনেকে গান গেয়েছেন, ইউটিউবে রাখা আছে। পরে আমি ভাবছিলাম, আমাদের এত সুন্দর গান আছে রামকৃষ্ণ শরণং, ওটার সাথে কি এমন তফাৎ রইল। না, রামকৃষ্ণ শরণং এই গানের সাথে এই তিনটে লাইনের বিরাট তফাৎ আছে। রামকৃষ্ণ শরণংএ কোথাও ভক্তি, শরণাগতির ভাবকে পরিস্ফুটিত করছে। কিন্তু এই তিনটে লাইনে বেদান্তের একটা রূপ দেওয়া হয়েছে, যেখানে নাম আর রূপ এই দুটোকেই যেন পাশাপাশি নিয়ে চলেছে। আমি সেদিক থেকে কবিও না, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হয়েছে। আর কপাল এমন, এই তিনটে লাইন এমন ভাবে এসেছে, হিন্দিতে হোক, বাংলায় হোক যে কোন লোকই গুন্ গুন্ করে গান করতে পারেন।

একটা হবি থেকে শুরু করে, কোন কিছু পড়াশোনা থেকে শুরু করে, একটা মালা নিয়ে জপ করে যাওয়া; সব কিছুর মূল কথা মনটাকে একটা জায়গায় রাখা। মনকে যদি একটা জায়গায় না রাখতে পারেন, জীবনে আপনার শান্তি আসবে না। আগেকার দিনে লোকেদের সংসার বড় ছিল। বড় সংসার হওয়ার জন্য তখন ধর্ম জীবন পালন করা সহজ ছিল। কারণ সংসারের কাজগুলো বিভাজিত হয়ে যেত, কেউ ওটা করছেন, কেউ এটা করছেন। তখনকার দিনে সংসারত্যাগ জিনিসটা খুব পপুলার ছিল। ইদানিং অনেক কমে গেছে। আগেকার দিনে সংসারত্যাগ মানে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। কেউ কেউ গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করছেন, কেউ হরিদ্বার, বৃন্দাবন, কাশীতে গিয়ে তপস্যায় বসে গেছেন। ইদানিং কালে এ-জিনিস হয় না, কারণ আমাদের শরীর আগের থেকে অনেক সুখি হয়ে গেছে। শরীরের চাহিদা মেটানোর জন্য কিছু জিনিস দরকার পড়ে। তার থেকেও বেশি, ভিক্ষাও আগের মত সেইরকম আজকাল পাওয়া যায় না। তদুপরি যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাসও অনেক পাল্টে গেছে, এসব কারণে এখন অনেক সমস্যাও এসেছে। তবে এই নয় যে কেউ সংসারত্যাগ করছেন না, সংসারত্যাগ এখনও অনেকেই করেন। ইদানিং কালে যাঁরা সংসারত্যাগ করেন, খুব কম বয়সে করেন। এখন সব কিছুই ইয়ং বয়সেই হয়ে যাচ্ছে। লোকেরা কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে কম বয়সে। সন্ন্যাসীও তো কম বয়সেই হতে হবে। যতক্ষণ শরীরে বল-বুদ্ধি আছে ততক্ষণই সব কিছু করে নিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সকলের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই তাদের পক্ষে সংসারত্যাগ নয়। দুআনা মদে কি মাতাল হয়?

এটা আমাদের সবাইকে মানতে হবে যে, আধ্যাত্মিক জীবন সবার জন্য নয়। সংসারত্যাগ আর আধ্যাত্মিক জীবন একই জিনিস। দুআনার মদ, ঠাকুর সবই জানতেন কত আনা মদ খেলে টাল খায় না, আর কত আনা খেলে শরীর টাল খায়। দুআনা মদে –একটু যদি মদ খেয়ে নেয়, তাতে কি সে মাতাল হবে? নেশাই হবে না, মাতাল হওয়া তো দূরের। ভোগের অন্ত না হলে দু হাত তুলে কি করে হরিবোল করবেন? ভোগের অন্ত না হতেই যদি বেশি নাচানাচি করেন, এরপর মন যখন ওখান থেকে নামবে, সরাসরি কাম ভোগের দিকে মন নেমে যাবে। এর অন্যথা কখনই হয় না। যে কজন নামকরা লেখক, বৈজ্ঞানিক, গায়ক, চিত্রকর, সবার একই কাহিনী। কারণ একটা জিনিসকে নিয়ে অনেক উপরে চলে যাচ্ছেন, ওই জায়গা থেকে যখন মন নামবে তখন সেই আলম্বনটা আর নেই যে যেখানে গিয়ে অবস্থান করবে। কক্ষণ এর অন্যথা হয় না।

সেইজন্য ভোগ করে নিতে হয়। মনে যে ইচ্ছাটা উঠল, আগে ওটাকে মিটিয়ে দিতে হয়। আবার এমন কিছু বাড়াবাড়ি করতে নেই, যেটা আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে। একজন মহারাজ বলেছিলেন, 'দেখো, কামিনী জিনিস খুব পিচ্ছিল পথ, এমন পিচ্ছিল যে পা পড়লেই পিছলে উল্টে পড়বে'। কেউ হয়ত মনে করবে, একটু তো, খুব বেশি না। জেনে রাখুন, মেয়েমানুষের একটু মানে মেয়েমানুষের সর্বস্ব। মেয়ের একটু কখন হয় না, সে তো আপনাকে ছাড়বে না। সেইজন্য, একটু না জানা থাকলে, একটু ভোগ করা না থাকলে সব এলেমেলো হয়ে যাবে, ও হবেই। তার সঙ্গে আমাদের যে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা, এটাকেও মাথায় রাখতে হবে। একটা বয়সের পর বাণপ্রস্থী হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন, এবার কাজকর্ম বন্ধ করুন। খাওয়া-দাওয়া একেবারে সহজ করে নিন; ঠাকুর বলছেন, একটু ঝোল-ভাত হলেই হয়ে যায়। পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে সব কিছু কাজ বন্ধ করে সাত্ত্বিক জীবন কাটান। যদি স্ত্রী না মানে, বা স্বামী যদি না চায়; তাহলে একজন আলাদা ভাবে সাধন পথ বেছে নিন। অন্যজন নিজের মত থাকুন, ঝগড়া-ঝাটির কোন দরকার নেই, যদি একটু ঝগড়া-বিবাদ হয় তো হবে। হাজারটা জিনিসের জন্য আগে কত ঝগড়া হয়েছে, এখনও না হয় হবে। একটু ভোগ হয়ে যাওয়ার পর মন আস্তে আস্তে একটা প্রস্তুতি নেয়। এটা আপনারা সবাই মনে রাখবেন, সকলের জন্য ধর্মজীবন নয়। একটু ভোগ যদি না হয়ে থাকে, হবে না।

ঠাকুর আগে আগে একটা সুন্দর গল্প বলেছিলেন –কম বয়সে একজন সন্ন্যাসী হয়েছে। ভিক্ষা চাইতে গিয়ে এক যুবতীর দিকে দৃষ্টি গেল। তার স্তন দেখে ভাবছে মেয়েটির বুকে ফোঁড়া হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করছে, 'এটা কি'? সন্ন্যাসীকে বলা হল, 'ওর সন্তান হবে বলে ভগবান শিশুর দুধ খাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছেন'। সন্ন্যাসী শুনেই বলছেন, 'কি বললেন! যে জন্মায়নি তারও ব্যবস্থা ঠাকুর আগে থেকে করে রেখেছেন? তাহলে আমি কেন ভিক্ষা চাইছি'? এই বলে সন্ন্যাসী বেরিয়ে গেলেন। এটা যেমন একটা দিক গেল। আবার অনেক সময় কৌতুহল জাগে, এই জিনিসটা কি? আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, খুব ভাল মহারাজ ছিলেন। অনেক আগেকার কথা, উনি একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচুর কাজ করেছিলেন। ওনার খুব ইচ্ছে ছিল, জীবনে একবার এ্যারোপ্লেনে চাপবেন। এমনই কপাল যে, সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর শেষ অসুখ হল, কোন উপায় ছিল না, শেষমেশ তাঁকে চিকিৎসার জন্য প্লেনেই নিয়ে আসতে হল; তখনকার দিনে যেটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এই ধরণের ছোটখাট ইচ্ছে, এগুলো মিটিয়ে নিতে হয়, তা নাহলে মনের মধ্যে ঘুরতে থাকবে।

ব্রাহ্মভক্ত –তারা তবে সংসার করবে?

সংসার কি সবারই জন্য? অবশ্যই। কাঠখোট্ট সন্ন্যাসী ছাড়া সংসার সবারই জন্য। কেন সংসার করবেন না, আপনার অসুখ হলে কে দেখবে? আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কে করে দেবে? আপনার এত সম্বন্ধীরা রয়েছেন, তাদেরকে কে দেখবে? সর্বত্র এত সাধু-সন্ন্যাসীরা আছেন, এনাদের খরচ কে জোগাবে? সাধু-সন্ন্যাসীরা সমাজের উপর ভরসা করে আছেন। গরীব-দুখী আছে, এদের কে দেখবে?

যারা বেশি বেশি ধর্ম ধর্ম করে, বুঝি এরা ঘোর তামসিক আর ফাঁকিবাজ। কোন কাজকর্ম না করে যাদেরই ধর্মের দিকে বেশি গতি হয়, বুঝবেন সব কটা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে ফেল। এখনও সময় আছে, একটু কাজ কর। কাজ করলে তমোগুণটা কেটে যাবে, তমোগুণ কেটে রজোগুণটা একটু জাগবে। পরে ঠাকুর সত্ত্বগুণের কথা বলবেন, সত্ত্বগুণ না হলে ধর্ম, সন্ন্যাস, কোন কিছুই হয় না।

আর একটা হল, সবাই মনের মত কাজ করতে চাইবে। কারুরই মনের মত কাজ জোটে না। আজই মহারাজরা অনেকে এক সঙ্গে গল্প করছিলেন, সেখানে আলোচনা চলছিল; এই যে সঙ্ঘে আমাদের কাজ দেওয়া হয়, কেউ কি কখন মনের মত কাজ পায়? একজন মহারাজ মজা করে বললেন, 'এই তো সমর্পণানন্দ মহারাজ মনের মত কাজ পেয়েছেন, লেকচার দেওয়া'। আমি হেসে বললাম, 'আমার এক পয়সার ইচ্ছা নেই। দেওঘরে ক্লাশ ফাইভ সিক্সের ছেলেদের পড়াতাম, সেখানে ছেলেদের দেখতাম, কি আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং লেভেল, কি ইণ্টেলিজেন্স লেভেল; কত হাই লেভেল দেখেছি; এখানে ক্লাশ করতে গিয়ে বয়স্কদের মধ্যে পাইনা'। একটা যে উচ্চমানের কথা বলব, সেটা নেওয়ার ক্ষমতা কি এদের আছে। আমার কাছে ক্লাশ নেওয়াটা একটা পানিশমেণ্ট। সঙ্ঘের কাজ, সঙ্ঘ আমাকে আদেশ দিয়েছে, ক্লাশ নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যাঁরাই কাজ করেন, কারুরই মনের মত কাজ না। সব কাজই আমাদের কাছে আদেশ মাত্র। সেইজন্য যে বলবেন আমার মনের মত কাজ পাই না, এখানে বলতে নেই। জীবনটাকে তৈরী করার জন্য কাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হাঁ, তারা নিষ্কামকর্ম করবার চেষ্টা করবে।

এই মন্ত্র যদি না শেখা হয়, জীবনে কিছু হবে না। কয়েকটি জিনিসের ব্যাপারে পরিষ্কার হয়ে যেতে হবে। প্রথম, প্রত্যেক হিন্দুর জীবন আদর্শ হল, শেষে আমি সন্ন্যাসী হব। সন্ন্যাসী হওয়ার আগে অবশ্যই তাকে বাণপ্রস্থী হতে হবে। বাণপ্রস্থী হওয়ার জন্য নিষ্কামকর্ম অবশ্যই করতে হবে। নিষ্কামকর্ম নিয়ে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। নিষ্কামকর্মের অর্থ, যে কাজ সামনে এসেছে, পূর্ণ দায়ীত্ব নিয়ে সেই কাজ করে দেওয়া। সেখানে এই পছন্দ, এই পছন্দ না, আমার নাম হবে, যশ হবে, আমার বদনাম হবে কোন কিছু মাথায় থাকবে না। দায়ীত্ব এসেছে, পুরো নিষ্ঠা নিয়ে করে দিলাম। আইআইএমএ কিছুদিন আগে একটা সেমিনার ছিল। সেখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ওখানে বক্তারা প্রফেশানাল লাইফ, পার্সোনাল লাইফ নিয়ে অনেক কথা বলছিলেন। প্রফেশানাল, পার্সোনাল কি আছে, কাজ কাজ। যখন প্রফেশানাল কাজ করছেন, বিনিময়ে কিছু টাকা পাচ্ছেন। বাড়ির কাজ যখন করছেন, তখন কিছু খুশি পাচ্ছেন।

মহাষ্টমীর দিন বিকেলবেলায় লেকচার দিচ্ছিলাম, সেখানে বললাম, 'দেখুন, আমার কাছে সবই সমান; দুর্গাপূজা চলছে আর আমি এখানে আপনাদের সামনে লেকচার দিচ্ছি। এখানে আপনাদের কাছে আছি, লেকচার শেষ হবে, সন্ধিপূজা আছে, সেখানে চলে যাব'। লোকেরা বোকা বোকা প্রশ্ন করে, নিষ্কাম ভাব নিয়ে কি কাজ করা যায়? কেন করা যাবে না, তার জন্য মনকে ট্রেনিং দিতে হবে। বাচ্চারা পড়তে চায় না, কেন? কারণ তামসিক মন ওদের। তাকে ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে ট্র্যাকে নিয়ে আসতে হয়, যেখানে এসে সে এত দিন যে পড়াশোনাটা এড়িয়ে যেতে চাইত, সেই পড়াশোনাকে ভালবাসতে শুরু করে। ঠিক তেমনি আমি ওই কাজ করতে ভালবাসি, সেই কাজ করতে চাই না, এগুলো হল তামসিক মনের লক্ষণ। কাজ করুন, প্রচুর কাজ করুন। আমাদের আচার্যরাও বলতেন, কাজ কর। কাজ তো নিজের কাজ হবে না, সঙ্ঘ যে কাজ দিয়েছে নিষ্ঠা সহকারে নিষ্কাম ভাবে কর। যদি কাজ না থাকে তাহলে জপ কর। জপ যদি করতে না পার, পড়াশোনা কর।

এই লেকচারগুলো যখন শুনছেন, কাগজ-কলম নিয়ে বসুন, নোটস্ তৈরী করুন। আপনাদের নিজেদের যে ফেসবুক আছে সেখানে এগুলো ছাড়ুন। দেওঘর বিদ্যাপীঠে কত বছর ধরে ছাত্রদের পড়িয়ে এসেছি। কোন দিন একটি ছেলে এসে বলেনি যে, মহারাজ আপনি কি দারুণ পড়ান। তার কাজ

শেখা, আমার কাজ শেখানো, ওখানেই সব শেষ। যেমনি কেউ এসে আমাকে বলে, মহারাজ কি দারুণ বললেন; বুঝে যাই আর-এক তামসিক জুটেছে। ডাক্তাররা বলে, ধুকধুকে রোগীগুলো মরবেও না, সারবেও না; এদের দিয়েই আমাদের প্র্যাক্টিস চলে। রোগী এলো আর মরে গেল, ডাক্তার ফিজ্ কোথা থেকে পাবে। রোগী এলো আর সেরে গেলো, তাহলেও ডাক্তার ফিজ্ পাবে না। রোগী এমন আসতে হবে যে, মরবেও না, সারবেও না, তবে গিয়ে ডাক্তারদের ঠিক ঠিক প্র্যাক্টিসটা চলে। এই ভক্তরা যারা আসে সব ধুকধুকে রোগীর মত। আপনাকে ছেড়েও যাবে না, কিন্তু সেখান থেকে যে নিজেকে একটু উন্নত করবে, সেটাও করবে না। মহারাজ আপনি কি সুন্দর বলেন; একবার ভেবে দেখে না যে কি ঘোর তামসিক। তবে পরনিন্দা-পরচর্চা করার থেকে, বসে বসে টিভি সিরিয়াল দেখার চেয়ে এটা তাও অনেক ভাল। এরপর ঠাকুর কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছেন, এগুলো আমরা আগেও অন্য জায়গায় পেয়েছি।

হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙবে। বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কর্ম করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে থাকে, এরই নাম নিষ্কামকর্ম। এরই নাম মনে ত্যাগ। তোমরা মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসী বাহিরের ত্যাগ আবার মনে ত্যাগ দুইই করবে।

একটা রুটিন তৈরী করে নিতে হয়। তবে এটাও বলি, আমাদের অনেক শ্রোতা আছেন, যাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাঁরা বলেন, এই ক্লাশগুলো শুনে জীবনটাকে একটা সুন্দর রুটিন অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পেরেছেন। একজন মহিলা শ্রোতা বলেন, ভোর সাড়ে চারটায় আমি যদি না উঠে পড়ি, আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে, আমি কিছু সামাল দিতে পারব না। জীবনটাকে উনি বদলে দিয়েছেন। সকালে উঠে জপধ্যান করে একটু চণ্ডীপাঠ, একটু গীতাপাঠ করেন। এই ক্লাশগুলো শুনে শুনে রুটিন তৈরী করে নিয়েছেন। তারপর সন্তানের ঘুম ভেঙে গেল, সন্তানের দায়ীত্ব পালন শুরু হয়।

বেলুড় মঠে স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ ছিলেন, প্রাক্তন সহাধ্যক্ষ; অনেক বছর মঠের ম্যানেজার ছিলেন। আমাকে উনি অনেক স্নেহ করতেন। বেলুড় মঠের ম্যানেজারের যত রকম কাজ আছে, যেমন ভাণ্ডার আছে, তারপর মঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আর সব কাজের একজন করে ডিপার্টমেণ্টাল হেড আছেন। সবাইকে ওনার বলা ছিল, 'দেখো, তোমাদের যার যা কথা বলার আটটার মধ্যে কথা বলে নেবে'। বেলুড় মঠে ব্রেকফাস্ট সকাল সাড়ে ছটায় হয়। সাধুরা ভোর চারটের সময় ওঠেন। সাতটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল, এরপর যা কথা বলার আটটার মধ্যে শেষ। উনি খুব সুন্দর একটা কথা বলতেন, 'আটটার পরে আমার সময় আমার নয়'। কথাটি এত সুন্দর লেগেছিল আমার – আমার সময় আমার নয়। কারণ মঠ তখন খুলে যায়, ভক্তরা আসতে শুরু করেন। প্রণাম করা, কথা বলা শুরু হয়ে যায়; বলছেন, 'তখন আমি পরিষ্কার ভাবে তোমার সাথে কাজের কথা আলোচনা করতে পারব না'।

কিছু দিন আগে আমাদের এক মহারাজ কোন একটা কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলছিলেন, 'ভোর ছটার পর সন্ন্যাসীর সময় আর নিজের সময় বলে থাকে না। কারণ তাঁকে তখন থেকেই পাবলিক লাইফে নেমে যেতে হচ্ছে। এইটা সবাইকে মনে রাখতে হবে –ফর্সা হয়ে সকাল হল, আপনার সময় আর আপনার থাকবে না। যা কিছু করার তার আগে আপনাকে করে নিতে হবে'।

এসব করে বাকি যেটা থাকবে, সেটা মনে ত্যাগ। মনের ত্যাগ যদি না করা হয় তার জন্য প্রচুর কষ্ট পেতে হবে। যেখানেই অশান্তির কথা শুনি, হতাশা, জীবনে শূন্যতার ভাব, এই সব কিছুর কারণ মনের ত্যাগের অভাব। ত্যাগ নেই তাই কষ্ট। স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ, বর্তমানে ভাইস প্রেসিডেণ্ট, ওনার অনেকগুলো কথা আছে যেগুলো কাহিনী রূপে সাধুদের মধ্যে জোকসের মত প্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্তু খুব গভীর কথা। উনি তখন এ্যসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি, একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। সন্ন্যাসী একটা সেণ্টারে প্রচুর কাজটাজ করেছিলেন। কোন কারণে ওনাকে সেণ্টার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে,

কাউকে সরাতে গেলে দু-মিনিট লাগে। ওনার ট্রান্সফার হয়ে গেছে। উনি এসে খুব দুঃখ করে মহারাজকে বলছেন, 'এই দেখুন আমার সঙ্গে এই রকম হল'। এক, দুই, তিন, চার করে অনেক ঘটনা বললেন। ভাবছেন স্বামী সুহিতানন্দজী এবার তাঁর সমর্থনে কিছু বলবেন। উনি সব শুনলেন, সব শোনার পর বললেন, 'বুঝলি, দুবার-চারবার এ-রকম হয়ে গেলে তখন বুঝে নিবি জগৎটা এই রকমই; তখন আর কোন কিছুই গায়ে লাগবে না'। ঘটনাটা শুনে আমার এমন হাসি পেল যে হাসি আর থামতেই চাইছিল না।

সাধুটি একটা সেন্টারে পুরো ঝাঁপিয়ে পড়ে সব কাজ করছিল, কিন্তু মনে ত্যাগ করেনি। ফলে যেমনি বদলি হয়ে গেল, মনটা খারাপ হয়ে গেল; 'কোন কারণ ছাড়া আমাকে সরিয়ে দিল'। অনেক আশা নিয়ে স্বামী সুহিতানন্দজীকে বলতে এসেছেন। মহারাজ বলে দিলেন, বুঝলি, দুবার-চারবার এই রকম হলে বুঝবি জগৎটা এই রকমই, তখন আর খারাপ লাগবে না। আমাদের সবাইকে এটা বুঝে নিতে হয়, জগৎ এই রকমই। এটা যখন বুঝে নেবেন, তখন আর কষ্ট হবে না –এটাকে বলে মনে ত্যাগ। মনে ত্যাগ বলার পর ঠাকুর এবার সন্ন্যাসীদেরকে নিয়ে বলছেন।

সন্ন্যাসী বাহিরের ত্যাগ আবার মনে ত্যাগ দুইই করবে। সন্ন্যাসী একদিকে যেমন নিজে আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত হতে থাকেন, তেমনি সন্ন্যাসীর একটা দায়ীত্ব থাকে। এই দায়ীত্বটা হল জগৎকে শিক্ষা দেওয়া। ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখে সংসারীরা এক আনা ত্যাগ করার উৎসাহ পাবে। কিন্তু যারা গৃহস্থ তাদের মনে ত্যাগ; তার মানে সংসারে থাকবে, কিন্তু কোন কিছুতে নেই। এই যে ঠাকুর বললেন, যাদের ভোগান্ত হয় নাই, তখন ব্রাহ্মভক্ত আবার প্রশ্ন করছেন।

ব্রাহ্মভক্ত –ভোগান্ত কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ –কামিনী-কাঞ্চন ভোগ।

আসলে কামিনীর জন্যই কাঞ্চন দরকার পড়ে। কামিনী না থাকলে কাঞ্চন নিয়ে কি করবে। কামিনী ছাড়া কেউ যদি কাঞ্চনে লিপ্ত থাকে, সে একটা মানসিক রোগী। কামিনী হল সৃষ্টির বীজ। এটাকে জয় করা একেবারেই অসম্ভব, ঠাকুর যাদের মুক্ত করতে চান একমাত্র তারাই এর থেকে বেরোতে পারে, এছাড়া বেরোন সম্ভব না।

যে ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা, সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে মুশকিল। টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রম, দেহসুখ এই সব ভোগ একবার না হয়ে গেলে –ভোগান্ত না হলে –সকলের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আসে না।

এখানে দুটো বাক্য। প্রথম হল, আপনি যে জায়গাতে আছেন সেখানে এগুলো সব কিছু আছে। বিকারের রোগী যেখানে আছে, সেখানে আছে তেঁতুল আর জলের জালা; বিকারের রোগীর জন্য এগুলো পুরোপুরি নিষেধ। আমরা সবাই বিকারের রোগী। সন্ন্যাসীরা এখান থেকে উঠে আসার জন্য লড়াই করছেন; গায়ের জোরে না, ঈশ্বরকে ধরে। আপনারা যাঁরা সংসারে আছেন, আপনারাও চেষ্টা করছেন। আপনারা শাস্ত্রের কথা শুনছেন, এই যে কথামৃতের ব্যাখ্যা শুনছেন তার মানেই কোথাও এই ইচ্ছাটা জাগবে, আজ না জাগুক আগামীকাল জাগবে। এখন আপনারা যে সমাজে আছেন, সেখানে সব জিনিসই আছে, এগুলো আপনার লাগবেই। মনে একটা কৌতুহল, নারী জিনিসটা কি, টাকা-পয়সা কি, ভোগ কি; সেখান থেকে ভোগের ইচ্ছা।

অনেক আগেকার কথা, আমার এক পরিচিত সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, খুব ভাল লোক; কিন্তু একটু বখাটে ছিলেন। উনি ইউনিভার্সিটির রেজিস্টার বা ওই রকম কি একটা পোস্টের জন্য আবেদন করেছিলেন। ওনার যে সার্টিফিকেট ছিল সব কটাই খুব উচ্চমানের। এক্সপার্ট প্যানেল ওনাকে জিজ্ঞেস

করল, 'আপনি এত ভাল শিক্ষক, আপনার এত সুনাম; আপনি প্রশাসনে কেন আসতে চাইছেন'। উনি পরিষ্কার বললেন –'এতদিন শিক্ষকতা করেছি, এখন ইচ্ছে হয়েছে প্রশাসনে একজন অফিসার হলে কি অব্যক্ত আনন্দ পাওয়া যায়, এটা একটু দেখার ইচ্ছে আছে'। প্যানেল ওনাকে বাদ দিয়ে দিল।

কারণ আপনাকে ধাপ্পা দিতে হবে, আমি সমাজের সেবা করতে চাই। সবাই বলবে, আমি দেশের জন্য কাজ করতে চাই, আমি সমাজের মঙ্গল করতে চাই। কারণ কারুরই বলার সাহস নেই – আমি টাকা আয় করতে চাই। আসলটা বললেই আপনি রিজেক্টেড হয়ে যাবেন। সত্য বলারও যেমন সাহস থাকে না, সত্য শোনারও সাহস থাকে না।

স্বামী প্রেমেশানন্দজীর একটা নামকরা ঘটনা আছে। হৃষিকেশে ছিলেন। একজন সাধু অনেকদিন ভিক্ষা করতে আসছেন না। উনি দেখতে গেলেন। উনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন সাধুটি শুয়ে আছে। সাধুটি জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েছেন একজন সাধু আসছেন। উনি তাড়াতাড়ি উঠে বসে জপধ্যান করতে শুরু করে দিলেন। স্বামী প্রেমেশানন্দজী তাঁকে গিয়ে বলছেন, 'সাধুবাবা! আমরা একই জাতের লোক, আমাদের সঙ্গে ঢপবাজী কেন'? কোন ভক্ত কেন দেখবে যে আপনি ধ্যান করছেন? ধ্যান হবে মনে বনে কোণে। কোথাও আপনার মনে একটা ধাপ্পাবাজী আছে বলেই আপনি এই ধরণের লোক দেখানো ধ্যান করছেন।

বিশেষ দিনে আশ্রমের মহন্ত পূজারী হয়ে পূজা করছেন। কারণ বিশেষ দিনে সব ভক্তরা আসবে, ভক্তরা দেখবে মহন্ত পূজা করছেন, আরতি করছেন। ভক্তদের দেখানোর জন্য আপনি এসব করছেন, অন্য দিনে এসে এসব করুন, কারুর কিছু বলার নেই। এগুলো থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে না। পরিষ্কার বলুন, আমার ভোগের ইচ্ছা আছে। স্পষ্ট বলে দিলে কেউ কিছু মনে করবে না। এতো গেল সন্ন্যাসীদের কথা।

আর সমাজে যারা আছে, সেখানে তো আরও ভয়ঙ্কর, টাকা-পয়সা, মান, যশ এগুলো সবারই ভিতরে গিজগিজ করছে। একটু বাজিয়ে না নিলে অনেক সমস্যা হয়। এক সময় আমি কানপুর সেন্টারে ছিলাম। ওখানে একটা ছোট ডিসপেন্সারী আছে, ভাল ভাল ডাক্তাররা রোগী দেখতে আসতেন। বেশি দিন ছিলাম না, কিন্তু ওই কটা দিনেই ডাক্তারদের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল; কুড়ি বছরের উপর হয়ে গেছে এখনও সেই বন্ধুত্ব আছে। ওখানে একজন খুব নামকরা ডাক্তার ছিলেন, ডাঃ আর কে মহেন্দ্রু, সাইকাট্রিকে উনি একেবারে ম্যাজিসিয়ান। ডাঃ মহেন্দ্রু আমাকে বললেন, আমার কাছে আপনি প্রথম সন্ন্যাসী, যাঁকে নর্মাল দেখছি। আজ পর্যন্ত সব এ্যবনর্মাল সন্ন্যাসীই দেখেছি। কোন দিন উনি সাধুসঙ্গ করেননি, সাধুরা ওনার কাছে গেছেন মেন্টাল ট্রিটমেন্টের জন্য। জন্মজন্মান্তরের সংস্কারগুলিকে আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি; সেইজন্য একটু ভোগ করে নিতে হয়।

ব্রাহ্মভক্ত –স্ত্রীজাতি খারাপ, না আমরা খারাপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ –বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে, আবার অবিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়, আর অবিদ্যারূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়।

প্রথমের দিকে আমরা যে আলোচনা করেছিলাম, অনেকের কাছে অবান্তর মনে হতে পারে, কিন্তু তা না। আগেকার দিনে যে একটা কম্যুউনিটি লাইফ ছিল, আর কিছু যৌথ পরিবার ছিল, সেখানে এগুলো সম্ভব ছিল। এখন যা অবস্থা এই বিদ্যারূপিণী আর অবিদ্যারূপিণী বিচার করা অসম্ভব। কোন বিদ্যারূপিণী স্ত্রী আছেন, আর সেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ধর্ম জীবন-যাপন করতে চাইছেন – এই দৃশ্য একেবারে অসম্ভব। একেবারেই যে নেই তা না, তবে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে একট ধর্ম জীবন অতিবাহিত করছেন, বুঝতে হবে এনারা ঈশ্বরের বিশেষ। ঈশ্বরের খুব বিশেষ না হলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই

অল্প বয়স থেকে সত্যিই ঈশ্বরের দিকে যেতে চান, এই জিনিস সম্ভব না। আমার এক পরিচিত মহিলার স্বামী দেখা করতে এসেছিলেন; পরে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'মহারাজ কেমন দেখলেন আমার স্বামী কে? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি'? কথা শুনে মনে হবে, তুমি নিজে একজন পার্বতী হয়ে যেন শিব খুঁজে বেড়াচ্ছ। আপনার স্বামী বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি জানতে গেলে আমাকে আপনার ঘরে গিয়ে দু-দিন থাকতে হয়, বোকা বোকা সব কথ –আমাকে কিন দু-মিনিটে বুঝে নিতে হবে বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি।

ঠাকুরের এই কথাগুলো খুব বিশেষ কথা। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, এই কথাগুলিই আমরা সবাই নিজের উপর লাগিয়ে যাচ্ছি। মানুষ কত খেলো এই প্রশ্নগুলি শুনলে বোঝা যায়। এগুলো ঠাকুর তাঁদেরই জন্য বলছেন, আগেকার দিনে যে সমাজ ছিল, সেখানে কিছু কিছু লোক পুরো ধর্ম পথে চলে যেতেন, আর তখনকার দিনে ধর্মের একটা আবহাওয়া ছিল। এখন তো শুধু ভোগ আর ভোগ, ভোগ ছাড় কিছু নেই। সবাই সবাইকে লুটে নিচ্ছে। পুরো ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিংটাই হল কে কাকে কিভাবে কত লুটতে পারে। শেষ পর্যন্ত কেউ কোন লাভ পায় না। ফলে এখন এটাই চলছে –কে কাকে কিভাবে বোকা বানাতে পারে। ভারতবর্ষ হল ধর্মের দেশ, সেখানে আমেরিকাকে নকল করে পয়সা দিয়ে আমাদের জল কিনে খেতে হচ্ছে। আমি একজনকে জানতাম, যে একটা বটলিং প্ল্যান্ট চালায়, সেখানে শুদ্ধ হিমালয়ের জল বলে বিক্রি করত। আসলে কুয়োর জল ভরে বিক্রি করে যাচ্ছে, আমরাও বিশ্বাসে খেয়ে যাচ্ছি। যেখানে এভাবে ভোগের সাম্রাজ্য চলে, সেখানে যদি ধর্মের দিকে এগোতে চান, তাহলে একটু ভোগান্ত না হলে হবে না। আগেকার দিনে আরও বেশি দরকার ছিল, তখন পুরো ধর্মের ভাব ছিল, ধর্মের একটা পরিবেশ ছিল। আমাদের সন্ন্যাসীদেরও দেখেছি, যাঁরা দেশে-বিদেশে পড়াশোনা করে আসেন, তাঁদের দুটোই আছে। বিদেশে এমন এমন জিনিস দেখে এসেছেন, যেটা মনের ভিতর একটা ছাপ ফেলে। আবার অন্যদিকে, দেখে নিয়েছেন বলে কাটিয়ে নিতে পেরেছেন।

তাঁর মহামায়াতে এই জগৎসংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যা-মায়া অবিদ্যা-মায়া দুই-ই আছে। বিদ্যা-মায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য – এই সব হয়। অবিদ্যা-মায়া – পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয় – রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিস; এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

ঠাকুর এখানে বিদ্যা-মায়া, অবিদ্যা-মায়া দিয়ে বলছেন, আসলে এটা সেই মন। মন এক বিচিত্র জিনিস; মনের একদিকে রয়েছেন ঈশ্বর, আর-একদিকে রয়েছে জগৎ। জগতের দিকে মন নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে খাটতে হয় না। কারণ ইন্দ্রিয়গুলি মনের সঙ্গে জুড়ে আছে আর ইন্দ্রিয়গুলি সব সময় জগতের দিকে ছুটে যাওয়ার জন্য তিড়িংবিড়ং করে লাফাচ্ছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনকে এমনিই টেনে জগতের দিকে নিয়ে চলে যায়। আর সেই মনটাকে যে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে তার জন্য বেচারিকে প্রচণ্ড খাটতে হয়। শুধু খাটলেই যে হবে তা না, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে গুছিয়ে নিয়ে আসতে হবে। যার ফলে মন ঈশ্বরের দিকে যেতে পারে না। একদিকে খাটনি, আর এই জন্মে হবে কিনা তার কোন গ্যারান্টি নেই। অন্য দিকে ইন্দ্রিয় সুখ, গৃহসুখ, নামযশ –এগুলোর জন্যও অনেক খাটতে হয়।

ঠাকুর এই যে বিদ্যা-মায়া অবিদ্যা-মায়া নিয়ে বলছেন, একটা perspective থেকে বলছেন। কিন্তু যদি মনের দিক থেকে বোঝেন তখন জিনিসটা খুব সিম্পল। মনের পাঁচটি দড়ি অর্থাৎ পাঁচটি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি তৈরী হয়েছে বিষয়ের সঙ্গে থাকার জন্য। চার-পাঁচ বছরের ছেলেগুলো যেমন দুষ্টুমি করার জন্য প্রস্তুত। যেমনি কোন ছেলেকে বলে, ভাল ছেলে; বুঝতে হবে একটা অপদার্থ। ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারে না, এদের দ্বারা কিছু হবে না, অপদার্থ। চার-পাঁচ বছরের ছেলে মানে, দুষ্টুমি করবে, বদমাইসি করবে, ভাঙচুর করবে, তবে তো ছেলে। না, আমার ছেলে খুব শান্ত, কোণায় চুপচাপ বসে থাকে; ওর হয়ে গেছে ওর দ্বারা আর কিছু হবে না। উড হাউস একজন নামকরা ইংলিশ রাইটার। ওনার

জিব সিরিজ নামে অনেকগুলো বই আছে। খুব মজার কাহিনী আর হিউমারে ভর্তি। সেখানে একটা ক্যাবলাটে লোক আছে। তার মা আবার প্রচণ্ড ক্ষমতা দেখাতে থাকে। ছেলেটির চব্বিশ পঁচিশ বয়স। মা বলে, আমার ছেলে কত ভাল। মা ওখানে ছেলেকে রেখে দিয়ে কদিনের জন্য প্যারিস গেছে। মা ওদিকে গেল আর ছেলে এদিকে ভোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এমন ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে তাকে জেলে যেতে হল।

ব্রাহ্মভক্ত –অবিদ্যাতে যদি অজ্ঞানে, তবে তিনি অবিদ্যা করেছেন কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাঁর লীলা; অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না। দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় না। 'মন্দ' জ্ঞান থাকলে তবে 'ভাল' জ্ঞান হয়।

ঠাকুর এখানে দুটো উদাহরণ দিচ্ছেন। প্রথম হল, এতে মহিমা প্রকাশ হয়। সৃষ্টি কেন হল, কিভাবে হল, কত এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করবেন? জগৎ আমার সামনে আছে, পরিষ্কার আমি দেখতে পাচ্ছি, ব্যস, এখানেই সব শেষ, statement of facts। আমার সামনে একটা আইডিয়াল দরকার; পলিটিসিয়ানসরা এক ধরণের আইডিয়াল, বিল গেটস্ আদিরা এক ধরণের আইডিয়াল, স্বামী বিবেকানন্দ আরেক ধরণের আইডিয়াল। ভাল এইজন্য করেছেন, তোমার মনের মত যেটা, সেটাকে ধরে যাতে এগোতে পার।

আমি তখন স্কুলে সিক্স কি সেভেনে পড়ি, দুজন পরিচিত ভদ্রলোক বাড়িতে এসেছিলেন। আমাকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'ধর তুমি একটা সিনেমা দেখতে যাচ্ছ আর সামনে কারুর একটা এ্যক্সিডেন্ট হয়ে গেল, তখন তুমি কি করবে'? আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'আমি ওকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাব'। অন্য ভদ্রলোক আমার কথা উত্তরটা মন দিয়ে শোনেননি, উনি তখন জিজ্ঞেস করছেন, 'বাচ্চাটা কি বলল'? যিনি শুনেছিলেন তিনি খুব সুন্দর বললেন, 'সেটাই বলল, যেটা ওর মত ছেলেরা সবাই বলবে, কিন্তু কোন দিন করবে না'। শুনে আমি লজ্জায় মরে গেলাম। সত্যিই তো জিনিসটা তো তাই! বাচ্চা বয়সে আদর্শের কথা শুনে শুনে এমন দুরবস্থা হয়ে গেছে যে, কিছু জিজ্ঞেস করলেই আদর্শের কথা বেরিয়ে আসে।

আপনার জীবনের আদর্শ কে? আমার জীবনের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ; আমার জীবনের আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাহলে আপনি এত তামসিক কেন, এত অপদার্থ কেন? তাহলে আপনি এত দুনম্বরী করেন কেন? তাহলে আপনার ঈশ্বরে ভক্তি হচ্ছে না কেন? তার মানে, আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কামিনী-কাঞ্চন, এ-ছাড়া কিছু না। এটা যদি মেনে নেন অনেক শান্তি। না মেনে নিলেও, দু-দিন বাদেই এগুলো বেরিয়ে আসবে। আমাদের পুরো এডুকেশান সিস্টেম আইডিয়ালস দিয়ে কি করে? একটা পুরো ধাপ্পবাজ বানিয়ে দেয়। খুব গম্ভীর ভাব নিয়ে বলে দিলাম, 'আমি সত্যি বলছি, আমি সিনেমা না দেখতে গিয়ে অসুস্থ মানুষটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাব'। ও-রকম ঘটনা সত্যিই যদি হয়, বাস্তবে আমি সিনেমা দেখতেই চলে যাব। আজ পর্যন্ত ওই আঘাত আমি ভুলতে পারিনি। ধীরে ধীরে আমি আদর্শের কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি। যেটা সত্য সেটাই বলি, যার পছন্দ হয় সে নেবে, যার হবে না, সে নেবে না। আমি জানি সিনেমা না দেখে অসুস্থ লোককে সাহায্য করতে এগিয়ে যাবে, এমন লোকও আছে।

ঠাকুর বলছেন, **আবার আছে খোসাটি আছে বলে তবে আমটি বাড়ে ও পাকে। আমটি তয়ের হয়ে গেলে তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটি থাকলে তবেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বিদ্যা-মায়া, অবিদ্যা-মায়া আমের খোসার ন্যায়; দুই-ই দরকার**।

আগে একটা আলোচনা হয়েছিল, জগৎটা একটা হাসপাতাল, এখানে নাম লেখালে রোগের কসুর না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া পাওয়া যাবে না। জগতে সব কিছুরই দরকার আছে। স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, এই জগৎটা একটা জিমনাসিয়াম, যেখানে আমরা নিজেদের তৈরী করি। অবিদ্যা শক্তি আছে

বলে, মায়া আছে বলে আমাদের পেশী তৈরী হয়। সব কিছু যদি আপনার মনের মত হয়, তাহলে কোন দিন আপনি নিজেকে ইস্পাতের মত কঠিন তৈরী করতে পারবেন না। জীবনে যখন দুটি পথ আসবে, একটা সহজ পথ আরেকটা কঠিন পথ; সব সময় কঠিন পথটাই বেছে নিতে হবে, মাসেলস্ তৈরী হবে। ডিম থেকে যখন কোন পাখি বা প্রজাপতি বেরোয় তখন তাকে প্রচুর কষ্ট করতে হয়, ধস্তাধস্তি করতে হয়। ওই ধস্তাধস্তি যদি না করে, মাসেলস্ তৈরী হবে না, পাখি উড়তে পারবে না; সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। জীবনে সব সময় কঠিন পথটাই বেছে নিতে হয়, তবেই বাঁচবেন; এটাই নিষ্কামকর্ম। এটাই মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে।

ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি অবিদ্যা করেছেন কেন? ঠাকুর বলছেন, তাঁর লীলা। আসলে কোন উত্তর নেই। যখনই আমরা বলি তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা; আসলে আমরা বলতে চাইছি আমার কাছে উত্তর নেই। কি করে উত্তর হবে! সৃষ্টি মানেই মায়ার রাজ্য, মায়া মানে মন, প্রকৃতির এলাকা আর ঈশ্বর প্রকৃতির বাইরে, মনের বাইরে। এখন যদি আপনি প্রশ্ন করেন, ঈশ্বর এটা কেন করেছেন; আসলে আপনি বলতে চাইছেন, মহাশয়, আপনি মন দিয়ে ওই উত্তরটি দিন যেখানে মন যেতে পারবে না। লবণ দিয়ে একটা চামচ বানানো হয়েছে, আপনি বলছেন, যাও চামচে করে জল নিয়ে এসো। লবণের চামচে আপনি কি করে জল আনবেন, লবণ তো গলে যাবে। আনা যাবে না। কিন্তু কি হয়, ধর্ম জগতে যারা প্রথম পা রেখেছে, তাদের মনে এই প্রশ্নগুলো আসবে। কিন্তু উত্তরগুলো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, যদি আপনারা বুঝতে চান। ঠাকুর এখানে অন্য উদাহরণ দিচ্ছেন, খোসা আছে বলে আম বাড়ে ও পাকে।

এখান থেকে আবার ব্রাহ্মদের পুরনো সমস্যা তৈরী হয়। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, সবারই এই সমস্যা। ওই সমস্যা থেকে ব্রাহ্মভক্ত আবার প্রশ্ন করছেন।

ব্রাহ্মভক্ত –আচ্ছা, সাকারপূজা, মাটিতে গড়া ঠাকুরপূজা –এ-সব কি ভাল? ব্রাহ্মদের মধ্যে তখন ইউরোপিয়ান চিন্তাধারার একটা প্রভাব ছিল, খুব পুরনো সমস্যা। যার জন্য স্বামীজী যখনই কলকাতাকে নিয়ে কিছু বলেছেন, প্রশংসাও বিভিন্ন কারণে করেছেন, কিন্তু বেশির ভাগই নিন্দা করেছেন, কারণটা এটা। ধর্মকে যেভাবে রাখার কথা, সেভাবে রাখেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রোমা রোঁলা বলেছিলেন –স্বামী বিবেকানন্দ যে এত কাজ করছেন, এর সাথে আপনি একটু যোগদান করুন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ চুপ থাকলেন। পরে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, বলছেন, 'আমি কখনই এমন লোকের সঙ্গ দিতে পারিনা, যে রক্তপিপাসু কালীর উপাসনা করে'। রোমা রোঁলার ডায়রিতে এই কথা নোট করা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কালী একজন রক্তপিপাসু। ব্রাহ্মভক্ত ওই পরম্পরাতেই ঠাকুরকে এই প্রশ্ন করছেন। ঠাকুরও খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –তোমরা সাকার মান না, তা বেশ; তোমাদের পক্ষে মুর্তি নয়, ভাব। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ –ভাব। **তোমরা টানটুকু নেবে, যেমন কৃষ্ণের উপর রাধার টান, ভালবাসা। সাকারবাদীরা যেমন মা-কালী, মা-দুর্গার পূজা করে, 'মা' 'মা' বলে কত ডাকে কত ভালবাসে –সেই ভাবটি তোমরা লবে, মুর্তি না-ই বা মানলে**।

এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। ধর্মের বাইরে যে জগৎ, যেখানে সাফল্যের ব্যাপার আছে, যেখানে ধর্ম ও মোক্ষকে ছেড়ে মানুষ অর্থ আর কামে নামে। দ্বিতীয়, সবাই জীবনে উন্নতি চাইছে। আধ্যাত্মিক জীবনটাও জীবন। সবার ধারণা, এই ধারণাটা পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এসেছে –জগৎ আলাদা, ঈশ্বর আলাদা; জীবন আলাদা, ধর্ম আলাদা। তা নয়, সবটাই এক। ধর্ম জীবনে সফল হওয়ার জন্য যা যা করে, জীবনে সফল হওয়ার জন্য একই জিনিস করতে হয়। অনেকের কাছেই কথাটা অবাক লাগবে। আলাদা কিছু না, ঠাকুর বলছেন, যে নুনের হিসাব জানে সে চিনির হিসাবও জানে।

ধর্ম জীবনে এগোনর জন্য ধ্যানের দরকার, অর্থাৎ মনকে একাগ্র করা। ক্রিকেট খেলাতেও তাই লাগে, ফুটবল খেলাতেও তাই লাগে, পড়াশোনা করতেও তাই লাগে, বৈজ্ঞানিকদেরও তাই লাগে, যুদ্ধ করতেও তাই লাগে, কুস্তি করতে হলেও তাই লাগে। ব্রুসলি যখন কুংফু করত, তখন তারও তাই লাগত। এমন কোন কিছু নেই যেখান মনকে কেন্দ্রিত না করে কাজ করা যাবে। রান্নাবান্না করতেও তাই লাগে। তাহলে এমনি জীবন আর ধর্ম জীবন আলাদা কোথায় থাকল? জীবন আর ধর্ম জীবনে আলাদা কিছু নেই। এগুলো খ্রীশ্চানদের ধারণা, যেখানে ঈশ্বর আলাদা জগৎ আলাদা। সেইজন্য জীবন চালানোর জন্য কিছু দরকার, ধর্ম জীবন চালানোর জন্য অন্য কিছু দরকার। স্বামীজী তাই খুব সুন্দর বললেন – There is nothing secular in India। ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষ বলতে হিন্দু ধর্ম, এখানে জাগতিক বলে কিছু হয় না।

এখানে ঠাকুর বলছেন –তোমরা ভাবটুকু নাও; এই যে বলছেন ভাবটুকু নাও, দেখবেন এটা জীবনের সব জায়গায় প্রযোজ্য। ভাব জিনিসটাকে বোঝানর জন্য একটা অন্য শব্দ নিয়ে আসছি – Impersonal and Personal। যে কোন ভাব, এটা হল impersonal। এই ভাব যখন কোথাও গিয়ে বেরোয়, তখন ওটা হয়ে যায় –personal। জীবনে যদি অসফল হতে চান, যে কোন জিনিসকে personal বানিয়ে দিন। জীবনে কোথাও যদি সফল হতে চান, তাহলে ওটাকে আপনি impersonal রাখুন। যদি রাখেন আপনি সাফল্য পাবেন, যদি impersonal হওয়ার আগে personal বানিয়ে দেন, জিনিসটা আপনার হারিয়ে যাবে। উদাহরণের জন্য আমরা বিদ্যা জিনিসটাকে নিতে পারি। স্কুল কলেজে আপনি যদি বিদ্যার্জনের চেষ্টা করেন, এটা হয়ে গেল impersonal। শুধু নম্বর পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করে, মা-বাবাকে খুশি করার জন্য যদি পড়াশোনা করে, শিক্ষক মহাশয়কে খুশি করার জন্য যদি করে, তখন এটা হয়ে গেল personal। এতে নম্বর হবে, সবই হবে কিন্তু বিদ্যার্জন হবে না, বিরাট সাফল্য আসবে না। গান-বাজনাতে যত রেওয়াজ করবেন, তত আপনি একজন উচ্চমানের গায়ক হবেন। কিন্তু প্রথমেই যদি স্টেজে পারফরম করতে হবে, সুগায়ক হিসাবে নাম করে একজন সেলিব্রেটি হতে হবে, বুঝে নিন গান আপনার শেষ। জীবনে যে কোন জিনিসে যদি সফল হতে চান, impersonalকে নিতে হয়, ভাবটুকু নিতে হয়। ভাব আর impersonal এক নয়, আমি এখানে বলছি যাতে জীবনে ওটাকে লাগানো যায়।

কি রকম হয় impersonal? এখান থেকে আধ্যাত্মিক জীবনের একটা উত্থান কিভাবে হয়? অনেকেই বলেন, ঠাকুরের পথে কিভাবে এগোব। যাঁরাই বলেন, বুঝে নিই যে, এখনও সময় হয়নি; কারণ যাঁদের সময় হয়ে গেছে তাঁরা এই ধরণের প্রশ্ন করবেন না। আমরা বিষয় থেকে একটু সরে যাচ্ছি। ঠাকুর বলছেন, ভাবটুকু নিতে হয়, বিদ্যাটুকু নিতে হয়। কি রকম? একটা ঘটনার কথা আগেও বলেছিলাম। আইনস্টাইন যদিও একজন পদার্থ বিজ্ঞানী, কিন্তু খুব সুন্দর বেহালা বাজাতেন। একবার তিনি তাঁর এক বাড়ি গেছেন, সেখানে ছোটা একটা মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম হবে। প্রোগ্রাম চলছে, আইনস্টাইন দেখছেন, একটা যুবক চুপ করে বসে আছে, বুঝতে পারলেন ওর এই ক্ল্যাশিকাল প্রোগ্রাম ভাল লাগছে না। আইনস্টাইন ছেলেটির কাছে গিয়ে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, 'সঙ্গীতে কি তোমার কোন রুচি নেই'? বলল, 'না আমার কোন রুচি নেই'। 'কোন গানেই কি রুচি নেই'? 'না, কোন গানেই রুচি নেই'। 'কখন কোন গান নিশ্চয় ভাল লেগেছে'? তখন অনেক চিন্তা-ভাবনা করে, একটা রাস্থার গান, আমাদের ভাষায় আধুনিক গানের কথা বললেন।

আইনস্টাইন ওই বাড়ির পরিচিত ছিলেন। যুবকটিকে তিনি উপরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা গ্রামোফোন আছে। উনি খুঁজে খুঁজে ওই রেকর্ডটা বার করলেন। বাজিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই গানটির কথাই তো বলছিলে'? উনি বাজিয়ে গানটা শোনাচ্ছেন আর বলছেন, 'দেখ এর সুর তাল কেমন'। এরপর তিনি অন্য একটা রেকর্ড বার করলেন। দেখাচ্ছেন কিভাবে একই সুর, একই তাল কিন্তু অন্য গান। তারপর আরেকটা রেকর্ড বার করে শোনালেন, সুর, তাল একই কিন্তু আরও ক্লাশিক্যাল।

আইনস্টাইন আস্তে আস্তে তাকে লঘু থেকে উচ্চাঙ্গের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আর শেষে উনি যুবকটিকে একেবারে শুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে নিয়ে এলেন। তোমার পছন্দের যে গান, সেই আধুনিক লারেলাপ্প গানই কিভাবে একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে জুড়ে আছে।

ঠাকুর এখানে যে ভাবের কথা বলছেন, আর আইনস্টাইনের যে ঘটনাটা বললাম, দুটো আলাদা কিছু না, একই জিনিস। কোথাও তোমার মধ্যে একটু রুচি আছে? কোথাও কারুর মধ্যে passion দেখছ? আমরা passion শব্দ ব্যবহার করি ঠিকই কিন্তু এটা ভাব শব্দকে বোঝায় না। কিন্তু কোথাও কি আপনি passion দেখেছেন? ওটাকে নিতে হয়। আমি একবার পাটনা শহরে গিয়েছিলাম, কয়েকদিন সেখানে ছিলাম। ওখানে একদিন একজনের সাথে একটা স্টেডিয়ামে হাঁটছিলাম। সেখানে দেখছি একজন ব্যাটিং প্র্যাক্টিস করছে। দেখলাম গাছে একটা বড় দড়ি দিয়ে একটা ক্রিকেট বলকে ঝুলিয়ে রেখেছে আর ব্যাট দিয়ে ওই ঝুলন্ত বলটাকে মারছে। বলটা কিছুটা দূরে ছিটকে যাচ্ছে, আবার যখন ফেরত আসছে তখন অন্য একটা এ্যাঙ্গেল থেকে আসছে। এইভাবে প্রত্যেকবার এ্যাঙ্গেল পাল্টে যাচ্ছে, আর লোকটি বলটাকে পিটিয়ে যাচ্ছে, এক নাগাড়ে করেই যাচ্ছে। অনেক আগেকার ঘটনা, বোধ হয় ১৯৯৪ কি ১৯৯৫ হবে। আটাশ ঊনত্রিশ বছর হয়ে গেছে, ঘটনাটা আজও ভুলিনি। ওটা দেখে আমারও তখন মনে হয়েছিল, এটাকেই বলে অনুশীলন।

ভাগবতে অবধূত প্রসঙ্গে আছে, সেখানে অবধূত বলছেন, আমার চব্বিশ জন গুরু। চব্বিশ গুরু মানে তিনি চব্বিশ জায়গা থেকে চব্বিশ রকম বিভিন্ন শিক্ষা নিয়েছেন। ভাগবত এখানে শিক্ষা গ্রহণ করার একটা রূপরেখা দেখিয়ে দিচ্ছেন। এখানে ঠাকুর শিক্ষা গ্রহণের কথা না বলে বলছেন, ভাব; যেখানে প্রচণ্ড passion রয়েছে, একেবারে পুরোদমে। আইনস্টাইনের যে ঘটনা বললাম, এটা একটা কাহিনী। ক্রিকেট বল ঝুলিয়ে প্র্যাক্টিস করছে, এটাও একটা কাহিনী। কিন্তু প্যাসান্ হল যেখানে ঠাকুর ভাব নিয়ে যেটা বলছেন –তোমরা টানটুকু নেবে। টানটুকু নেওয়ার ব্যাপারে ঠাকুর আগেও বলেছেন, যেখান বলেছিলেন, সতীর পতির উপর টান।

এবার দুটোকে যদি মিলিয়ে দেন, জীবনে যদি উন্নতি করতে চান, আধ্যাত্মিক জীবনে যদি উন্নতি করতে চান, অপরের দিকে তাকানোর দরকারও নেই, নিজের দিকে তাকান। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন অন্য কোন কিছু কি আছে, যেটাকে আপনি ভালবাসেন? বা যেটাকে আপনার ভাল লাগে? কিছু একটা কি আছে? ঝগড়া করতে পারেন? তর্কাতর্কি বা ঝগড়া যখন করে তাতেও সৃজনাত্মক কিছু বেরিয়ে আসে। অনেক সময় বাচ্চারা ঝগড়া করে বলে, আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি; আর সত্যিই বেরিয়ে যাবে। বুঝতে হবে ওর ওই টানটুকু আছে, একটা সময় আসবে ও বেরিয়ে যাবে, থাকবে না। এটা হল ওটার প্রস্তুতি। আপনার জীবনে কি কোন দুর্বলতা আছে? ওই দুর্বলতার পিছনে বুঝবেন একটা প্যাসান্ আছে। ওটাকে যদি টেনে বড় করে দেন, আধ্যাত্মিক জীবনে আপনি এগিয়ে যাবেন। অন্যান্য ধর্মে ধর্মজীবন মানে এতটুকু থেকে এতটুকু। হিন্দুদের এ জিনিস হয় না। আমাদের মত পথ, যে কোন পথ দিয়ে আপনি এগোতে পারেন। আপনার ভিতরে কোন গুণ আছে কি? রান্না করতে ভালবাসেন কি? রান্না করা না, রান্না করতে ভালবাসা। যে কোন বিশেষ দিন এলে, ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জন্মতিথি, দুর্গাপূজা; খুব করে রান্না করুন আর সবাইকে ডেকে ঈশ্বর জ্ঞানে খাওয়ান। নারায়ণ এসেছেন, তিনি বন্ধু নারায়ণ হন, দরিদ্র নারায়ণ হন, যে নারায়ণই হন, সেবা করুন। এতেই আপনার হবে। খুব ভাল করে বিশেষ রান্না করে দু-চারজনকে খাওয়ান, তাতেই আপনার হবে।

আপনার ঝগড়া করা স্বভাব? খাতা কলম নিয়ে বসুন। এক পাতা কি দু-পাতা লিখে লিখে বুঝিয়ে দিন –ঠাকুর তোমার সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করব। ঠাকুরের সঙ্গে রোজ ঝগড়া করুন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার যে ঝগড়ার স্বভাব ওটা আধ্যাত্মিক ভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। জীবনে কাউকে ভালবাসেন, কাউকে কখন ভালবেসেছেন? ওই ভালবাসাকে বৃহৎ রূপ দিয়ে পুরো জগৎকে ভালবাসতে

শিখুন; জগৎ ঈশ্বরের বাইরে না। ঠাকুর যেটা বলছেন, বোঝানর জন্য সেখান থেকে একটু সরে এসেছি। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি এভাবেই হয়। কিছু একটা আপনার দুর্বলতা আছে, দুর্বলতা মানে, একটা জিনিস আপনাকে টেনে ধরে আছে। ভালবাসা মানেও একই জিনিস, কোন ব্যক্তি বা বস্তু আপনাকে টেনে ধরে আছে।

সমাজ যেটাকে ভাল বলে সেটাকে আমরা বলি শক্তি, সমাজ যেটাকে নিন্দা করে সেটাকে বলি দুর্বলতা। দুর্বলতা বলে কিছু হয় না, সবটাই প্যাসন্। দুর্বলতা বলে কিছু হয় না, সবটাই শক্তি বিশেষ। ওই শক্তিকে সমাজ অনুমোদন করেছে বলে ওটাকে বলি শক্তি। সমাজ অনুমোদন করে না বলে আমরা বলি দুর্বলতা। ওই শক্তিটাকে ঈশ্বরের দিকে দিয়ে কাজে লাগালে মহাপুরুষ হয়ে যাবেন। আধ্যাত্মিক জীবনে যদি এগোতে চান, আপনার যেটা personalized রয়েছে, আপনার ভালবাসা, আপনার রান্নাবান্না ওই গুণটাকে আপনি কাজে লাগান আর ওটাকে নিয়ে চলে যান একেবারে impersonal লেভেলে, করে দেখুন আপনি কেমন ঈশ্বরে ডুবে যাবেন। ঝগড়া করার কথা বললাম, সেটাকেও আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান বানিয়ে নেওয়া যায়। ঠাকুর কক্ষণ এমন লোকের নিন্দা করবেন না, যিনি সত্যিই ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছেন, বা যেতে চাইছেন; তা তিনি সাকারবাদীই হন আর নিরাকারবাদীই হন, ঢংঢাংটা না থাকলেই হল; উনি সব কিছুকেই মানবেন।

তবে আজ আর এই প্রসঙ্গের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। কারণ রামকৃষ্ণ মিশন আজ পুরো হিন্দু ধর্মের এমন একটা প্রতিষ্ঠান, পুরো ভারতবর্ষে যা একটা সম্মানের স্থানে পৌঁছে গেছে। ফলে এখন দেশ-বিদেশ থেকে মানুষ বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা দেখতে আসছে। বিহার কি ইউপির কোন লোক একদিন মঠে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনারা এত বড় মন্দির কেন বানাতে গেলেন, এত বড় মন্দির কিসের প্রয়োজন, ছোট মন্দির হলেও তো হয়ে যায়'। আমি বললাম, 'আপনারা বাইরে বড় বড় স্টেডিয়াম বানাতে পারেন, বড় বড় সিনেমা হল বানাতে পারেন, বড় বড় মল বানাতে পারেন, বিশাল বিশাল রেলওয়ে স্টেশন বানাতে পারেন আর আমরা মন্দির নির্মাণ করার সময় আপনাদের যত আপত্তি'? 'না, ওগুলোতে মানুষের মঙ্গল হয়'। 'আপনি কি করে জানলেন এখানে মানুষের মঙ্গল হয় না'? বোকা বোকা কথা।

ভাগ্যিস ঠাকুর এসেছিলেন, ভাগ্যিস রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হল, যার জন্য এই ধরণের অনেক হাবিজাবি জিনিসগুলো কেটে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, এগুলোর আর কোন দাম নেই। কিন্তু যেটার দাম আছে, ঠাকুর যেটা বলছেন – ভাবটুকু। অপরের মধ্যে যদি দেখেন কোন প্যাসন্ আছে, যে কোন প্যাসন্, যেমন ক্রিকেটের কথা বলা হল; সেটাকে নিয়ে নিজের জীবনে নামাতে হয়। আর আপনার ভিতরে কোন গুণ যদি থাকে, আইনস্টাইনের যে গল্প বলা হল, সেই গুণটাকে ধরে ধাপে ধাপে উঠে যেতে হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি রাতারাতি হয় না। আধ্যাত্মিক অবনতিও রাতারাতি হয় না। গীতায় ভগবান একদিকে বলছেন, *স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ*, যোগ যখন নাশ হয় এই নাশ হতে অনেক সময় লাগে, ঠিক তেমনি যোগ যখন তৈরী হয় সেটার জন্যও অনেক সময় লাগে, *কালেনাত্মনি বিন্দতি*। রাজযোগেও বলছেন *স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ*, অনেকদিন লেগে থাকতে হয় তবে গিয়ে দৃঢ়ভূমি তৈরী হবে। লেগে থাকতে হয়, নিষ্ঠা আনতে হয়, স্থৈর্য আনতে হয়। যাঁরা রাধাকৃষ্ণ করছেন, যাঁরা কালী কালী করছেন কি রাম রাম করছেন, এনারা হলেন ভক্ত; এনাদের কাছে ভক্তি জিনিসটা, নিষ্ঠা জিনিসটা শিখে নিতে হয়।

আগে বলেছিলাম, অমরনাথ যাত্রার সময় এক ফকিরের সঙ্গে দেখা হল। ভাবলাম এনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি। বললাম, ভক্তি কিসে হয়? আমার মনে হল, একজন ফকির, সাধনভজন নিয়ে থাকেন, এনাকে জিজ্ঞেস করি। ফকির বললেন, 'জমিদারি অর্জন করার জন্য যেভাবে খাটতে হয়, ভক্তিলাভ করার জন্য ঠিক ওভাবেই খাটতে হয়'। সব জায়গা থেকে, সবার কাছ থেকে শিখতে হয়। খাটতে হয়,

খাটতে গেলে ওই ভাবটুকু নিতে হয়। এবার দেখুন, ভাব যেখানে আছে, যেখানে আপনি পুরোদমে নেমে গেছেন, যেখানে ভাব হয়ে গেছে ইমপার্সোনাল; যিনি কৃষ্ণভক্ত, যিনি বৈষ্ণব, তাঁর ভাবের রূপ আসছে কৃষ্ণ রূপে। যে কালীভক্ত তার ভাব আসছে কালী রূপে। আপনার নিরাকার ভাল লাগে, তাতে কোন অসুবিধা নেই; ভাবটা তো আপনার দরকার, ওই ভাবটুকু নিন না।

একজন ভদ্রমহিলাকে জানতাম, ওনার বেশি বয়সে ছেলে হয়েছে। এক মেয়ে ছিল সে বড় হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রমহিলা এখন ছেলেকে খুব ভালবাসে। চার-পাঁচ বছর বয়স হয়েছে ছেলের। ছেলেটি পাড়ার ছেলেদের সাথে ঝগড়া করেছে, ঝগড়া করে পালিয়ে এসে মায়ের কোলে লুকিয়ে গেছে। পাড়ার ছেলেগুলো এগিয়ে এসেছে ওকে ধরবে বলে। মা একেবারে সিংহীর মত এগিয়ে এসেছে –'কে আমার ছেলেকে মারবে, এসো তো'! এই ঘটনাটা আমি প্রায় চল্লিশ-পয়তাল্লিশ বছর আগে দেখেছি। এই ভাব –আমি আমার ছেলের রক্ষা করব। রামকৃষ্ণ মিশন, এই সঙ্ঘের প্রতি আমারও এই ভাব। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নামে কিছু বলেছ, সোজা করে দেব। হিন্দু ধর্মের নামে কিছু বলেছ, সোজা করে দেব। ওই ভাবটা আমার মনে গেঁথে আছে, নিজের ছেলের জন্য একেবারে সিংহীর রূপ, এই ভাব। যাকে ভালবাসছেন, তার আপনি রক্ষা করবেন না? ব্রাহ্মভক্ত আবার প্রশ্ন করছেন।

ব্রাহ্মভক্ত –বৈরাগ্য কি করে হয়? আর সকলের হয় না কেন? ঠাকুর আগেও এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –ভোগের শান্তি না হলে বৈরাগ্য হয় না। এর আগে বলেছিলেন, ভোগের অন্ত না হলে হয় না, একটু ভোগ করে নিতে হয়, তা নাহলে বৈরাগ্য হয় না। ভোগান্ত হওয়ার আগেই যদি বৈরাগ্য হয়ে যায়, এই বৈরাগ্য বেশি দিন টিকবে না। জোর করে বৈরাগ্য করতে নেই। আইনস্টাইনের আর-একটি ঘটনা আছে। বিজ্ঞান জগতের ঋষি ছিলেন তিনি। একজন ইয়ং বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচয় করাতে গিয়ে আইনস্টাইনকে বলছেন, He so humble। আইনস্টাইন বলছেন, What? He has no achievement in his credit, how can he be humble। জীবনে আপনার কোন উপলব্ধি নেই, কোন সাফল্য নেই, কি করে আপনি বিনয়ী হয়ে যাবেন? গাছে ফল এলে গাছের ডাল ঝুঁকে যায়। আপনার কোন উপলব্ধি নেই, কি করে আপনি বিনয়ী হবেন, বিনয়ী না হলে ধর্ম জীবনে কি করে এগোবেন। বৈরাগ্য? কিসের থেকে বৈরাগ্য? আপনার আছেটা কি যে সেটা থেকে বৈরাগ্য নেবেন? আপনার একটা শরীর আছে, সেটা ভগবান দিয়েছেন; একটা বাড়ি আছে, দুটো টাকা আছে; বাবা-মা দিয়েছেন। বাবা-মা আপনাকে পড়াশোনা করিয়েছেন, সেখান থেকে একটা ডিগ্রি পেয়ে গেছেন, তার জোরে একটা চাকরি পেয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করছেন। আপনার নিজস্ব বলতে আছেটা কি? কোন জিনিসটা আপনি খেটে পেয়েছেন? কিছুই নেই, বৈরাগ্য কি থেকে হবে, কি করে হবে? আর বৈরাগ্য যদি না আসে ঈশ্বরের দিকে আপনি যাবেন কি করে?

ঠাকুরের উদাহরণগুলো দৈনন্দিন জীবন থেকে নেওয়া। **ছোট ছেলেকে খাবার আর পুতুল দিয়ে বেশ ভুলানো যায়। কিন্তু যখন খাওয়া হয়ে গেল, আর পুতুল নিয়ে খেলা হয়ে গেল, তখন 'মা যাব' বলে। মার কাছে নিয়ে না গেলে পুতুল ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আর চিৎকার করে কাঁদে**। ভোগের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। আবার বেশি ভোগে নেমে গেলে ওখানেই থেকে যেতে হবে।

ব্রাহ্মভক্তরা গুরুবাদের বিরোধী। তাই ব্রাহ্মভক্তটি এই-সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

গুরুবাদ আর গুরুবাদের বিরোধিতা করা, এটা একটা বিরাট সমস্যা। প্রথম কথা, ধর্মদর্শনের ব্যাপার যেখানে আসে, সেখানে ব্রাহ্মরা পুরো সংশয়াচ্ছন্ন, যার জন্য ব্রাহ্মধর্ম এক প্রকার হারিয়েই গেল, টিকতে পারল না। কাগজে, পত্রিকায় দুটো প্রবন্ধ ছাপিয়ে, ফাণ্ডামেন্টাল রাইটস, ডিরাইভড্ রাইটস, এই করে ধর্ম হয় না। এগুলো সংবিধানে হয়, ধর্মদর্শন এভাবে চলে না।

জে কৃষ্ণমুর্তি নামে একজন খুব উচ্চমানের চিন্তক ছিলেন, ওখানেই শেষ। উনিও গুরুবাদের বিরোধী। ওনার কিছু বই পড়েছি, বায়োগ্রাফিও পড়েছি, দেখেছি সব বেকার। কোন পরম্পরা নেই, কিছু নেই, এদিকে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। 'আমি গুরুবাদের বিরোধী'। তাহলে আপনি কেন শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন? তখন বলবেন, 'না, গুরু মানে যিনি উদ্ধার করবেন, এর বিরোধী'। গুরুগিরি সবাই করছেন, আপনি একটু কম করছেন, ওনারা একটু বেশি করছেন, সমস্যা তো একই। আপনার আদর্শ যদি গুরুবাদ বিরোধী, অর্থাৎ গুরু যেন না থাকে। জে কৃষ্ণমুর্তি যখন লেকচার দিতেন হাজার হাজার লোক শুনত, তাহলে আপনার উপদেশ দেওয়ার কি দরকার? পুরো জিনিসটা এদের কাছে কনফিউসড্, আর অযৌক্তিক।

কিছু কিছু ধর্ম আছে পৌত্তিলকতা নিয়ে বিদ্রুপ করে, ব্রাহ্মসমাজও তাই করত। আবার অন্য দিকে বলছে, তোমার চরণধূলিতে মাথা নত করে দাও। কি রকম একটা কনফিউসিং জিনিস, ভাবা যায় না। কিছু কিছু ধর্মে নিরাকার সাধনার কথা বলে, কিন্তু যখন প্রার্থনা করবে তখন একটা বিশেষ দিকে মুখ করে করবে। ওটাও যে পৌত্তলিকতা, এটাকে ওদের বোঝান যাবে না, বুঝবেও না। বিভিন্ন ধর্মের কাছে শিবলিঙ্গ একটা পাথর মাত্র আর শিবলিঙ্গ মানে লিঙ্গ। আর তুমি যখন রোমে ভ্যাটিকান যাও, তখন ওটা কি জিনিস? একই জিনিস। জেরুজালেমে যখন যাও, তখন সেটা কি? একই জিনিস। একটা জিনিস এতদিনে আমি বুঝেছি, হিন্দু ধর্মের যারাই বিরোধিতা করে, এখানে ধর্ম দর্শনের কথা বলছি, অনুশীলনের কথা বলা হচ্ছে না, অনুশীলনগুলো তো আমরাও মানি না; আমি বুঝি নিই লোকটা খেলো, ভেতরে এক ফোঁটা দম নেই, সারহীন।

ব্রাহ্মভক্ত –মহাশয়, গুরু না হলে কি জ্ঞান হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ –সচ্চিদানন্দই গুরু, যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে, সচ্চিদানন্দই ওই রূপ ধারণ করেছেন।

কণ্ডিশান হল, যদি আপনার জ্ঞান হয়, যদি আপনার ভিতরে আধ্যাত্মিক স্ফুরণ হয়, যদি ধর্মের দিকে আপনার মন যায়; বুঝবেন ঈশ্বর তাঁকে দিয়ে আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ ঈশ্বর ছাড়া এটা হবে না। শিয়াল কখনই সিংহের জন্ম দিতে পারে না, সিংহের জন্ম সিংহই দেবে। চৈতন্যের জ্ঞান, চৈতন্যের স্ফুরণ একমাত্র চৈতন্যই দেবেন। চৈতন্য একমাত্র সচ্চিদানন্দ, একমাত্র সচ্চিদানন্দই চৈতন্য দিতে পারেন। কোন কারণে, কোন বইয়ের মাধ্যমে যদি আপনার জ্ঞান হয়, কোন মানুষের মাধ্যমে যদি হয়, বুঝবেন ঈশ্বর কৃপা করে আপনাকে এই জ্ঞান দিচ্ছেন।

এখানে এসে আবার গোঁড়ামি মাথা চাড়া দেয়। আপনার হয়ত কোন বই পড়ে ভাল লাগল। এরপর আপনি সবাইকে বলতে লাগলেন, তোমরা এই বইটা পড়, অনেক উপকার পাবে। আপনার হয়েছে বলে অন্যদেরও হবে, তার কোন মানে নেই। সেখান থেকে এসে যাবে ধর্মান্ধতা। তুমি এই বইকে মানবে না, দেখি তোমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে। তোমার হয়েছে বলে তোমার জন্য সচ্চিদানন্দ –যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তদ্যাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রাই। তিনি আপনার জন্য গুরু, আপনার মা আপনার জন্য মা, আপনার মা আপনার জন্য পূজনীয়। তাই বলে আমাকেও কি আপনার মাকে পূজা করতে হবে? একটু যদি গভীরে যান, দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে, লোকেরা কত অযৌক্তিক হয়। হিন্দু ধর্ম এমন এক ধর্ম, যে ধর্ম দশ হাজার ধরে রিফাইন হয়েছে।

ঠাকুর বলে যাচ্ছেন, **গুরু যেমন সেথো; হাত ধরে নিয়ে যান। ভগবানদর্শন হলে আর গুরুশিষ্য বোধ থাকে না। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই'**। এগুলো খুব উচ্চমানের কথা, এর আলোচনা করে কোন লাভ নেই। এই কথাগুলো আবার বৈষ্ণবদের কিছু প্রচলিত কথা। ওখানে কি হয়,

যখন গুরু নিয়ে যান তখন সব এক রকম হয়ে যায়, তখন কে গুরু কে শিষ্য। আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে কিসের গুরু আর কিসের শিষ্য। যারা গুরুবাদের বিরোধী, তারা নিজেরাই গুরু; এগুলো এদের বোঝার ক্ষমতা নেই। আপনি যখন শিক্ষা দিচ্ছেন, আপনি আপনার বুদ্ধির জোরে শিক্ষা দিচ্ছেন। আর ইনি কি বুদ্ধির জোরে শিক্ষা দিচ্ছেন? না, ইনি প্রাণে শক্তি সঞ্চার করছেন। এতে আপনার কিসের আপত্তি? এনারা অনেক সময় যে বলেন, আপনারা যে অন্ধ ভক্তি করছেন, এগুলো ভাল না। সে তো সবাই জানে, আপনাকেই বা কেন বিশ্বাস করতে যাব আমি? আপনাকে যে বিশ্বাস করব সেটাও তো অন্ধভক্তি।

তাই জনক শুকদেবকে বললেন, 'যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও আগে দক্ষিণা দাও'। কেননা, ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর গুরু শিষ্য ভেদবুদ্ধি থাকবে না। যতক্ষণ ঈশ্বরদর্শন না হয়, ততদিনই গুরুশিষ্য সম্বন্ধ।

এগুলো মজার কাহিনী, মজার ছলে বলা হয়। শুকদেব রাজা জনকের কাছে গিয়েছিলেন। রাজা জনক বলছেন, 'ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেলে গুরুশিষ্য বোধ থাকবে না, তাই আগে আমার দক্ষিণাটা দিয়ে দাও'। তার মানে, এখানে ঠাকুর পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, গুরু লাগবে। এখন এটাও দেখার, গুরু সবাইকে উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু সবারই কি হয়? যার যে রকম শ্রদ্ধা, তার সেই রকম অগ্রগতি। আপনার নিজের যে শ্রদ্ধা, ওই শ্রদ্ধার জোরেই আপনি এগোচ্ছেন।

একজন মহারাজ আমাদের গল্প বলতেন। একজন গুরু লক্ষ লক্ষ দীক্ষা দিয়ে চেলা বানিয়ে যাচ্ছেন। গুরুর এখন চিন্তা হল, শিষ্যগুলির যে পাপ, তাতে আমার কি দুর্দশা হবে? চিন্তা হতেই গুরু এবার নিজের গুরুর কাছে চললেন, সেই গুরু আবার কোথায় কোন গুহায় থাকেন। উনি কানে কানে একটা বুদ্ধি দিয়ে দিলেন। একদিন খবর হয়ে গেলে এই গুরুর পায়ে বিরাট একটা ফোঁড়া হয়েছে এবং উনি মারা যাবেন। তবে যদি কোন শিষ্য ফোঁড়াটা খেয়ে নেয়, তাহলে গুরু বেঁচে যাবেন। সব শিষ্যরা কান্নাকাটি করছে, আমাদের গুরু চলে যাবেন। তার মধ্যে অতি সাধারণ একটি লোক গুরুর দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে, কিন্তু সবাই তাকে ধাক্কা মেরে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। গুরু বললেন, লোকটিকে সামনে আসতে দাও। লোকটি এসে গুরুর কাছে দাঁড়িয়েছে। গুরু তাকে বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও বল'। সেই শিষ্য বলছে, আমার তো আর কেউ নেই, আপনিই একমাত্র আছেন। আপনার প্রাণ যদি রক্ষা পায় তাতে এত লোকের মঙ্গল হবে, আমিই আপনার এই ফোঁড়াটা খাব। গুরু বললেন, 'ঠিক আছে খাও'। লোকটি খেতে শুরু করেছে। গুরু জিজ্ঞেস করছেন, 'কেমন লাগছে খেতে'? লোকটি বলছে, 'খুব মিষ্টি লাগছে'।

আসল ব্যাপারটা হল, গুরুর গুরু কানে কানে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, পায়ে একটা মিষ্টি পাকা আম বেঁধে নিয়ে যাও, আর সবাইকে বলবে, আমার পায়ে ফোঁড়া হয়েছে। প্রচার করে দেবে যে, ফোঁড়ার এত যন্ত্রণা যে গুরুর শরীর থাকবে না। কিন্তু কোন শিষ্য যদি ফোঁড়াটা শুষে নেয়, তাহলে গুরু ভাল হয়ে যাবেন। এটা শোনার পর যে শিষ্য শুষে নেবে বুঝবে ওই তোমার একমাত্র শিষ্য, যার ভার তোমাকে বহন করতে হবে; বাকি সব শিষ্যগুলো এমনি ফাক্কা শিষ্য। আমাদেরও বিচার করে দেখতে হবে, আমরা কি ফাক্কা চেলা নাকি আসল চেলা। যে আসল চেলা, গুরুর প্রতি সমর্পিত, তার ভিতরে গুরুর শক্তি সঞ্চারিত হয়, গুরু একমাত্র তাকেই নিয়ে যান, অন্য কাউকে না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ব্রাহ্মভক্তরা কেহ কেহ ঠাকুরকে বলিতেছেন, 'আপনার বোধহয় এখন সন্ধ্যা করতে হবে'।

শ্রীরামকৃষ্ণ —না, সেরকম নয়। ও-সব প্রথম প্রথম এক-একবার করে নিতে হয়। তারপর আর কোশাকুশি বা নিয়মাদি দরকার হয় না। ঠাকুর অবতার কিনা। সাধারণ মানুষের জন্য নিয়মাদি দরকার। শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা চট করে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যাবেন না, যদি হয়ে যান তাহলে এই ব্রাহ্মভক্তদের মত ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যাবেন। আমি আগে জানতাম না, এখন অনেকের কাছে শুনি, সন্ধ্যে

হয়ে গেলে তাঁরা নিজেরা ঠাকুরের সামনে বসে খণ্ডন ভব বন্ধন গান করেন, বেলুড় মঠে নিত্য যে রকম হয়। অনেকে এক ঘণ্টার মত ঠাকুরের সামনে বসে গান করেন, জপ করেন। অনেকে আবার ঠাকুরের আরতি করেন। অনেকে আরতি করেন না, ধূপ জ্বেলে গান চালিয়ে দেন। অনেকে আবার নিজেরাই গান করেন। শুনে খুব ভাল লাগল। এগুলোই সাধনা, এই সাধনাই উপরে নিয়ে যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্য শ্রীবেচারাম –বেদান্ত ও ব্রহ্মতত্ত প্রসঙ্গ

সন্ধ্যার পর আদিসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত বেচারাম বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিলেন। মাঝেমাঝে ব্রহ্মসঙ্গীত ও উপনিষদ্‌ হইতে পাঠ হইতে লাগিল। উপাসনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বসিয়া আচার্য অনেক আলাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –আচ্ছা, নিরাকারও সত্য আর সাকারও সত্য; আপনি কি বল?

আচার্য –আজ্ঞা, নিরাকার যেমন Electric Current (তড়িৎ প্রবাহ) চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। এখানে আচার্য কিন্তু সাকারের কোন উল্লেখ করলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হাঁ, দুই সত্য। সাকার-নিরাকার দুই সত্য। ঠাকুর খুব জোর দিয়ে পরিষ্কার বলছেন। এই ভাব আমাদের শাস্ত্রের সব জায়গায় আছে; ভাগবতে আছে, গীতাতে তো আছেই। **শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জানো? যেমন রোশনচৌকির একজন পোঁ ধরে থাকে –তাঁর বাঁশির সাত ফোকর সত্ত্বেও। কিন্তু আর-একজন দেখ কত রাগ-রাগিণী বাজায়! সেরূপ সাকারবাদীরা দেখ ঈশ্বরকে কতভাবে সম্ভোগ করে! শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর –নানাভাবে**। এটা পুরোপুরি আপনার মনের উপর নির্ভর করে আপনি কোনটা নেবেন। ঠাকুর এই কথা এইজন্যই বলছেন, কারণ এই ব্রাহ্মভক্তরা শুষ্ক, এদিকেও না, ওদিকেও না। ওদের মনে এই ভাবটা সঞ্চার করার জন্য বলছেন।

কি জানো, অমৃতকুণ্ডে কোনও রকমে পড়া। তা স্তব করেই হোক অথবা কেউ ধাক্কা মেরেছে আর তুমি কুণ্ডে পড়ে গেছ, একই ফল! দুই জনেই অমর হবে।

ব্রাহ্মদের পক্ষে জল বরফ উপমা ঠিক। ঠাকুর এই উপমা এর আগেও এনেছেন। **সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত জলরাশি। মহাসাগরের জল, ঠাণ্ডা দেশে স্থানে স্থানে যেমন বরফের আকার ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তি হিমে সেই সচ্চিদানন্দ (সগুণ ব্রহ্ম) ভক্তের জন্য সাকার রূপ ধারণ করেন। ঋষিরা সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রূপ দর্শন করেছিলেন, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন। ভক্তের প্রেমের শরীর, 'ভাগবতীতনু' দ্বারা সেই চিন্ময় রূপ দর্শন হয়**। আমি জানি না, আপনারা 'ভাগবতীতনু' কজন বোঝেন।

এর কিছু কিছু কথা আগে আলোচনা হয়েছে। কেবল দু-তিনটি কথা এখানে ঠাকুর বলছেন – অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রূপ দর্শন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন, দ্বিতীয় –ভক্তের প্রেমের শরীর; তৃতীয় –ভাগবতীতনু। শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগবতীতনুর কথা আছে।

একদিন আমরা এর একটু আলোচনা করেছিলাম। আপনার ভিতর যদি একটু হিন্দু ভাব থাকে, তাহলে নিশ্চয় আপনাদের বিশ্বাস আছে মৃত্যুর পর আপনি কোথাও না কোথাও যাবেন। মুখে বলে দেওয়া যায়, রামকৃষ্ণলোকে যাবেন। রামকৃষ্ণলোকে যাওয়া অত সহজ নয়। কাঙালী যদি সরাসরি কাশীর রেল ভাড়া চেয়ে বসে, কে তাকে দেবে? একটা দুটো পয়সা হত দিতে পারে, রামকৃষ্ণলোক যাওয়া ছেড়ে দিন। আমরা মানি মৃত্যু মানে সব শেষ নয়। এর উপরেই হিন্দু ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুর,

স্বামীজীও বারবার এর উপর কথা বলছেন। আর যে কোন ধর্ম এই জিনিসটাকে নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে যে, মৃত্যুর পরেও জীবন চলে। মৃত্যুর পর জীবন যদি না চলে, তাহলে ধর্মের কোন দামই নেই।

মৃত্যুর পর কিছু দিন প্রেতযোনিতে বাস করে আবার জন্ম নেয়। যার জন্য আমরা দেখতে পাই, কেউ মারা যাওয়ার পর মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য তার পরিবারের লোকেরা মৃত্যুর দশ দিন বা এগারো দিনে শ্রাদ্ধ করে আর এক বছর পর বাৎসরিক করে। ধরে নেয় এক বছর পর সে কোথাও জন্ম গ্রহণ করে নিয়েছে বা অন্য কোন লোকে, পিতৃলোকে, দেবলোকে, কোথাও একটা লোকে চলে গেছে। বলা মুশকিল কোথায় গেছে। এই লোকগুলোকে আমরা দেবলোক, পিতৃলোক, প্রেতলোক নামে অভিহিত করি। আসলে এই লোকগুলো হল সূক্ষ্ম জগৎ, মৃত্যুর পর মানুষ সেখানে যায়।

আবার আমাদের শাস্ত্রে বর্ণনা আছে, বিভিন্ন ধর্মেও বর্ণনা আছে, যাঁরা ভাল সংস্কার নিয়ে থাকেন, ভাল জীবন-যাপন করেন, যাঁরা ঈশ্বরে পুরো সমর্পিত; এনারা মৃত্যুর পর এমন স্বর্গে যান, যেখানে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়। বৈষ্ণবরা খুব সুন্দর বলেন –সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য। এগুলো দেবলোক নয়, এটা আলাদা একটা অবস্থা, যা কিনা সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম। হিন্দু শাস্ত্রে প্রথমটাকে বলা হয় সূক্ষ্ম জগৎ, তারপরের যে জগৎ তাকে কারণ জগৎ বলে। আর উপনিষদে যেটা বলছেন, গীতাতে যেটা বলছেন –আত্মজ্ঞান যাঁর হয়ে যায়, তখন তাঁর আর কোথাও যাওয়া-যায়ি থাকে না, তখন দেখেন তিনি অনন্ত, তিনি সেই শুদ্ধ চৈতন্য। এটাকে বলা হয় মহাকারণ।

এই চারটি –স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ। মহাকারণটাই আসল সত্য, যেখানে জেনে গেলেন আপনি অনন্ত, যেখানে মন বলে কিছু নেই। মৃত্যুর পর কে কোথায় যায়? স্থূল জগতে কেউ থাকে না, মৃত্যুর পর সবাইকে সূক্ষ্ম জগতেই যেতে হবে। আর এই সূক্ষ্ম জগৎ কত বড়? আমরা আমদের স্থূল জগৎকে তো দেখছি; এখান থেকে আমেরিকা পর্যন্ত, আমেরিকা থেকে রকেটে বসে চাঁদ অবধি চাঁদের উপরে যদি তাকানো হয়, দেখছি সেখান সূর্য আছে, অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র ছড়িয়ে আছে, তারপরেও আছে গ্যালাক্সি, যাতে সূর্যের মত কোটি কোটি নক্ষত্র। কত বড় এই স্থূল জগৎ এবার ভেবে দেখুন। সূক্ষ্ম জগৎ এই স্থূল জগৎ থেকেও বড়, যেখানে ভূত, প্রেত, শাঁকচুন্নি, প্রেতনী সবই আছে; আবার অন্য দিকে গন্ধর্বরা আছে, অপ্সরারা আছে, সেখানে আবার দেবতারাও আছেন, পিতৃরা আছেন। আমাদের স্থূল জগৎ একই রকম, পঞ্চভূতের খেলা; এটা পুরো একটা অন্য জগৎ।

কারণ জগৎ এই সূক্ষ্ম জগৎ থেকেও বিরাট, কারণ এই কারণ জগতের মধ্যে সূক্ষ্ম জগৎ আছে, স্থূল জগতও আছে। কারণ জগতে তাঁরাই যান, যাঁরা সর্বস্ব ছেড়ে শুধু ঈশ্বরকে ভক্তি করছেন। এটা একমাত্র খুব উচ্চ উচ্চমানের মহাত্মারাই পারেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত মানুষই পারেন, আর আমি আপনি কল্পনা করব যে স্বামী বিবেকানন্দের মত হয়ে যাব, এটা কখনই সম্ভব না। তবে ঈশ্বর কৃপা করলে তিনি যে কোন জিনিস করে দিতে পারেন। আবার মৃত্যুর সময় যাঁদের জ্ঞান হয়ে যায়, তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না। যে জিনিসগুলো মৃত্যুর পরে হয়, সেগুলো যোগ সাধনা করে, ভক্তি করে, ধ্যানের গভীরে গিয়ে এই জীবদ্দশাতেই সব কিছু অনুভব করা যায়। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের যত দর্শনের বর্ণনা আমরা পাই, এগুলো সবই সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎএর বর্ণনা।

মহাকারণের বর্ণনা কেউ করতে পারেন না, সম্ভবই না। এইজন্যই সম্ভব না, কারণ মহাকারণে মন থাকে না। ভক্তিমার্গের যত নামকরা ভক্ত কবি আছেন, এনারা সবাই সূক্ষ্ম জগতের, যেখানে তিনি ভগবানের সূক্ষ্ম রূপকে ভালবাসছেন। কারণ জগতের বর্ণনা একমাত্র ধর্মগ্রন্থেই হয়; যেমন ভাগবত, বাইবেল, এগুলো কারণ জগতের বর্ণনা। যদিও মহাকারণের বর্ণনা হয় না, কিন্তু আকার ইঙ্গিতে বোঝান হয়, যেমন উপনিষদ আদিতে বোঝান হয়েছে। এই যে বলা হল মৃত্যুর পর আপনি কোথাও যাবেন, কারণ মৃত্যুর পর আপনার সূক্ষ্ম শরীর হবে, মৃত্যুর পর আপনার কারণ শরীর বেরিয়ে আসবে, মৃত্যুর

পর সমস্ত মনের বিলয় হয়ে গেল বলে আপনি মহাকারণের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের সিঁড়ি।

শুরু হল ভাব থেকে, নিয়ে এলেন কারণ, মহাকারণে। তাহলে কি আপনি স্থূল শরীরে সেখানে যাবেন? না, স্থূল শরীর তো নাশ হয়ে গেল। কোন শরীরে যাবেন? সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর আর অ-শরীর, শুদ্ধ আত্মা হয়ে। এই যে বলা হল, যোগ সাধনা দিয়ে, ভক্তি সাধনা দিয়ে, ধ্যানের গভীরে এই সমস্ত জগতের দর্শন হয়। কিভাবে হয়? সূক্ষ্ম জগতে এই সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে, মৃত্যুর পরে না, এখানেই সমস্ত জগতের দর্শন সম্ভব। কারণ জগতে আপনার কারণ শরীর দিয়ে দর্শন হবে। এখন সমস্ত মিশে গিয়ে আমাদের শরীর দাঁড়িয়ে আছে স্থূল শরীরে। স্থূল শরীরে আপনার আমার আধ্যাত্মিক দর্শন হয় না।

যাদবপুর থেকে আমার কাছে একজন ভক্ত দেখা করতে এসেছিলেন। এসে বলছেন, এতদিন তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র পড়াশোনা করছেন, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের সাথে অনেক যোগাযোগ আছে। কিন্তু এখন আমাদের গীতা, কথামৃত সব আলোচনা শুনে, প্রতিদিন নিয়মিত প্রায় তিন-চার ঘণ্টা শোনার পর বলছেন, এখন এমন হয়েছে যে, তিনি স্বপ্নে নিয়মিত মহারাজদের দর্শন পেতে শুরু করেছেন। এটা আগে কদাচিৎ কখন সখন হত, কিন্তু এখন নিয়মিত প্রচুর মহারাজদের দর্শন পাচ্ছেন। যদিও এটা আহামরি কিছু না, কিন্তু এটা হল সঙ্কেত। কিসের সঙ্কেত? তুমি প্রস্তুত, আর এই সুযোগ হাতছাড়া করো না। স্বপ্ন জগৎ হল যখন সূক্ষ্ম শরীর স্বপ্ন জগতে বিচরণ করে। ওটাও মনেরই এলাকা। বলছেন, এবার তুমি সাবধান হয়ে যাও, আর চেষ্টা কর এই সূক্ষ্ম শরীরকে জাগ্রত অবস্থায়, ধ্যানের অবস্থায় যাতে সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করাতে পার।

সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। সাধনা করে মন যখন নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন মন স্থূল শরীর থেকে সরে আসে। আর যখন আরও বেশি সরে আসে, তখন এই ভাগবতীতনু হয়। কারণ জগতে যে ঈশ্বরের রূপ, একেবারে সাকার রূপ, এই দেহেই ওই রূপ দর্শন করে, অনেক আধ্যাত্মিক অনুভূতির অনুভব করতে পারেন, আর মন আছে বলে ঈশ্বরের সাথে কথাও বলতে পারেন। এটারই ঠাকুর এখানে বর্ণনা করছেন, ঋষিরা সেই অতীন্দ্রিয় চিন্ময় রূপ দর্শন করেছিলেন। আরও নিচে হলে দেবী-দেবতাদের দর্শন হয়। এটাই হল ভাগবতীতনু। এই ভাগবতীতনু দিয়ে আপনি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করতে পারেন, তাঁর সাথে আলাপ করতে পারেন, তাঁর আঙুল মটকে দিতে পারেন, ফচকিমি করতে পারেন।

একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তুমি এই স্থূল চক্ষু দিয়ে আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারবে না, তাই তোমাকে দিব্যচক্ষু দিলাম। গীতায় ভগবানের এই বিশ্বরূপটাও কিন্তু কারণ জগতের না, সূক্ষ্ম জগতের রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার ভাগ্নে হৃদয়রামকে ছুঁয়ে দিলেন, হৃদয়রাম দেখছে পুরো জগৎটা জ্যোতির্ময়। নরেনকে ছুঁয়ে দিতে নরেন চিৎকার করতে শুরু করে দিলেন –একি করলেন মহাশয়, আমার বাবা আছে, মা আছে। যাঁরা খুব উচ্চমানের সিদ্ধপুরুষ তাঁরা স্পর্শ দিয়ে এগুলো করে দিতে পারেন, কিন্তু করেন না, মাথাটা এলেমেলো হয়ে যাবার সম্ভবনা থাকে। বলছেন, ভাগবতীতনু দ্বারা সেই চিন্ময় রূপ দর্শন হয়।

আবার আছে, ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর। দর্শনের পর চলে গেলেন মহাকারণে, যেখানে মন, বাক্, কায় সব কিছুর পারে। **জ্ঞানসূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পর, নির্বিকল্পসমাধির পর, আবার সেই অনন্ত, বাক্যমনের অতীত, অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম**।

মহাকারণের কথা বলছেন, মন লয় না হলে ওখানে যেতে পারবে না। আমার 'ক্রতু' বইতে দেখিয়েছি, ক্রতু কিছুতেই সাকারের এই বাউণ্ডারিকে ভাঙতে পারছে না। কারণ তার মনে একটি ইচ্ছা থেকে গেছে, সে তার বন্ধুর উদ্ধার করবে। বন্ধু কোথায় আছে সে জানে না, সেইজন্য ক্রতু লয় হতে পারছে না। স্বামীজীকে যেমন ঠাকুর সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে নিয়ে এলেন, এই সপ্তর্ষি মণ্ডল কারণ জগতের,

সূক্ষ্ম জগতের না। ঠাকুর সেখানে পরিষ্কার বলছেন, ওখানে দেবতারাও পৌঁছাতে পারে না, তার মানেই কারণ জগৎ।

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। অনন্তকে কে মুখে বোঝাবে! পাখি যত উপরে উঠে, তার উপর আরও আছে, আপনি কি বল?

আচার্য –আজ্ঞা হাঁ, বেদান্তে ওইরূপ কথাই আছে।

শুরু হল 'ভাবটুকু নাও', 'ওদের টানটুকু নাও' দিয়ে। সেখান থেকে চলতে চলতে কিভাবে নিয়ে গেলেন সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ আর মহাকারণে।

আমরা এখনও কথামৃতের ২২শে এপ্রিল ১৮৮৩ তারিখে আছি। সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে আছেন। একটু আগে আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাগবতীতনু নিয়ে আলোচনা করলাম, ঠাকুর বলছেন ভক্তের প্রেমের শরীর।

আমাদের কাছে অনেক ধরণের ভক্তরা আসেন, তাঁরা তাঁদের ঈশ্বরীয় অনুভূতির কথা বলেন। অনেকে হয়ত দৈবী স্বপ্ন দেখেছেন, কেউ হয়ত স্বপ্নে সাধু, সন্ত, মহাত্মাদের দর্শন করছেন। আবার অনেক সময় কেউ ঠাকুরের ছবিতে কিছু বিশেষ দেখতে পান। এ-ধরণের দর্শন অনেকের হয়, মনে হয় যেন ছবিটা জীবন্ত বা যেন আলোময় দেখাচ্ছে। এগুলো ভাল লক্ষণ, দেখাচ্ছে যে আপনার মন ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু এগুলোকে কখনই ঈশ্বরদর্শন নয়, এই সব কিছু হল এক ধরণের আধ্যাত্মিক ভাব। অনুভূতিও বলা যাবে না, কারণ ঠিক ঠিক অনুভূতি তখনই হয় যখন প্রেমের শরীর জন্মায়।

আবার ঠাকুর হঠাৎ সিদ্ধের কথা বলছেন। অনেক অনেক জন্ম ধরে আগে আগে হয়ত সাধনা করা আছে, কিন্তু এই জন্মে হয়ত কিছু করেনি। কিন্তু হঠাৎ এমন এমন দর্শনাদি হতে শুরু হল যে, সেখান থেকে তার মনটা ঈশ্বরের দিকে চলে গেল। এই ধরণের হয়, তবে খুব কম লোকের হয়, আর এটাকেও সিদ্ধি বলা যাবে না। সিদ্ধি পাওয়ার জন্য প্রচুর খাটতে হয় আর প্রেমের শরীর, ভাগবতীতনু তৈরী হতে হবে।

আমরা বিস্তারে ভাগবতীতনুর আলোচনা করেছিলাম। রাজযোগে এই শব্দগুলিকে আরও পরিষ্কার করে বলা আছে। মন যেমন যেমন একাগ্র হয়, আমাদের পঞ্চভূতের শরীরটাও তেমন তেমন পাল্টাতে শুরু হয়। আর শরীরের যে তিনটে চাহিদা –আহার, নিদ্রা ও মৈথুন এই তিনটের চারিত্রিক সমস্ত কিছু পাল্টে যায়। এই তিনটে পাল্টে যাওয়াটা একটা লক্ষণ। আহার, নিদ্রা ও মৈথুন, এই তিনটি যে ইচ্ছা, তিনটিই পুরো যে চলে যাবে তা না, কিন্তু অন্য রকম হয়ে যায়। শরীরটা বাইরের আকৃতি মাত্র, কিন্তু ভিতরটা পুরো পাল্টে যায়। ধ্যান-ধারণা করে ভিতরটা পাল্টে গেল, চলে এলেন সবিকল্প সমাধিতে, যেখানে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, বিভিন্ন দেবদেবীর দর্শন হয়। আর আপনার যিনি ইষ্ট তাঁর একাধিকবার দর্শন হয়।

এরপর যেটা হয়, আপনার চরিত্রটা পুরো পাল্টে গেল, জগতের কোন কিছুই আপনার আর ভাল লাগবে না। নাম-যশের ইচ্ছা, পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা, সব ইচ্ছা চলে যায়। কিন্তু এরপরেও, এই জায়গাতে থেমে না গিয়ে আরও যখন এগোতে শুরু করেন, তখন অন্য একটা দিক আপনার সামনে উন্মোচন হতে থাকে। যেটাকে ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধি বলছেন, যোগ যাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলছেন। তবে এই দুটোর মধ্যে, অর্থাৎ ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি এবং যোগের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে একটা তফাৎ আছে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই তফাৎ নিয়ে আলোচনা করেছি। সব জিনিস প্রত্যেকবার আলোচনা করা যায় না। আর এত কিছু জানারও আপনাদের অত দরকার নেই। এগুলোকে বলে technical questions of religion।

অনেক আগের কথা, নাগপুরে আমাদের খুব নামকরা একজন মহারাজ ছিলেন, ওনার সংস্পর্শে এসে অনেক যুবক সন্ন্যাসী হয়েছেন, পরিবর্তি কালে তাঁরাও সবাই খুব নামকরা সন্ন্যাসী হয়েছেন। ওনাদের মধ্যে একজন আমাকে বলেছিলেন, উনি যখন ইয়ং ছিলেন, মহারাজকে একটা প্রশ্ন করলেন। মহারাজ ওনাকে বললেন, 'এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে তোমার কি হবে'? আপনি যদি জেনেই গেলেন নির্বিকল্প সমাধি আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কি তফাৎ, তাতে আপনার কি হল? প্রশ্ন ওটাই করতে হয়, যেটা আপনার কাজে লাগবে। এমন কোন প্রশ্ন, যার উত্তর না পাওয়াতে আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আপনার সাধন-ভজন আটকে যাচ্ছে, এই ধরণের প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতে হয়। তারপর ওই মহারাজ সেই ইয়ং মহারাজকে বলেছিলেন, Never ask technical questions of religion, এতে বৃথা সময় নষ্ট। এই যে নির্বিকল্প সমাধি, এই যে মনটা ডুবে যাচ্ছে, ঠাকুর বলছেন বলে আমরা ব্যাখ্যা করছি।

ধর্মের যে শেষ অবস্থা, আধ্যাত্মিক জীবনের যে পর্যাবসান, যেখানে গিয়ে সমস্ত কিছু লয় হয়ে যায়, সব কিছু সমাপ্তিতে চলে যায়। তখন কি হয়? তারই বর্ণনা এবার ঠাকুর করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –লবণপুত্তলিকা সাগর মাপতে গিছিল। ফিরে এসে আর কোন খবর দিলে না। এক মতে আছে শুকদেবাদি দর্শন-স্পর্শন করেছিল, ডুব দেয় নাই।

এই উদাহরণ ঠাকুর আগেও অনেকবার নিয়েছেন, আমরাও অনেকবার বলেছি। এগুলো হল সব টেকনিক্যাল, এসব কথার শেষ নেই, তর্কেরও কোন শেষ নেই। কার কি হয়েছিল, কার কি হয়নি, এসব জেনে কি লাভ! লঙ্কায় রাবণ মলো বেহুলা কেঁদে আকুল হল। অত জানার কি দরকার। এতটুকু জেনে নেওয়া গেল যে, শেষ যে অবস্থায় হয় –*তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্*, সেখানে নিজের স্বরূপে অবস্থান করে। আমিত্ব বলতে যেটা বোঝায়, ঠাকুর যেটাকে কাঁচা আমি বলছেন, এই কাঁচা আমির লয় হয়ে যায়। লয় হয়ে গিয়ে কি হয়? কি হয় মুখে বলা যাবে না। কেন মুখে বলা যবে না?

যোগে খুব সুন্দর বলছেন, অন্য সময় *বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র*, অন্য সময় তুমি বৃত্তির সঙ্গে এক হয়ে আছ। বুদ্ধিবৃত্তিতে আমিত্ব থাকে, সংসার থাকে, তাই সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু যেখানে আমিটাই নেই, আপনি কিভাবে কিসের বর্ণনা করবেন! এখন শুকদেবের হয়েছিল কিনা, নারদের হয়েছিল কিনা, কে ষোল আনা, কে পনের আনা; এগুলো হল একেবারে অদরকারী বিষয়, এগুলোকে আলোচনা করা সময়ের অপব্যবহার।

ভারতের ধর্মের ইতিহাস নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলে দেখবেন, কি ধরণের অবাস্তব জিনিস নিয়ে আমরা পড়ে থাকতাম; কালী বড় না কৃষ্ণ বড়; কত ফালতু বিষয় নিয়ে মানুষ পড়ে থাকত। কার্ল মার্ক্স যখন বললেন ধর্ম হল সমাজের আফিং, তিনি এই অর্থেই বলেছিলেন, যদিও ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে ওনার কোন ধারণা ছিল না। এখনও দেখবেন, যখনই ধর্ম নিয়ে কোন নিন্দা হয়, যাঁরা নিন্দা করেন, যাঁরা ধর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেন, তাঁরা নিজেরাও ঠিক জানেন না যে ধর্ম জিনিসটা কি। যাই হোক সেটা আমাদের কোন ব্যাপার না। ওনারা ধর্ম বলতে তখনকার দিনে চার্চের ধর্মটাকেই ধর্ম বলে মনে মনে করতেন। কিন্তু অদরকারী বিষয় নিয়ে পড়ে থাকাটা থেকেই গেছে। যদিও ইদানিং কালে অনেকটা কমেছে, কারণ এখন লোকেদের চাহিদা অনেক বেড়েছে। এখন শুধু ধর্মচর্চা করে আর নুনভাত খেয়ে জীবন চলে না। চলে না বলে আপনাকে খাটতে হবে। আগেকার দিনে চারটে বাড়ি ঘুরে ব্রাহ্মণরা যে ভিক্ষা পেতেন তাই দিয়ে তাঁদের জীবন চলে যেত, এখন আর চলবে না। এই ফালতু জিনিসগুলো কমেছে ঠিকই, কিন্তু অন্য দিকে আবার আছেও। ইউটিউবে ঢুকলেই দেখবেন গুচ্ছে গুচ্ছে চ্যানেলে, আর সবাই একটা না একটা বিষয় নিয়ে লেকচার দিয়ে যাচ্ছে। এমন এমন সবাই এসে লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন, ও-সব কথা না বলাই ভাল। সময় পেয়ে সবাই এখন এনারা যেটা করছেন, এটা মিনিংলেস।

এসবের দিকে না গিয়ে গভীর ভাবে সাধন-ভজন করতে থাকুন। সাধন-ভজন করতে গিয়ে যেখানে যেখানে আটকাবে, আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোই সেগুলোকে পরিষ্কার করে দেবে। ঠাকুর যেমন বলছেন, এক মতে আছে; মতের আর শেষ নেই। কিন্তু এই মতগুলো যে রয়েছে, এটা বোঝানর জন্য। কারণ যদি নির্বিকল্প সমাধিতে যায়, তাহলে তো মন, বুদ্ধি, বাক্ সব লয় হয়ে যাবে। তাহলে এনারা কি করে আছেন? আমরা জানি না। 'কি করে আছেন'? এগুলোকেই বলে টেকনিক্যাল প্রশ্ন, এগুলোকে জেনে লাভ নেই। ঋষিরা যেটা বলে দিয়েছেন, ঠাকুর বলে দিয়েছেন, ওটাকে মেনে নিন, মেনে নিয়ে এবার এগোতে থাকুন।

আমি বিদ্যাসাগরকে বলেছিলাম, সব জিনিস এঁটো হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই।

এর আলোচনা আগে আগে আমরা বিস্তারে করেছি। কোন জিনিসকে আমরা বলার আগে ওই জিনিসটার ব্যাপারে ধারণা করা হয়। আমি এই কলম দেখছি। আগে কলমের উপর আলো পড়ছে, সেই আলোটা আমার চোখের মাধ্যমে ভিতরে যাচ্ছে, ভিতরে গিয়ে আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে চঞ্চল করে দিচ্ছে। সেখানে মন কি করে? মনের কাছে আগে আগে যে কলমের জ্ঞান হয়ে আছে, সেই জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করে কলমের জ্ঞান প্রাপ্ত করছে –এটি কলম; আর সেখান থেকে আমরা বলছি কলম। কলমের মত যদি কোন জিনিস হয়, তখন আমরা বলব, কলমের মত।

অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, কেউ মুখে বলতে পারে নাই। মুখে বললেই জিনিসটা এঁটো হয়। বিদ্যাসাগর পণ্ডিত, শুনে ভারি খুশি। ব্রহ্মকে বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা যায় না কেন? কারণ ব্রহ্ম বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে নয়। কেন নয়? জিনিসটা এত বিশাল যে, ক্ষুদ্র মন দিয়ে জানা যায় না। কেনোপনিষদে এই জিনিসটার উপর খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে – দেবতারা অসুরদের উপর যুদ্ধ জয় করেছেন। যুদ্ধ জয় করে দেবতাদের অহংকার হয়েছে, আমরাই এই যুদ্ধ জয় করলাম। দেবতারা তখন দেখছেন তাঁদের সামনে এক বিচিত্র বস্তু যক্ষ। দেবতাদের কেউ বুঝতে পারছেন না, জিনিসটা কি। কাহিনীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়। যাই হোক বিদ্যাসাগর ঠাকুরের এই কথা শুনে ভারী খুশি। এগুলোকে ধারণা করতে হয়, ধারণা করতে হয় এখানে ঠাকুর কি বলতে চাইছেন। এটাই বলতে চাইছেন –ব্রহ্মকে কখন মনের বৃত্তি বানানো যায় না, ফলে ব্রহ্ম কি বস্তু কোন দিন জানা যায় না। ঈশ্বরকে জানা যায় না, অনুভূতি করা যায়, আমরা বলি দিব্য অনুভূতি।

ঠাকুর বেশি ঘোরাঘুর করেননি। পশ্চিমে কাশী পর্যন্ত গিয়েছিলেন আর বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। হিমালয় যাননি, কিন্তু অনেক সাধু-মহাত্মারা দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, তাঁদের মুখে কিছু কিছু বর্ণনাদি শুনেছিলেন।

কেদারের দিকে শুনেছি বরফে ঢাকা পাহাড় আছে।

কথামৃতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু বলি যে, কেমন মাধুর্য দেখুন, আপনাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই হিমালয় গেছেন, আপনাদের অনেকেই হয়ত কেদার-বদ্রীনারায়ণও গেছেন, সেখানে আপনারা নিশ্চয় বরফে ঢাকা পাহাড় দেখেছেন। ঠাকুর কিন্তু কোন দিন বরফের ঢাকা পাহাড় দেখেননি। ঠাকুর ভগবান, বরফে ঢাকা পাহাড় তিনিই সৃষ্টি করেছেন। নরেন্দ্রনাথকে বলছেন নরঋষি; নর ও নারায়ণ দুই ঋষির নরঋষি। নরঋষি বদ্রিকাশ্রমে তপস্যা করে যাচ্ছেন। বরফে ঢাকা পাহাড়, সেখানেই তপস্যা করেন। কিন্তু ঠাকুর যে শরীর ধারণ করে আছেন, এই শরীরে তাঁর বরফে ঢাকা পাহাড় দর্শন হয়নি। ঠাকুর কেদারের কথা কয়েকবার বলেছেন।

মাঝে মাঝে ভাবি, ঠাকুর কি কখন ভেবেছিলেন, একবার কেদার গেলে হয়? বোধ হয় ভাবেননি, কারণ ওনার মনে কোন ধরণের কৌতুহল ছিল না। কিন্তু কি সুন্দর বলছেন – কেদারের

ওদিকে শুনেছি বরফে ঢাকা পাহাড় আছে। এই জগতের অনেক কিছু আমি আপনি জানতে পারি যেটা ঠাকুর জানতেন না। ঠাকুর যেমন শুনেছেন তেমন বলছেন। আধ্যাত্মিক জগতের প্রত্যেকটা ইঙ্গি তাঁরা জানা। একদিকে সমুদ্রের উপমা দিচ্ছেন –লবণপুত্তলিকা সাগর মাপতে গিছিল।

এরপর বলছেন, **বেশি উচ্চে উঠলে আর ফিরতে হয় না। যারা বেশি উচ্চেতে কি আছে, গেলে কিরূপ অবস্থা হয় –এ-সব জানতে গিয়েছে, তারা ফিরে এসে, আর খবর দেয় নাই**। ঠাকুর বলতে চাইছেন, কেদারের উপরে যারা যায়, তারা সেখানে বরফ হয়ে যায়।

এই যে ঠাকুর বলছেন, বেশি উচ্চে উঠলে আর ফিরতে হয় না, বাচ্চা বয়সে যারা গাছে ওঠার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা জানবেন, গাছে ওঠাটা সহজ, কিন্তু নামাটা কঠিন। জীবনে ওঠাটা খুব বেশি কঠিন না, নেমে আসা অত্যন্ত কঠিন। বার্ণার্ড'শ খুব দুঃখ করে এই কথা বলেছিলেন। তিনি খুব বড় বাড়ির ছেলে ছিলেন, কিন্তু বাড়ি থেকে সম্পত্তির ভাগ কিছুই পাননি। তিনি বলেছিলেন, কত লোকই বলে, এ্যব্রাহাম লিঙ্কন লগ হাউসে বড় হয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হলেন। কিন্তু কেউ এমন লোকের কাহিনী বলে না, একদিন সে রাষ্ট্রপতি ছিল, সেখান থেকে পতন হয়ে আজ সে একটা কুঁড়ে ঘরে বাস করে। কুঁড়ে ঘর থেকে রাষ্ট্রপতি হওয়া খুব কঠিন না, কিন্তু একদিন যে রাজা ছিল এখন নেমে এসে কুঁড়ে ঘরে থাকছে, আত্মহত্যা করছে না, অবাক জিনিস। বেশির ভাগ লোক এটা নিতে পারে না, কারণ একটাই, কেউ নামতে চায় না। রাজনীতিতে যে এত খুনোখুনি, মারামারি কারণ, যে উপরে উঠে গেছে সে আর নামতে চায় না। এটা হল জাগতিক দিক থেকে।

কিন্তু যদি আমরা চিন্তনের দিক থেকে দেখি, সেখানে যাঁরা উপরে উঠে যান, তাঁরা আর নিচে নেমে আসতে চান না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন কবি, কবিতা তো চিন্তনরই একটা অঙ্গ; চিন্তন জগতের এমন উপরে উনি চলে গেছেন যে, ওনার আশেপাশে যাঁরা আছেন, ওনারা এমনি আছেন আর কি। হয়ত কোথাও যাচ্ছেন, কারুর সঙ্গে দেখা হল, দুটো কথা বলবেন, আজকের ভাষায় বাচ্চাকে দুটো চকলেট দিয়ে দেবেন, কিন্তু এর বেশি আর না। কারুর সঙ্গে বেশিক্ষণ সঙ্গ দিতে পারবেন না; চিন্তন জগতের মানুষরা নিঃসঙ্গ থাকতেই ভালবাসেন। বৈজ্ঞানিকরাও সবাই এই রকমই। কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যাঁরা খুব উঁচুতে উঠে যান, খুব নামকরা কথা আছে –He is lonely at the top। যাঁরাই উপরে উঠে যান, সবাই একা হয়ে যান, কারণ ওখানে ওই স্তরে গিয়ে তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য কেউ আসতে পারবে না। তিনিও ওখান থেকে নামতে পারবেন না। তিনি কি চাইবেন নেমে আসতে?

যোগের জগতেও একই জিনিস হয়। যেমন যেমন চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়, চিত্তবৃত্তি উপশম হয়ে যত যোগী এগিয়ে যাচ্ছেন, যোগীর শরীর-মন তত সূক্ষ্ম হতে থাকে। ওই অবস্থায় গিয়ে স্থূল জিনিসের দিকে তিনি আর তাকাতে যান না, মন থেকেও তাকাতে চান না। আর শেষ অবস্থায় চলে যাওয়ার পর, তাকানোর আর কোন প্রশ্নই নেই। আমরা কখন যোগীর এই অবস্থা বুঝতে পারব না। আমরা খুব হলে বলব, উনি কেমন পাল্টে গেছেন। যাদের টাকা-পয়সা হয়, আমরা বলি, আগে বন্ধু ছিল, এখন পাল্টে গেছে। না, কিছু পাল্টায়নি। টাকা-পয়সা তো এমনি এমনি ওনার কাছে চলে আসেনি। ওই অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে তিনি একটা অবস্থা থেকে তুলে এনেছেন। তুলতে তুলতে এমন জায়গায় চলে গেছেন, যেখান থেকে আর নামতে পারছেন না।

এই বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি কোন যোগ নেই, তাও একটা মজার ঘটনা বলি। পূজ্যপাদ স্বামী গম্ভীরানন্দজীকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম। মহারাজ খুব কম কথা বলতেন। এক সময় জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন, সেখান থেকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট পরে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কথা সব সময় খুব কম বলতেন। লেখালেখির জগতে এমন ঢুকে গেছেন, তাঁর ধারে কাছে যেন কিছু নেই। খুব বড় এক মহারাজের কাছে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ শুনেছি। ওই মহারাজ একদিন এসে গম্ভীরানন্দজী মহারাজকে প্রণাম করেছেন। মহারাজ তখন বইয়ের কাজ করছিলেন, চোখে ভাল দেখতে পারতেন না।

মহারাজের তখন সেক্রেটারি ছিলেন রাধাকৃষ্ণ মহারাজ (স্বামী আত্মারামানন্দজী)। রাধাকৃষ্ণ মহারাজ লিখে যাচ্ছেন। ওই মহারাজ এসে বললেন, মহারাজ আমি অমুক মহারাজ। গম্ভীর মহারাজ গম্ভীর স্বরে বললেন 'ও'। 'অনেকদিন আসিনি'। 'ও'। এই রকম আরেকটি কথা কি বললেন। উনিও একই ভাবে উত্তর দিয়ে সেক্রেটারিকে বলছেন, 'রাধাকৃষ্ণ next line'। ওখানেই সব আলাপচারিতা শেষ।

অথচ মহারাজ যখন ব্রহ্মচারী, সাদা কাপড়ে আছেন, সেই সময় ওনাকে দেওঘরে পাঠানো হয়েছিল আর সেই অবস্থায় উনি দেওঘরের সেক্রেটারি ছিলেন। এটা একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা, ব্রহ্মচারী অবস্থায় দেওঘরের সেক্রেটারি পদ সামলাতেন। মহারাজ যখন মঠের অধ্যক্ষ, একজন মহারাজ এসে বলছেন, 'মহারাজ, আমি দেওঘর থেকে আসছি'। হঠাৎ গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মনটা কোথায় চলে গেল, আর একটু একটু করে বলতে শুরু করলেন –'এই দেখ, আমি যখন ওখনে ছিলাম, কি দিন গেছে'। এই বলে উনি বর্ণনা করতে শুরু করলেন, কিভাবে তিনি ছেলেদের ক্লাশ নিতেন, ছেলেদের জন্য কুয়ো থেকে জল তুলতেন, বিকালবেলা ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন; বলেই যাচ্ছেন।

তার মানে, চিরদিনই তিনি কথাটা কম বলতেন, কিন্তু সব কিছুতে যুক্ত থাকতেন। একবার যখন ওই জগতে এমন ঢুকে গেলেন যে, একজন খুব বড় মহারাজ এসে তিনটি কথা বললেন, মহারাজ আমি অমুক, অমুক জায়গা থেকে এসেছে, অনেক দিন আসিনি। তিনটে কথারই উত্তর এল – 'ও', 'ও', 'ও', ইন্টারভিউ শেষ। গম্ভীরানন্দজী মহারাজ কি পাল্টে গিয়েছিলেন? একদমই না। তিনি যখন উঠছেন, উঠছেন, উঠছেন, ওনার আশেপাশের লোকেরা অত খেয়াল করেননি, কোথায় উঠে গেছেন। হঠাৎ যখন সবাই দেখছেন, উনি চটিতে পৌঁছে গেছেন। এই জিনিস সবারই জীবনে হয়।

আপনার যদি মনে হয়, গত দশ বছরে আপনার যাঁরা বন্ধু, এখনও তাঁরা সেভাবেই বন্ধু; তাহলে বুঝতে হবে আপনার এখনও ওঠা শুরু হয়নি। আপনার সঙ্গীদের থেকে আপনার মনের দূরত্ব যদি না তৈরী হয়, বুঝতে হবে আপনার উন্নতি হচ্ছে না। উন্নতি শুরু হওয়ার পর আপনার একটা যদি মনে হয়, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব এদের দরকার থাকলে আসবে আমার কাছে, কিছু করে দিতে বললে করে দেব। আর শেষ অবস্থায় যখন কেউ চলে গেলেন, তখন তাঁরা ফিরে এসে আর খবর দেন না, কারণ মন সেখানে লয় হয়ে যায়। সগুণ সাকার আর নির্গুণ নিরাকার আলাদা কিছু না। কিন্তু যোগশাস্ত্রে অসম্প্রজ্ঞাত যা, সম্প্রজ্ঞাতও তাই –এটা সেখানে হয় না। এটা একটা বিরাট বড় তফাৎ। শেষ অবস্থায় কি হয়, খুব সুন্দর বলছেন।

তাঁকে দর্শন হলে মানুষ আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়, চুপ হয়ে যায়। খবর কে দেবে? বুঝাবে কে?

কারণ বৃত্তি দিয়ে তো এটা বোঝার নয়, বোধে বোধ হয়েছে কিনা। বৃত্তি মানে, মনের যে চিন্তা-ভাবনা সেটা দিয়ে তো এ-জিনিস বোঝার নয়, তাই কে বোঝাবে। ঠাকুর এখানে এটা কিন্তু শেষের কথা বলছেন। কম বয়সে সিনিয়র মহারাজদের অনেক সময় আমরা প্রশ্ন করলে ওনারাও পরিষ্কার একই কথা বলতেন –তোমরা বুঝবে না। মানে, আমরা শেষ কথা নিয়ে বলছি না। এই যে বিবর্তন যেটা হচ্ছে, ধীরে ধীরে উঠছেন, এটা বোঝা যায় না।

শেষ অবস্থায় কি হয়? বলছেন আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়, চুপ হয়ে যায়। আমরা যাকে ভালবাসি অনেক সময় তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করি। অনেকদিন পর ছেলে মার কাছে আসছে, সরাসরি না এসে একটু খেলা করছে, কিন্তু সেখানে একটা উত্তেজনা এসে যায়। কিন্তু এখানে যেটা হয়, চুপ হয়ে যায়, কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। অনেকদিন ধরে যাঁরা হিমালয়ের কথা শুনে এসেছেন, তারপর প্রথম যখন হিমালয়ে গেলেন, দেখে অবাক হয়ে যান। প্রথমবার সমুদ্র দেখে অবাক হয়ে যায় মানুষ।

সাত দেউড়ির পর রাজা। প্রত্যেকে দেউড়িতে এক-একজন মহা-ঐশ্বর্যবান পুরুষ বসে আছেন।

ভাগবতীতনুর কথা বলা হয়েছিল, সাধক যখন এগোতে শুরু করেন তখন বিভিন্ন রকম দেবীদেবতার দর্শন হয়, দিব্য অনেক কিছু প্রত্যক্ষ হয়; মনে হয় এটাই বুঝি ঈশ্বরদর্শন। আপনাকে যদি প্রশ্ন করতে হয়, তার মানেই আমরা ঈশ্বরদর্শন হয়নি। আপনার অনেক রকম দর্শন হচ্ছে, অনুভূতি হচ্ছে, আপনি আপনার পরিচিত মহারাজকে প্রশ্ন করলেন, মহারাজ, আমার যে এসব হয়েছে আপনার কি মনে হয়? এখানে আপনাকে প্রশ্ন করতে হচ্ছে, প্রশ্ন করতে হচ্ছে মানেই ঈশ্বরদর্শন হয়নি। শিষ্যও এখানে প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, এই কি রাজা?

প্রত্যেক দেউড়িতেই শিষ্য জিজ্ঞাসা করছে, এই কি রাজা? গুরুও বলছেন, না; নেতি নেতি। সপ্তম দেউড়িতে গিয়ে যা দেখলে, একেবারে অবাক। আনন্দে বিহ্বল। আর জিজ্ঞাসা করতে হল না 'এই কি রাজা'? দেখেই সব সংশয় চলে গেল।

ঠাকুর এটা উদাহরণের জন্য বললেন। অনেক সময় এ-রকম নাও হতে পারে, কারণ অভ্যেস হয়ে যায়। এই যে বলছেন, 'এই কি রাজা'? দেখে সব সংশয় চলে গেল। ঠাকুর এই উদাহরণ দিচ্ছেন আমাদের বোঝানর জন্য, আক্ষরিক ভাবে এটা নিতে নেই। কারণ আধ্যাত্মিক যে অনুভূতিগুলি হয় তার সঙ্গে এটাকে মেলানো যায় না। আমাদের উপনিষদে বিভিন্ন জায়গায় বলে দিচ্ছেন –*ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়ঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে*। সেই পরমব্রহ্মের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন মনের যত প্রশ্ন, যত সংশয় সব চলে যায়।

আমি আমার আচার্য মহারাজ স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজকে অনেক সময় কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর উনি বলে দেবেন। আবার কখন বলতেন ধ্যান কর, উত্তর পেয়ে যাবে। কারণ সমস্ত উত্তর ভিতর থেকে আসে, কোন উত্তরই বাইরে থেকে আসে না। যাঁরা প্রশ্ন করেন, তাঁরা জানবেন, আমি যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন আপনাকে বলতে থাকি, জিনিসটা কি; আপনি বুঝতে পারবেন না। কারণ কোন জ্ঞানই বাইরে থেকে আসে না, ভিতর থেকেই সমস্ত জ্ঞান আসে। আপনার মনে প্রশ্ন জাগা মানেই আপনি প্রস্তুত নন। আর আত্মজ্ঞান যখন হয়ে যায়, তখন সমস্ত কিছু পরিষ্কার একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়। যেগুলো সত্যিকারের বিরাট ঐশ্বর্যের, সেটা বোঝা যায়। বাচ্চা ছেলে হিমালয় যাচ্ছে, একটু একটু বরফ দেখছে আর বারবার মাকে প্রশ্ন করছে, মা এটাই কি বরফ ঢাকা পাহাড়। তারপর যখন কেদার গঙ্গোত্রী যাবে সেখানে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখবে আর নিজে থেকেই বলবে –এটাকেই বলে বরফে ঢাকা পাহাড়।

আচার্য –আজ্ঞে হাঁ, বেদান্তে এইরূপই সব আছে। ঠাকুর আবার বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম, আদ্যাশক্তি বলি। ঠাকুর এই জিনিসটা বারবার বলছেন। গীতার ভাষ্যে আচার্যও বারবার বলছেন, যেমন, যিনি বাসুদেব তিনিই পরমব্রহ্ম। আচার্য এই কথা বারবার বলছেন, কিন্তু তাও লোকগুলো কেন খিচখিচ করে বুঝতে পারি না। যিনি ভগবান তিনিই পরমব্রহ্ম, আলাদা কিছু নেই। কিন্তু এখানে এসেই যোগ বা অন্যান্য মতাদর্শে আলাদা হয়ে যায়। এমনকি দ্বৈতবাদী যে দর্শন সেখানেও তফাৎ হয়ে যায়। রামানুজ ও মাধ্বাচার্যদের যে মত, এই মতের সঙ্গে মিলবে না। আমরা আর ওনাদের মত কি নেব, যেখানে ঠাকুর সাক্ষাৎ এই কথা বলছেন। সেই পরমব্রহ্ম কেন এগুলো করেন কেউ জানে না, কিন্তু এটা জানা, যখন তিনি করেন তখন তাঁর শক্তি যেন তিনি কাজে লাগান। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, শক্তি আর শক্তিমান এক। পরমব্রহ্ম যখন তাঁর এই শক্তিকে কাজে লাগান, তখন তাঁকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম।

যখন তিনি তিন গুণের অতীত তখন তাঁকে নির্গুণ ব্রহ্ম, বাক্য-মনের অতীত বলা যায়; পরব্রহ্ম। এই জগৎ, সৃষ্টি, স্থিতি এগুলো কোথা থেকে আসে?

ঠাকুর বলছেন –**মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্ব-স্বরূপকে ভুলে যায়**। আমি আপনি আমরা সবাই আমাদের যে স্বরূপ, সেই স্বরূপকে ভুলে আছি। আমি কে, আমি ভুলে গেছি যোগে বলছেন, *তদাদ্রষ্টু স্বরূপে অবস্থানম্*। ধর্ম জীবন কি? ধর্ম জীবন সাধারণ একটি জিনিস –নিজেকে জানা। এর বাইরে ধর্ম জীবনে আর কিছু নেই। অন্যান্য ধর্মে যেমন বলেন, ধর্ম মানে ঈশ্বরকে খুশি করা, স্বর্গে যাওয়া; কিন্তু হিন্দুদের ধর্ম জীবন মানে একটাই –নিজেকে জানা; আমি কে এটাকে জানা; নিজের স্বরূপকে জানা।

কি সেই স্বরূপ? ঠাকুর বলছেন –**সে যে বাপের অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী তা ভুলে যায়**। আমি জানি না, আপনার কজন ঠাকুরের এই কথাকে লক্ষ্য করেছেন –সে যে বাপের অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী। ধর্ম কি? ধর্ম জীবন কি? আপনার বাবা, যিনি পরমপিতা, তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য; আপনিই সেই পুরো ঐশ্বর্যের অধিকারী, আমি অধিকারী, সে অধিকারী।

ঠাকুরের মহাসমাধির পর সবাই বরাহনগর মঠে থাকতেন। লাটু মহারাজ সব সময় জপধ্যান করতেন। রাত্রে মহারাজের খুব খিদে পেয়েছে। একটা বাটিতে ছোলা সেদ্ধ করে খেয়েছেন। বাটিটা পরিষ্কার না করে যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিয়েছেন। পাত্রগুলো শশী মহারাজ ঠাকুরের পূজোর জন্য ব্যবহার করতেন। ঘুম থেকে উঠে শশী মহারাজ দেখছেন ঠাকুরের বাসন কেউ নোংরা করে রেখে দিয়েছে। রেগেমেগে খুব গালাগাল দিচ্ছেন, অপান্তর ইত্যাদি। লাটু মহারাজ হেসে বলছেন, 'শশী ভাই! তোমার বাবাও যিনি আমার বাবাও তিনি, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ'। এক কথাতেই শশী মহারাজ শান্ত হয়ে গেলেন। আমার বাবা আপনার বাবা এক, সেই পরমপিতার অনন্ত ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যের অধিকারী আমি। এটাই ধর্ম জীবন, আর কিছু না, এই সম্পত্তিকে প্রাপ্ত করা।

সিনেমা বা কাহিনীতে আমরা দেখে থাকি, ছেলে অনেকদিন থেকে বাইরে বাইরে থাকে। বাবা-মা সবাই মারা গেছেন। খবর পাঠানো হল, একবার এসে তোমার সম্পত্তি বুঝে নাও। একদিন ছেলেটি এলো, সম্পত্তি বুঝে নিল, নিয়ে সব বিক্রি করে টাকা-পয়সা নিয়ে আবার বাইরে চলে গেল। কিন্তু পরমপিতার অনন্ত ঐশ্বর্য, বিক্রি করে কোথায় যাবেন? কারণ যেখানেই যাবেন সেখানেই সেই ঐশ্বর্য। আপনি সেই অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী। আমাদের বিচিত্র ধারণা হয়ে আছে, ধর্ম জীবন মানে জপধ্যান করা। জপধ্যান করলে কি হবে? জপধ্যান করে আপনি এটাই জানবেন আপনি কে, আপনার স্বরূপ কি। শেষমেশ আপনি এটাই জানবেন, আপনি অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী। কিন্তু আমরা অলস, খাটতে চাই না।

আগেকার দিনে গ্রাম দেশে, শহরেও এখন অনেক জায়গায় চায়ের দোকান দেখা যায়। সেই চায়ের দোকানে বসে সবাই আড্ডা মারছে, যেন সব জ্ঞান তাদের হাতের মুঠোয়। ভারতের বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যত; ধর্মের বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যত, বিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞান যেন নিয়ে বসে আছে। আমাদের সাথে ওদের খুব বেশি তফাৎ নেই। আমরা মনে করি আমরা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জিনিসটা তা নয়, প্রায় একই রকম। যেদিন থেকে জপধ্যান করতে শুরু করলেন, ধর্ম জীবনে প্রবেশ করে যেদিন থেকে এগোতে শুরু করলেন; এরপর ধীরে ধীরে নিজের স্বরূপ জানতে শুরু হবে। নিজের স্বরূপ যখন আমরা জানতে শুরু করি, তখনই ঠিক ঠিক ধর্ম জীবন শুরু হয়। আর শেষ জ্ঞান যেটা হয় –অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী। বাবা রূপে যিনি জন্ম দিয়েছেন, তাঁর যে সম্পত্তি, সেই সম্পত্তির একটা সীমা আছে, ফলে একের অধিক ভাই-বোন থাকলে সম্পত্তি সবার মধ্যে বিভাজন হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে অনন্ত ঐশ্বর্য, এর বিভাজন হওয়ার কিছু নেই। মায়া আমাদের সব কিছু ভুলিয়ে দিচ্ছে। আপনি কে? মায়ার দরুণ জানতে পারছেন না; আপনি যে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী, মায়া আপনাকে জানতে দিচ্ছে না। জপধ্যান করে শুধু মায়ার এই খেলাটাকে আটকে দেওয়া যায়।

বলছেন, **তাঁর মায়া ত্রিগুণময়ী। এই তিনগুণই ডাকাত, সর্বস্ব হরণ করে; স্ব-স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ –তিন গুণ**।

প্রকৃতি এমন নৃত্য করে যে, সেই নৃত্য দেখে পুরুষ মোহিত হয়ে যায়, ভুলে যায় তাঁর কত দায়ীত্ব রয়েছে। আগেকার দিনের জমিদারদের বেশির ভাগই বাঈজীদের কাছে গিয়ে পড়ে থাকত, ওখানে মদিরা পান করত আর বাঈজীর নৃত্য উপভোগ করত। আমরাও তাই, সবাই এক, কোন তফাৎ নেই। সিনেমাতে, কাহিনীতে এই ধরণের জমিদার চরিত্র দেখে আমরা বলি – লোকটা কি লম্পট। ভুলে গেলেন, আমি আপনি কি কম লম্পট? সেই প্রকৃতির নাচে আমরা মুগ্ধ হয়ে আছি। কামিনী-কাঞ্চনের মদিরা পান করছি আর প্রকৃতির নৃত্যের মধ্যে দেখছি ইনি আমার বাবা, ইনি আমার মা, ইনি আমার স্বামী/স্ত্রী, এ আমার সন্তান, সে আমার বন্ধু, ও আমার শত্রু; সবটাই নাচ, এছাড়া আর কিছু না। আমার এই কথাগুলো আপনাদের ভিতর একটুও কি ঢুকছে? আমি নিশ্চিত যে, কিছুই ঢুকছে না, আর ক্লাশ শেষ হলেই বলবেন, মহারাজ কি দারুণ বললেন। অল্প একটু যদি আপনার মধ্যে এই কথাগুলো ঢোকে আপনার রাতের ঘুম উড়ে যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দী বা বিংশ শতাব্দীতে যদি দেখেন কলকাতা, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, মুম্বাই ভারতের বড় বড় শহরে কি হচ্ছিল, বড় বড় লোকেরা সব নাচঘরে গিয়ে বসে থাকত। আমরাও তাই করছি, নাচঘরে বসে আছি আর প্রকৃতি ছম্ ছম্ করে নৃত্য করে যাচ্ছে, আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে আছি –আমাকে এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, ওটা পেতে হবে, ওটা শেষ করতে হবে, সমাজসেবা করতে হবে, বাবা-মাকে ভালবাসতে হবে, বাবা-মার প্রতি আমার কর্তব্য পালন করতে হবে। এই সমস্ত কিছুই প্রকৃতির ওই ছমক্ ছমক্ ছম্ ছম্ নৃত্য। এসব করে প্রকৃতি আমাদের স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। আমি যে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী, এটাকে ভুলিয়ে দেয়; যার ফলে আমরা নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকি। আসলে আমরা নিজেরাই সব কিছু হারিয়ে বসে আছি।

এদের মধ্যে সত্ত্বগুণই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্ত্বগুণও নিয়ে যেতে পারে না। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়, সপ্তদশ অধ্যায়ে ভগবান এই তিনটে গুণের ব্যাপারে বিস্তারে বলেছেন। তমোগুণ বেঁধে নেয়, রজোগুণ দৌড় করায়, সত্ত্বগুণ মনকে শান্ত করে, সুখ দেয় ও জ্ঞানের ভাব সৃষ্টি করে, কিন্তু ঈশ্বর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে না।

ঠাকুর এরপর তিন ডাকাতের গল্প বলছেন। আপনারা এ-জিনিসগুলি ভাল বোঝেন। জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার সময় একজন ধনীকে তিনজন ডাকাত মিলে ধরেছে। একজন ডাকাত বলছেন, এর সব কিছু কেড়ে নিয়ে মেরে ফেল, আর-একজন ডাকাত বলল, মেরে কাজ নেই, একে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে এখানে ফেলে রেখে চলে যাই। তাই করা হল। এখন যে সত্ত্বগুণী ডাকাত, সে কিছু দূর যাওয়ার পর লোকটির কাছে ফিরে এসে তার সবা বাঁধন খুলে দিয়ে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে গেল। সরকারী রাস্থার কাছে এসে তাকে পথ দেখিয়ে দিলে। এই গল্পটা কথামৃতে অনেকবারই আসে।

সত্ত্বগুণী ডাকাত বলছে, **'এই পথ ধরে যাও, এখন তুমি অনায়াসে নিজের বাড়িতে যেতে পারবে'। লোকটি বললে, 'সে কি মহাশয়, আপনিও চলুন; আপনি আমার কত উপকার করলেন। আমাদের বাড়িতে গেলে আমরা কত আনন্দিত হব'। ডাকাতটি বললে, 'না, আমার ওখানে যাবার জো নাই, পুলিশে ধরবে'**।

অর্থ হল, সত্ত্বগুণ ঈশ্বর পর্যন্ত যেতে পারেনা। কেন পারেনা? সৃষ্টি মানেই তিনটে গুণ, সৃষ্টি মানেই মন ওটাকে চিত্তবৃত্তি হিসাবে নেয়। যতক্ষণ চিত্তবৃত্তি আছে, ততক্ষণ তিনটে গুণ আছে; যতক্ষণ সৃষ্টি আছে ততক্ষণ তিনটে গুণ আছে; যতক্ষণ তিনটে গুণ আছে ততক্ষণ সৃষ্টি আছে। ধর্ম জীবনের শেষ অবস্থায় কি হয়, যেটার আমরা আলোচনা করছি? যখন নিজেকে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী বলে জানতে পারে, তখন জগৎ উড়ে যায়, চিত্তবৃত্তি উড়ে যায়, সত্ত্বগুণ উড়ে যায়। এটাকে বোঝান মুশকিল; ধারণ করতে হয়।

সমুদ্র আর ঢেউ; যখন একটি মাত্র ঢেউ, তখন যেন এটা সত্ত্বগুণ। ঢেউ থাকলে সমুদ্র দেখা যায় না, ঢেউকে শান্ত করতে হবে। ঠাকুর বলছেন, সত্ত্বগুণই কেবল ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। দয়া, ধর্ম, ভক্তি –এ-সব সত্ত্বগুণ থেকে হয়। আপনারা যাঁরা কথামৃতের এই ক্লাশ শুনছেন, সত্ত্বগুণ না হলে শুনতে পারতেন না। রজোগুণ থাকলে আজকে টী-পার্টি করছেন, কালকে বেড়াতে যাচ্ছেন। তমোগুণী হলে ঘরে বসে টিভি সিরিয়াল, আর তা নাহলে খবরের চ্যানেলগুলো দেখতে থাকবেন, আবার সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা।

সত্ত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ। তারপরেই ছাদ। **মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না**। এই কথাগুলো ঠাকুর অনেকবার বলেছেন, আমাদের শাস্ত্রেও অনেকবার এসেছে। অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী মানুষের স্বধাম কি? পরব্রহ্ম। আমার আপনার বাসস্থানটা স্বধাম না, কলকাতা স্বধাম না, ভারতবর্ষ স্বধাম না। এই যে তিনটে জিনিস, ধর্ম কি? ধর্ম আমাদের দুটো জিনিস দেখিয়ে দেয় –নিজের স্বধাম, পরব্রহ্ম। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলছেন, *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম*, আপনি পরম ব্রহ্ম, আপনি পরম ধাম; যেখানে গিয়ে মানুষ আনন্দ পায়, যেখানে গিয়ে মানুষ সুস্থ বোধ করে। কিন্তু সেখানে গিয়ে সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারে, সে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী।

আচার্য –বেশ সব কথা হল। ঠাকুর নির্বিকার ভাবে বলে যাচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –(সহাস্যে) –ভক্তের স্বভাব কি জানো? আমি বলি তুমি শুন, তুমি বল আমি শুনি। তোমরা আচার্য, কত লোককে শিক্ষা দিচ্ছ। তোমরা জাহাজ, আমরা জেলেডিঙি। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর জাহাজ, জেলেডিঙি এগুলো মজা করে বলছেন। গীতা দশম অধ্যায়ে ভগবান খুব সুন্দর বলছেন –*কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ*। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ভক্ত কি করে? তারা আমার কথাতেই রমণ করে, আমার কথাই বলে, আমার কথাই ভাবে। ঠাকুর বলছেন, ভক্তের স্বভাব আমি বলি তুমি শুন, তুমি বল আমি শুনি। তাঁর প্রতি এত বেশি ভালবাসা, এই জিনিসটাকে বুঝতে হলে আমাদের ভাগবতে রাসলীলাতে যেতে হবে। পরাভক্তির এত সুন্দর চিত্রণ রাসলীলা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না, যেখানে গোপীরা কৃষ্ণকে নিয়ে কথা বলছেন; এই গোপীও বলছেন, ওই গোপীও বলছেন। সবাই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েই কথা বলছেন। এটাই পরমধাম, এটাই পরমব্রহ্ম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে

আজ আমরা ১৮৮৩ সালের ২রা মে তারিখের বর্ণনা দেখব (পৃঃ ১৮৩)। আজকে যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি, এটা অনেক ভাবে বিশেষ। এই দিনেই প্রথম ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হয়। অনেক আগে ঠাকুর মথুরবাবুকে নিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক ছোট ছিলেন। যদিও এখানে শুধু লেখা আছে '**শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন**'। এখানে অন্য কেউ হবার কথা নয়, কারণ অন্যানা জায়গায় পরিষ্কার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখা আছে। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কথা লেখা নেই। রবীন্দনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণেও কোথাও এই ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় না। এই যে বলা হয়, প্রথম দর্শনেই কেমন জোর একটা ছাপ ফেলে; কিন্তু যে কোন কারণেই হোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাপ ফেলেননি। বরঞ্চ অনেক পরে রোমা রোঁলা কড়া ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। বিরোধিতা তাঁর ছিলই, তার একটাই যেন কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ যে কালীর পূজা করতেন, যে কালীর সাধক ছিলেন, সেই কালী পাঁঠা খায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু তো বৈশিষ্ট্যততা তো আছেই, একাধারে বিশ্বকবি, একজন এত বড় সাহিত্যিক, এত বড় শিল্পী, গীতিকার, সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন, বাংলার সংস্কৃতিকে একটা নূতন রূপ দিলেন, যাঁর

রচিত গান আজ ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত, তাঁর দেখা হচ্ছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাথে।

ঠাকুর এই দিনে একদিকে যেমন ভক্তি নিয়ে কথা বলবেন, ঠিক তেমনি কাম-ক্রোধকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই নিয়েও বলবেন। আর তার সঙ্গে সংসারী মানুষদের মত এক একটি পয়সার জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা আর এই ব্যাপারে শ্রীরামকৃষ্ণের যে একটা ব্যবহারিক রূপ; লোকেরা যেমন মনে করেন, সাধু-সন্ন্যাসী মানে সংসারের ব্যাপারে কিছু জানেন না, বোঝেন না; কিন্তু তা নয়; দেখবেন ঠাকুর কি রকম গাড়ি ভাড়া নিয়ে কথা বলছেন, গাড়ি ভাড়া নিতে হবে। আবার রাখাল রাগ করে চলে আসতে বলছেন। ঠাকুর বলছেন, এত রাতে খাবো কোথায়। এই যে ঠাকুরের একটা ব্যবহারিক রূপ, যেমন যেমন আসবে আমরা আলোচনা করব। একই সঙ্গে ঠাকুরের কত রকম রূপ, মাস্টারমশাই এই রূপগুলিকে তুলে ধরছেন। মাস্টারমশাইর যে একটা বিরাট বড় অবদান, কারা কারা উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের অনেক লোকের নাম তিনি লিখে দিয়ে গেছেন; ফলে সেই সময়কার ছবিটা পেতে সহজ হয়।

বেলা পাঁচটার সময় ঠাকুর আজ নন্দনবাগান এসেছেন। সেখানে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বসে ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। রাখাল, মাস্টার প্রভৃতি সেখানে আছেন।

কাশীশ্বর মিত্র একজন ব্রাহ্মভক্ত ছিলেন, তিনি গত হয়েছেন। তাঁরই ছেলেরা আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। যে কোন জিনিস প্রথম যিনি করেন তখন তাঁর উৎসাহ থাকে। আমাদের শ্রোতাদের কেউ কেউ কবিতা লেখেন, সেই কবিতা আবার আমাকে পাঠাবেন। কি নিম্নমানের কবিতা সেটা না বলাই ভাল। সরাসরি কাউকে বলি না, অনেক সময় পরোক্ষ ভাবে বলে দিই। কিন্তু যিনি লিখেছেন, এই লেখা নিয়ে তাঁর এত উৎসাহ যে অনেককে না পাঠিয়ে তিনি শান্তি পান না। একজন আমাকে বললেন, তিনিও কবিতা লেখেন। আমি ওনাকে বললাম, 'আপনি যদি ঠিক ঠিক কবি হন, আপনার স্ত্রী যখন রান্না করছেন তাঁর রান্না থামিয়ে তাঁকে কবিতা শুনিয়েছেন? আপনার বাচ্চা ছেলের স্কুল যাবার সময় হয়ে যাচ্ছে, তাকে আটকে কবিতা শোনান? বাড়ির বাইরে রাস্থায় বন্ধুদের ধরে কবিতা শোনাচ্ছেন তো? আপনাকে দেখে লোকেরা কবিতা শোনার ভয়ে রাস্থা পাল্টে নিচ্ছে তো? যদি এগুলো না হয় তাহলে আপনি আর কিসের কবি'?

কবি তাঁর কবিতা লেখার ভাবে ডুবে থাকে, তাঁর কবিতা অপরকে শোনাতে চায়। মা যেমন সবার কাছে নিজের সন্তানের সুখ্যাতি করে বেড়ায়, ঠিক তেমনি কবি তাঁর কবিতা সবাইকে শুনিয়ে বেড়াতে চাইবে। কারণ ওর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর ইমোশানস্। শুধু কবিতা না, যে কোন জিনিস আপনি যখন করেন, যেমন যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁরা তাঁদের পরিচিতদের ডেকে ডেকে ছবি দেখাতে থাকেন, কারণ সেখানে ইমোশানস্ জড়িয়ে আছে। যে কোন কাজ যখন কেউ করছেন, সেখানে তাঁর ইমোশানস্ থাকে। একজন বাড়িতে ঠাকুরের তিথিপুজোতে বড় করে পূজার আয়োজন করেছিলেন। আমাকে পূজার খুব সুন্দর সুন্দর ছবি পাঠিয়েছেন।

এখন কাশীশ্বর মিত্রের ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, বাবা-মা গত হয়েছে। বাবা-মাকে মনে করে সন্তানরা এক বছর কি দু বছর উৎসব করবে, কিন্তু সেই ইমোশানসটা থাকবে না। ফলে আস্তে আস্তে উৎসাহটা হারিয়ে যায়। আমাদের জীবন পুরো ইমোশানসে চলে, আমরা হয়ত বুঝি না। কাঠখোট্টা ভাব নিয়ে জীবন চলে না, সংসার চলে না। সংসার চালানোর জন্য ইমোশানস্ খুব দরকার; কাম, ক্রোধ এগুলো না থাকলে সংসার চলবেই না, তা নাহলে আমরা সবাই পাথরের প্রতিমা হয়ে যাব।

কাশীশ্বর মিত্র উনি আগে আগে ব্রাহ্মভক্তদের নিয়ে উৎসবাদি করতেন। সেটাই মাস্টারমশাই এখানে বলছেন, **তাঁহার স্বর্গারোহণের পর শ্রীনাথ, যজ্ঞনাথ প্রভৃতি তাঁহার পুত্রগণ কিছুদিন ওইরূপ উৎসব করিয়াছিলেন**।

ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নিচে একটা বৈঠকখানাঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ঘরে ব্রাহ্মভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন। তার মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর), 'রবীন্দ্রনাথ' লেখেননি; **প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন**। খুব মজা লাগে, কারণ পুরো কথামৃতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম এখানেই একবার আসছে। উনি যে কোন কথা বলেছেন বোঝা যাচ্ছে না, কারণ মাস্টারমশাই কোন উল্লেখ করেননি। মাস্টারমশাই মোটামুটি সবটাই লিখতেন।

ঠাকুরেকে এবার দোতালায় উপসনামন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে একটা পিয়ানো রয়েছে। সন্ধ্যার সময় উৎসবের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে। আগে আগে আমরা কয়েকটি উপাসনা দেখেছি। সবাই আসন গ্রহণ করে বসেছেন। ঠাকুর এবার কথা শুরু করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –নরেন্দ্র আমায় বলেছিল, 'সমাজমন্দির প্রণাম করে কি হয়'? কারণ ব্রাহ্মরা হল নির্গুণ নিরাকারে বিশ্বাসী, তাহলে সমাজমন্দিরে প্রণাম করা কেন? আবার অন্য দিকে ব্রাহ্মসমাজের স্তবাদিতে, গানে, রবীন্দ্রনাথের গানেও প্রণামের কথা রয়েছে। ঠাকুর হ্যাঁ বা না কোন কিছুই বলছেন না। সেটুকু কথাই বলছেন, যেটুকু কথা আমার আপনার জন্য মঙ্গল।

মন্দির দেখলে তাঁকেই মনে পড়ে –উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয় সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়, –আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়। এ-সব জায়গা দেখলে ভগবানকেই মনে পড়ে।

খুব দরকারী ও গুরুত্বপূর্ণ কথা। যারা বোকা বোকা কথা বলে, এত বড় বড় মন্দির কেন, এত মন্দির কিসের জন্য দরকার। আমাদের দেশেরই দুর্ভাগ্য। বেলুড় মঠে চাতালে দাঁড়িয়ে একজন আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করছে, 'এত বড় মন্দিরের এখানে কি দরকার ছিল? এই টাকা দিয়ে গরীবের সেবা করলে কিছু লোকের তো দুটো অন্ন জুটত'।

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'আপনার এত বড় বড় মল কেন তৈরী করেন বলুন তো? এত বড় বড় সিনেমা হল কেন বানান? আপনাদের একটা সহজ কথা বলি, শুনে আপনাদের অত্যন্ত খারাপ লাগবে। এই যে খবরের কাগজ, কত রকমের ম্যাগাজিন, এখন অবশ্য ই-ম্যাগাজিন হয়ে গেছে; কিন্তু কিছু বছর আগেও পুরোটাই কাগজ দিয়েই চালানো হত, এখনও চলে। কাগজ কোথা থেকে তৈরী হয়? একমাত্র গাছ কেটে। গাছ কাটলে কি হয়? পার্যাবরণ দূষিত হয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। সেই খবরের কাগজে কি ধরণের খবর থাকে? নেতা-মন্ত্রীদের কেচ্ছা আর সিনেমার তারক-তারকাদের অর্ধনগ্ন চিত্র। কত বিক্রি হয়? লক্ষ লক্ষ কপি। ওই একজন হিরোইনের অর্ধনগ্ন ছবি দেখার জন্য কত গাছ কাটা হচ্ছে, একবারও কল্পনা করে দেখেছেন? যারা বলে, এত বড় বড় মন্দির তৈরী করা কেন; তাদেরকে এই প্রশ্নটা একবার জিজ্ঞেস করে দেখবেন তো। আর এটা একবার ছাপিয়েই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। রোজ ছাপাচ্ছে, বারেবারে ছাপাচ্ছে। একবার খবরের কাগজ পুরোটা খুলে দেখুন তো, আর হিসাব করুন খবর কাগজে কটা ছবি আছে যেখানে মেয়ে মহিলাদের অবজেক্টিফাই করা হয়েছে? তাদের ছবি দেখিয়ে একটা জিনিসকে প্রমোট করা হচ্ছে? সেটাকে কি আপনি অনুমতি দিচ্ছেন? আর মন্দির, যেখানে মানুষকে সৎচিন্তন করতে শিক্ষা দেয়, যেখানে গিয়ে মানুষ নিম্ন আমি থেকে উচ্চ আমিতে উঠে আসে, যেখানে যেতে যেতে মানুষের মধ্যে সৎগুণের আবির্ভাব হতে শুরু করে। আর এই মন্দির নির্মাণে আপনাদের আপত্তি'?

মানুষ কত নীচ হয়ে গেলে এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা তার মনে উদয় হতে পারে। যে কোন মন্দির হলেই, এসে প্রথম কথাই বলবে, মন্দির কেন দরকার? ভাই তোমার ম্যাগাজিনে, তোমার খবরকাগজে তারক-তারকার অর্ধনগ্ন ছবি কেন? তোমাদের কি একবারও মনে হয় না যে, মেয়ে মহিলাদের অবজেক্টিফাই করা হচ্ছে? এটাকে নিয়ে তোমাদের একবারও কি আপত্তি করতে ইচ্ছে হয়

না? তোমাদের মনে কি একবারও মনে হচ্ছে না যে, এই সংস্কৃতি পুরো একটা জাতি, একটা সমাজকে কিভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে? কিছু বছর পর ইনি বিয়ে করবেন, এনার সন্তানাদি হবে। এই সন্তানরাই একটু বড় হয়ে নিজের মায়ের এই নগ্ন ছবিগুলি দেখবে।

এর অর্থ হল, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এনাদের মুর্তি ভেঙে দাও, ভেঙে সেখানে বসিয়ে দাও সিনেমার হিরো হিরোইনদের নগ্ন, অর্ধনগ্ন ছবি। আপনারা কি এটাই চাইছেন? আপনি আমি না চাইতে পারি কিন্তু যারা প্রশ্ন করে, মন্দির কেন? তাঁরা এটাই চাইছেন। স্বামীজী এগুলোকে নিয়ে কত নিন্দা করেছেন। অত্যন্ত কড়া ভাষায় বলছেন, ডায়মণ্ড ওয়ারশিপ, ডলার ওয়ারশিপ। ভগবানের পূজাকে সরিয়ে এরা কামিনী-কাঞ্চনের পূজা করতে চাইছে। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষ যে ধর্মের দেশ, ঈশ্বরকে পূজা করার দেশ। অন্যান্য দেশে কি হয়, কি হয় না, সেখানে ভগবান আছেন, ভগবান নেই, ভগবানের সৃষ্টি, ভগবানের সৃষ্টি নয়; এসব নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমার ভারতভূমি কথা যখন আসে, তখন যে আমার অনেক কিছু বলার এসে যায়।

ভারতভূমি পূণ্যভূমি। এই পূণ্যভূমিতে ঈশ্বর অবতার রূপে বারবার এসেছেন, বারবার আসছেন। এই পূণ্যভূমিতে ঈশ্বর কখন তাঁর কোন সন্তানকে পাঠাননি, ঈশ্বর এখানে কোন দিন তাঁর কোন সন্দেশবাহককে পাঠাননি, এখানে তিনি নিজে আবির্ভূত হন। এখানেই রয়েছে ব্রজভূমি, এখানেই রয়েছে কৈলাস, এখানেই রয়েছে কাশী, এখানেই রয়েছে নবদ্বীপ, মথুরা, দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট। ভারতের ধুলিমাটিতেই স্বয়ং ঈশ্বর খেলা করতে চান। এগুলো আমরা ইতিহাস থেকে বলছি। আগামীকাল কি হবে আমার জানা নেই, এই খেলা হয়ত তিনি অন্য কোথাও করতে পারেন, কারণ ঈশ্বরের মন স্বাধীন। সেই ভূমিতে কয়েকজন ইংরাজী বই পড়ে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভাবাধারায় পুষ্ট হয়ে বলছে, ‘আমাদের মন্দির লাগবে না, এরা সব পৌত্তলিক’।

মানুষ পূজা ছাড়া থাকবে না, তুমিও থাকবে না। তাহলে বল, তোমরা কিসের পূজা করতে চাও? আমরা কামিনী-কাঞ্চনের পূজা করতে চাই। রোজ সকালে চা খেতে খেতে খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনে ওই ছবি দেখব, এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তোমার এই পূজাটাও তো পৌত্তলিক, ছবিও যা, মুর্তিও তাই। মানুষ মরে যাবে কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করবে না। মানুষ ভাবছে না যে কিভাবে আমাকে আপনাকে ঠকাচ্ছে। আমি আপনি এটা বুঝতেও পারছি না, আমরা যারা নর্দমা থেকে বেরিয়ে এসেছি, কিভাবে তারা আর-একবার আমাদের নর্দমাতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিবর্তনের স্কেলে আমরা বানর শিম্পাঞ্জি থেকে উঠে আজ এখান পর্যন্ত চলে এসেছি। জঙ্গলে বানর-শিম্পাঞ্জিরা এভাবেই থাকে, নিজের মনের মত থাকবে, যা খুশি করবে, যার সঙ্গে খুশি করবে; এটাই আমাদের করতে বলছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে হয়ে আজ যে এত দূর পর্যন্ত চলে এসেছি, এই চলে আসাটা ভূল হয়ে গেছে, আবার তোমরা বানরের মত থাক। এই কথাগুলো আমার আপনার কারুর কথা দিয়ে ভাববেন না, নিজে বিচার করে দেখবেন ষোল আনা ঠিক বলা হচ্ছে।

মন্দির দেখলে কি হয়? ঠাকুর বলছেন উদ্দীপন হয়। ঠাকুর কি সুন্দর বলছেন —সকল তীর্থ উপস্থিত হয়। কারণ মন্দিরে ঈশ্বরচিন্তন হয়। অত্যন্ত একটা সাধারণ কথা, আমাদের কথায় বলে, ব্রজভূমিতে মাঝ রাতে আধ্যাত্মিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। বৃন্দাবনে যাঁরাই যান, তাঁরা খুব আশা নিয়ে যান যে, মাঝরাতে যেন আমরা একটু হরিনাম করতে পারি। কাশী শিবের স্থান, বলে সেখানে ভোরবেল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ চলে। সেইজন্য নিষ্ঠাবান ভক্তরা কাশীতে ভোরবেলা গঙ্গায় চলে যান, সেখান গঙ্গাস্নান করে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালেন।

আমাদের সব সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা রোজ সকালে পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে প্রণাম করতে যান। সেই সময় মহারাজরা অনেক প্রশ্ন করেন, মহারাজও অনেক কথা বলেন। রোজা আমাদের আধ ঘণ্টার অনুমতি ছিল মহারাজের সঙ্গে কথা বলার। একবার একজন সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ মহারাজকে

জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মহারাজ, বৃন্দাবনে মাঝরাতে, কাশীতে ভোরবেলা আধ্যাত্মিক তরঙ্গ চলে, বেলুড় মঠে কখন চলে'? মহারাজ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলছেন –'চব্বিশ ঘণ্টা'। আমরা বেলুড় মঠে বাস করি, চব্বিশ ঘণ্টাই বেলুড় মঠে ঘুরঘুর করি, আমরা জানি এখানকার তরঙ্গ কত পাওয়ারফুল। ভক্তরা যখন আসেন তখনও তরঙ্গ চলছে, ভক্তরা যখন থাকছেন না, তখন তো কথাই নেই।

পুরাণের কাহিনীতে আমরা পাই, সতী যোগবলে নিজের প্রাণত্যাগ করলেন। শিব খবর পেয়ে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সতীর শরীরকে কাঁধে তুলে শুরু করলেন তাণ্ডবনৃত্য। উদ্দেশ্য সমস্ত সৃষ্টিকে নাশ করে দেওয়া। ইন্দ্রাদি দেবতাদের দুশ্চিন্তা হল, সবাই ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়ে শিবকে শান্ত করার প্রার্থনা জানালেন। ভগবান তখন সতীর দেহকে সুদর্শন চক্র দিয়ে টুকরো টুকরো করে দিলেন। যেখানে যেখানে সতীর দেহের অংশ গিয়ে পড়ল, সেই স্থানই হয়ে গেলে একটা মহাতীর্থ। পশিচমে পাকিস্থান থেকে শুরু করে পূর্বদিকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বাহান্নটি শক্তিপীঠ তৈরী হয়ে গেল। বেলুড় মঠে মা ভবানী, মা দুর্গার সম্পূর্ণ শরীরকে দাহ করা হয়েছে। সেই দাহস্থানে নির্মিত হল মায়ের মন্দির। বেলুড় মঠ কত বড় পাওয়ারফুল শক্তিপীঠ কল্পনা করা যায়! সতীর একটি অঙ্গ পড়ে হয়ে গেল একটা শক্তিপীঠ। আর বেলুড় মঠে মায়ের পুরো দেহ।

বেলুড় মঠের গর্ভগৃহে যেখানে ঠাকুরের বিগ্রহ স্থাপিত, তার নীচে ঠাকুরের ভস্মাবশেষ রাখা আছে। ঠাকুর সেখানে সাক্ষাৎ অবস্থান করছেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ একজন মহাযোগী, শিবের অংশ থেকে এসেছেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে ঠাকুর তাঁকে নিয়ে এলেন, তাঁর পুরো শরীরটা বেলুড় মঠের মাটির সঙ্গে মিশে আছে। কত বড় মহাতীর্থ বেলুড় মঠ কল্পনা করা যায়? বিশ্বাস করুন আমরা সন্ন্যাসীরাও ধারণা করতে পারিনা। বেলুড় মঠের যে কি বিরাট মাহাত্ম্য এটা আমরা ধারণা করতে পারিনা। তবে কি, যেখানেই আমরা মন্দির দেখি, মন্দির দেখলেই আমাদের উদ্দীপন হয়।

কিছু দিন আগে স্বপ্নে দেখছি হিমালয়ের মত বিরাট পাহাড়, আর হঠাৎ দেখছি পাহাড়ের মাঝখানে একটা বিরাট মন্দির। অবাক হয়ে ভাবছি, এখানে এই বিরাট মন্দির কিসের মন্দির, শিবমন্দির না শক্তিমন্দির। কিন্তু একটা উদ্দীপনের ভাব এসে গেল। কাশ্মীর থেকে লে যাচ্ছিলাম, ওখানে বৌদ্ধদের সব কিছু, হিন্দুদের কিছু নেই। হিমালয়ের শেষ প্রান্তে পোঁছে একটা কুঁড়েঘর দেখলাম, সেই কুঁড়েঘরের ভিতর একটা শিবের মুর্তি, শিবের মুর্তি দেখেই আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল; অন্তরস্থল থেকে কেউ যেন বলে দিল, আমি আমার এলাকাতেই আছি।

যারা এগুলোকে নিন্দা করে, যারা নিজেদের যুক্তিবাদী মনে করে, তাদের এই ভাবগুলি বোঝার ক্ষমতা নেই। কামিনী-কাঞ্চনের পূজারী এরা। আগেকার দিনে ধর্মের নামে যেমন জেহাদ হত, লড়াই হত; খ্রীশ্চানরা জহুদিদের সঙ্গে লড়াই করছে, খ্রীশ্চানরা মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করছে, মুসলমানরা বাকিদের সঙ্গে লড়াই করছে; ঠিক তেমনি কামিনী-কাঞ্চনের পূজারীরা এখন লড়াই করছে ধর্মের পূজারীদের সঙ্গে। যিনি ধর্মের পূজারী তাঁকে এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, কিন্তু তিনি যদি নিজের ধর্মের ব্যাপারে না জানেন, কি করে দাঁড়াবেন? এই লড়াই তো আর তলোয়ার আর বন্দুকের লড়াই না; আদর্শের লড়াই। সেইজন্য আমাদের সবাইকে আগে নিজের ধর্মকে ভাল ভাবে জানতে হবে, ভাল করে বুঝতে হবে।

ঠাকুর বলছেন, এ-সব জায়গা দেখলে ভগবানকেই মনে পড়ে। আমি অনেকদিন দেওঘরে ছিলাম, কাছেই বৈদ্যনাথধাম। আপনারা যদি গিয়ে থাকেন জানবেন, বৈদ্যনাথধাম কি নোংরা ভাবতে পারবেন না। কারণ বাবা বৈদ্যনাথের উপর চড়ানো হয় আকন্দ ফুল, বেলপাতা আর জল। গঙ্গাজল পাওয়া যাবে না বলে ওখানে একটা কুয়া আগে থেকেই হয়ে আছে। বলা হয় যে, এই কুয়োর জলের সাথে সুলতানগঞ্জে যে গঙ্গা তার সাথে নাকি জুড়ে আছে। ছোটবেলা শুনতাম, বিশ্বাসও করতাম। ঘটি ঘটি জল ঢালছে, বেলপাতা আর ফুল চড়াচ্ছে। ফুল আর পাতায় পুরো পাহাড় হয়ে গেছে, নোংরা তো

হবেই। কারণ এই পূজাবিধি অন্যান্য ধর্মে নেই, শুধু আমাদের ধর্মেই রয়েছে। সেখানেই দেখুন লোকেরা আসছে মন্দিরের চাতালে এসে ওখানকার ধুলো মাথায় তুলে লাগাচ্ছে। আমি নিজেও যখনই কোন মন্দিরে প্রবেশ করি, তার চৌকাঠের কাছে এসে ওখানকার ধুলো নিয়ে মাথায় রাখি। কারণ এখানে যাঁরা আসছেন, কত দূর দূর থেকে পায়ে হেঁটে আসছেন, এনারা তো ভক্তি ভাব নিয়েই আসছেন। তাঁর মনে হয়ত বাসনা, কামনা থাকতে পারে; হে প্রভু আমার এই কষ্ট দূর করে দাও, আমার এই কামনা পূর্ণ করে দাও প্রভু। কিন্তু এইসব নেতাদের পূজা করা, ফিল্মস্টারদের পূজা করা, তার থেকে কি এটা ভাল না? বুদ্ধি থাকলে তো বুঝবে, বুদ্ধিই তো নেই।

মন্দির মানে? মন্দির তখনই মন্দির, যখন সেখানে তাঁর আবির্ভাব হয়; ঠাকুর বলছেন, সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়। কিভাবে আবির্ভাব হয়? অনেক সময় দেবী স্বপ্নে হোক বা অন্য কোন ভাবে হোক, নিজেই আবির্ভূতা হয়ে বলেন, আমি এখানে পূজা গ্রহণ করব। আবার অনেক সময়, অনেক ভক্তের যখন সমাগম হয়, সেখানে, ঠাকুর যেটা বলছেন, তাঁর আবির্ভাব হয়। তৃতীয় হল, কোন সাধু বা যোগী বা কোন বড় মহাত্মা যদি ওখানে তপস্যা করে থাকেন। আমাদের মন্দিরগুলো এই তিন ভাবে হয়। প্রথম হল দেবী-দেবতা কাউকে স্বপ্নে কোন আদেশ করেছেন। দ্বিতীয় ভক্ত সমাগম হতে হতে একদিন সেখানে একটা মন্দির হয়ে গেল। আর তৃতীয়, সেখানে কোন সাধু মহাত্মা তপসায় করেছিলেন। কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁর আবির্ভাব হয়।

একজন ভক্ত বাবলাগাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল! –এই মনে করে যে, এই কাঠে ঠাকুর রাধাকান্তের বাগানের জন্য কুড়ুলের বাঁট হয়।

আমার জীবনের স্বপ্ন, যদি কখন এ-রকম ভক্ত হতে পারতাম। গ্রামের অতি সাধারণ এক লোক বাবলাগাছ দেখছে, আমরা তো কত রকমের গাছই দেখি। কোদাল, কুড়ুলের যে বাঁট হয়, সাধারণ ভাবে হয় বাঁশ দিয়ে নয় তো বাবলাগাছের ডাল দিয়ে সেই বাঁট তৈয়ার হয়। বাবলাগাছের ডাল খুব শক্ত হয়। দেখছে বাবলাগাছ, সেখান থেকে তার মন চলে গেল কোদালের বাঁটে, সেখান থেকে চলে গেল রাধাকান্তের বাগানে, সেই বাগান এই কোদাল দিয়ে সবজী চাষ হয়, সেই সবজী দিয়ে রাধাকান্তের ভোগের রান্না হবে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আমার কি দুর্ভাগ্য, এই স্তরের ভাব আমার নেই, কোন দিন হবে কিনা তাও জানা নেই। এই ধরণের ভাব যখন থাকে, মানুষ তখন ভক্তিভাবে এগোয়।

আমরা এই যে ঠাকুরের ছবি রাখি, ভগবানের ছবি রাখি, পবিত্র তীর্থের ছবি রাখি যাতে আমাদের মধ্যে ভাব তৈরী হয়। ঠাকুর আবার অন্য জায়গায় বলছেন, রজোগুণী লোক কুইনের ছবি রাখে। ইয়ং ছেলেরা ক্রিকেট স্টার, ফুটবল স্টার, সিনেমার স্টার এদের ছবিগুলো খাতায় রাখে। তারপর জীবনে অনেকটা এগিয়ে যায়, যাওয়ার পর যখন দেখে জীবনটা অসার, সারহীন, তখন ধীরে ধীরে ঈশ্বরের দিকে যায়। তখন সে আবার তার বাচ্চাদের বলতে শুরু করে, বাপু তুমি যে স্টারদের ছবি লাগাচ্ছো এগুলো বেকার। কিন্তু বাচ্চারা বুঝবে না, আর কক্ষণ তাদের বলতে নেই; আপনার আচরণেই শিখে যাবে। অপরকে কক্ষণ এগুলো নিয়ে উপদেশ দিতে নেই, আপনার আচার-আচরণ দেখেই ওরা শিখবে। আপনার যদি বিরাট কোন উপলব্ধি হয়, আপনাকে দেখলেই মানুষ যদি শান্তি পান, শক্তি পান; লোকেরা নিজে থেকেই বলবে, কিভাবে আপনার এটা হল? কিভাবে আপনি এই জায়গায় পৌঁছালেন? ঠাকুর বলে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশা করি ওখানেই আছেন।

একজন ভক্তের এরূপ গুরুভক্তি যে, গুরুর পাড়ার লোককে দেখে ভাবে বিভোর হয়ে গেল।

মেঘ দেখে –নীলবসন দেখে –চিত্রপট দেখে –শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হত। তিনি এই সব দেখে উন্মত্তের ন্যায় 'কোথায় কৃষ্ণ'? বলে ব্যাকুল হতেন।

একটা ঘটনা বলি। আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ। সেই সময় ১৯৫০ সালে কি ওই সময় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের উপর একটা স্লাইড্ শো বা ওই রকম কিছু একটা হয়েছিল। সিনেমাই হবে, বেলুড় মঠ প্রাঙ্গনে সিনেমা দেখানো হবে। তখন ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই এভাবে ছিল না, জেনারেটার বা অন্য কোন ভাবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হত। যাই হোক মঠ প্রাঙ্গনে সব সাধুরা জড়ো হয়েছেন। মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিরজানন্দজীকেও আনা হয়েছে, চেয়ারে বসানো হয়েছে, স্বামীজীর উপর সিনেমা দেখানো হবে, উনি দেখবেন। দু মিনিট পরে ওনার পাশে যে সেবক বসেছিলেন, ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'স্বামীজী এলেন'? বিরজানন্দজী মহারাজ পুরো স্বামীজীর ভাবে ডুবে গেছেন। এমন ভাবে ডুবে গেছেন যে, সন্ধ্যেবেলায় তাঁর কোন হুঁশ নেই। সামনে চোখে আর কিছু দেখতে পারছেন না, শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন 'স্বামীজী এলেন'? দুবার, তিনবার এ-রকম বলার পর সেবক বলছেন, 'স্বামীজী এলে আপনাকে বলব'। মহারাজও চুপ করে গেলেন। এমন কপাল যে, সেই সময় ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে। বোঝা গেল, সাপ্লাই চলে গেছে, এখন আর আসবে না। শো বন্ধ হয়ে গেল। সবাই উঠে চলে যাচ্ছেন। মহারাজ তাঁর সেবককে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন, 'স্বামীজী এলেন'? সেবক বললেন, 'মহারাজ এখন ঘরে চলুন, স্বামীজী এলে আপনাকে নিয়ে আসা হবে'। বেলুড় মঠে যেখানে পুরনো মন্দির, সেখানে যে আমগাছ, তার নীচে যে চাতাল, সেখান থেকে মহারাজ এবার চললেন নিজের ঘরে। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছেন, 'স্বামীজী এলেন'? কোন কিছুর হুঁশ নেই, পুরো স্বামীজীর মধ্যে ডুবে আছেন। শুধু এটুকু জানেন যে, স্বামীজীকে নিয়ে কিছু একটা দেখতে এসেছেন। কিন্তু সিনেমার দিকে দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি শুধু, 'স্বামীজী এলেন'?

ঘোষাল –উন্মাদ তো ভাল নয়।

বলতে চাইছেন, এটা তো এক প্রকার উন্মাদ, এই জিনিস তো ভাল নয়। বিরজানন্দজীর ঠিক এই রকম আর-একটি ঘটনা একবার একজনকে বলছিলাম, তিনি আবার একটা কোম্পানির বড় এ্যক্সিকিউটিভ, তখন তিনিও ঠিক আমাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। 'এটা তো ভাল না, এতো উন্মাদের লক্ষণ'। ঠাকুর তার উত্তরে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ –সে কি গো? একি বিষয়চিন্তা করে উন্মাদ, যে অচৈতন্য হবে? এ অবস্থা যে ভগবানচিন্তা করে হয়! প্রেমোন্মাদ, জ্ঞানোন্মাদ –কি শুন নাই?

আর একবার আমরা পিছনের দিকে যাই। যাঁরা কামিনী-কাঞ্চনের পূজা করছেন, যাঁরা শুধু কামিনী-কাঞ্চনই দেখতে চান, যাঁরা বড় সিনেমা হল, বড় মল দেখতে চান; তাঁদের কাছে ধার্মিকতায় যাঁরা অত্যন্ত উচ্চাবস্থায়, তাঁরা উন্মাদ। এদের কাছে ধর্ম ব্যাপারটাই উন্মাদ। এখানে তাই ঠাকুর ঠিক করে দিচ্ছেন; এটা বিষয়চিন্তা করে উন্মাদ না, এটা প্রেমোন্মাদ, জ্ঞানোন্মাদ। বিষয়চিন্তা করলে মানুষ উন্মাদ হয়, ঈশ্বরচিন্তা করে যে উন্মাদ, এটা অন্য জিনিস। মন সেখানে রসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, মন সেখানে তার আমিত্বকে ছেড়ে দেয়, বিরজানন্দজীর মত কোন হুঁশ থাকে না যে তাঁর চারপাশে কি হচ্ছে, মন পুরো স্বামীজীর ভাবে ডুবে আছে। আবার সেই প্রচলিত প্রিয় প্রশ্ন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত –কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়?

ঠাকুর যখন কথা বলছেন, তখন সেই কথার পিছনে একটি বিশেষ শক্তি আছে। স্বামীজী যখন বলছেন, Sisters and brothers of America, ওই কথার পিছনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের এমন শক্তি, যে শক্তির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। সমস্ত লোক দাঁড়িয়ে করতালি দিতে শুরু করলেন। ঠাকুরের যে শক্তি, আধ্যাত্মিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে শক্তি, সেখানে সব কিছু অচল হয়ে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করছেন –কি উপায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ –তাঁর উপর ভালবাসা। –আর এই সদাসর্বদা বিচার –ঈশ্বরই সত্য, জগৎ অনিত্য।

গীতার নবম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*, অর্জুন, তুমি বুঝে নাও এই জগৎটা অনিত্য আর এই জগতে কোন সুখ নেই, এই বোধ করে তুমি আমার কাছে এসো। আমরা কি জানি, কোটি কোটি জন্ম ধরে আমরা এই জগৎকে ভোগ করে যাচ্ছি, শুধু এতটুকু বোঝার জন্য যে, এটা অনিত্য, এটা সুখহীন। বোধ আমাদের হয় না, কারণ যখন বোধ হবে তখন প্রকৃতি আমাদের জন্য নূতন নূতন কিছু এনে দিয়ে বলবে –কেন বাপু এত ছটফট করছ, এই নাও, এই নিয়ে তুমি শান্ত হও, আমাকে ছেড়ে যেও না। একবার এক বৃদ্ধা পাহাড়ী মহিলার সঙ্গে আমার দেখা। বৃদ্ধার দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম। এমনি বন্ধুরা মিলে সেই মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। মহিলার বয়স হয়েছে, জগৎ দেখেছেন; একটা দুটো কথা বলতে বলতে মহিলা আমাদের বলছেন –পুরুষ কো বাঁধনা পড়তা হ্যায়। অর্থ হল, পুরুষের স্বভাবই হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া; আমাদের কাজ হল তাদের বেঁধে রাখা। আমার সঙ্গীদের বললাম, ইনি পড়াশোনা করা না, ধর্মদর্শন জানেন না, কিন্তু সাংখ্য দর্শন, যোগদর্শনের যে শেষ কথা, প্রকৃতি পুরুষকে বাঁধে; উনি নিজের অনুভব দিয়ে ওই একই কথা বলছেন। আমরা যেমনি সংসার থেকে, জগৎ থেকে বিরক্ত হয়ে বলি, আর না; প্রকৃতি সঙ্গে সঙ্গে নূতন একটা কিছু সামনে নিয়ে আসে –এই নাও, ভেঙে পড়ো না, আনন্দ কর। প্রকৃতির আনন্দহাটের সব যখন শেষ হবে, তখন হবে *ভজস্ব মাম্*, তার আগে পর্যন্ত হয় না। ঠাকুর বলে যাচ্ছেন –

অশ্বত্থই সত্য –ফল দুদিনের জন্য।

এরপরেই ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করছেন।

ব্রাহ্মভক্ত –কাম, ক্রোধ, রিপু রয়েছে, কি করা যায়? এই প্রশ্ন আমাদের মনকে বারবার নাড়া দেয়। শাস্ত্র পড়তে গিয়ে নাড়া দেয়, এমনিতেও লোকেরা মাঝে মাঝেই এই প্রশ্ন করেন, কারণ সবাইকে এগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে হয় কিনা। ধর্মের দুটো কথা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরাও এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবেন। আবার অনেকে মনে করেন, জগতে তাঁরই যেন কাম, ক্রোধ জনিত কষ্টটা বেশি। এখানে আমরা কাম, ক্রোধ নিয়ে একটা ছোট্ট আলোচনা করছি। আপনার যদি বুঝতে পারেন তো খুব ভাল, অপরকেও বোঝাতে পারবেন।

কাম, ক্রোধ এগুলো হল ইমোশানস্। ইমোশানস্ মানেই সংসার। ইমোশান যদি না থাকে সংসার চলবে না। পুরো সংসারটাই চলে শুধু কাম, ক্রোধ দিয়ে। যার জন্য সংসারে আপনি যদি কিছু অর্জন করতে চান, যেমন যাঁরা অলিম্পকে মেডেল পান, যাঁরা বড় ক্রিকেটার, এনারা সবাই ইমোশানস্ থেকে বেরিয়ে আসেন। ভাল অভিনেতা, অভিনয়ের আগে একজন সাধারণ মানুষের মত আছেন, কোন ইমোশানস্ নেই, অভিনয় করতে যেমনি অভিনয় জগতে নেমে গেলেন, তখন অন্য রকম হয়ে যান। তার মানে যে অবস্থায় ছিলেন, সেটাকে ছেড়ে দিতে পারছেন। যে কোন অর্জনের ক্ষেত্রে, যিনি ঈশ্বর পথে যান, যিনি সন্ন্যাসী হন, তিনি ধীরে ধীরে চেষ্টা করেন ইমোশানস্কে ত্যাগ করার।

সাধুদের সাধারণ ভাবে ইমোশান কম হয়, সেইজন্য ওনারা কোন কোন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে যেতে পারেন। যার জন্য এটা দেখা যায় যে, আপনি হয়ত কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে জানেন, যিনি খুব মিষ্টভাষী, খুব মিষ্ট ব্যবহার, কিন্তু হঠাৎ কোনদিন দেখলেন তিনি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করছেন। এর একটাই কারণ এই যে, সাধুদের মধ্যে ইমোশানের যে ফল্গু নদী, সেটা থাকে না, আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়, এটাই স্বাভাবিক।

এই যে ইমোশানস্গুলি যেটা দিয়ে সংসার চলছে, আর সমস্ত ইমোশানস্ যেটাকে প্যাশানস্ বলি –কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য বলি বা অন্যান্য যে কোন জিনিস, আমি জয়ী হব, আমি ছাড়ব

না, এটাও কামের একটা ভাব। 'আমি ছাড়ব না' যখন বলছি, এর মানে, একটা কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ব না, এর মধ্যে কাম আর ক্রোধ দুটোই মিশে আছে। নিজের তেজটাকে জাগানো হয়েছে, সেই তেজটাকে এখন কাজে লাগানো হচ্ছে।

এই জিনিসগুলোর মধ্যে তিনটে জিনিস মিশে থাকে –ব্রেন কেমিক্যালস্, থিঙ্কিং আর ইমোশানস্। যার জন্য কি হয়, যখন বিশেষ ব্রেন কেমিক্যালস্ একটু ডাউন হয়ে যায়, মানুষ ডিপ্রেসিভ হয়ে যায়, মানুষ সুইসাইডাল্ হয়ে যায়। আপনার যদি মনে হয় আপনি সুইসাইডাল্, বুঝবেন আপনার বিশেষ ব্রেন কেমিক্যালস্ ডাউন হয়ে গেছে। আপনাকে এখন কোন ভাল মনস্তাত্ত্বিকের কাছে যেতে হবে। আপনার মধ্যে যদি অবসাদ বৃত্তি থাকে, বুঝবেন আপনার বিশেষ কেমিক্যালস ডাউন হয়ে গেছে। এগুলো সংসারের বিভিন্ন টানাপোড়েনেও হয়, আবার ভিতর থেকেও হয়। যারা বেশি ক্রোধী হয়, সব সময় ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলে, বুঝবেন তাদের ইমোশানস্ সব এলেমেলো হয়ে আছে। তেমনি কোন ঘটনা ঘটল, আমরা চিন্তা-ভাবনা করছি, সেই চিন্তা-ভাবনার জন্যও কেমিক্যালস্ পাল্টায়। আর চিন্তা-ভাবনার জন্য প্যাশানস্ পাল্টায়। সেইজন্য যোগশাস্ত্রে খুব সুন্দর বলা হয়েছে –*বিতর্কে ভাবনে প্রতিপক্ষ ভাবনা*। যখন দেখছেন একটা ইমোশান আসছে, যদি ওটাকে কাটার দরকার হয়, তাহলে ঠিক তার উল্টো ইমোশান এনে কাটতে হবে। এই যে ইমোশানস্গুলো এগুলোও কেমিক্যাল; যেমন কেমিক্যাল তেমন চিন্তা-ভাবনা, যেমন চিন্তা-ভাবনা তেমন কেমিক্যালস্, তেমন প্যাশানস্। সেইজন্য প্যাশানস্কে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্যাশানস্ ভুতুড়ে কিছু না, প্যাশানস্ ভগবানের দেওয়া নয়। ভগবানের দেওয়া একটাই জিনিস, আপনার চৈতন্য সত্তা, যেটা তিনি নিজে। এর বাইরে যা কিছু আছে সব আমাদের নিজেদের মন দিয়ে গড়া। যে প্যাশানস্গুলো হয়, কাম, ক্রোধ এগুলোকে সামলানো যায়।

মহাভারতে ঔর্ব ঋষির কাহিনী আছে। কোন কারণে তিনি একবার রেগে গিয়ে বলে দিলেন সমস্ত সৃষ্টিকে তিনি পুড়িয়ে দেবেন। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তপস্যায় বসে গেছেন। সেই সময় তাঁর পিতৃগণরা পিতৃলোক থেকে এসে বলছেন, 'থাম বাপু, থাম'। ঔর্ব ঋষি বলছেন, 'কি করে থামব, আমি যদি থেমে যাই তাহলে সত্যের অপলাপ হবে। তার সঙ্গে আমার ভিতরে যে ক্রোধের উৎপত্তি হয়েছে, যেটা আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, এই ক্রোধাগ্নিকে বাইরে প্রকাশ না করলে আমিই এই আগুনে ভস্ম হয়ে যাব'। কাঠের আগুন যদি ইন্ধন না পায় সে কাঠকেই পুরিয়ে দেয়। কম বয়সে মানুষের এই অভিজ্ঞতা খুব ভাল হয়, একটা বয়সে যখন কামের ভাব আসে তখন মনে হয় ওই কাম আপনাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে, যেন পাগল বানিয়ে দিচ্ছে। ঔর্ব ঋষিরও একই জিনিস হচ্ছে; নিজের ক্রোধকে নিয়ে বলছেন, এই ক্রোধ আমাকেই পুড়িয়ে দেবে।

তখন পিতৃগণরা, দেবতারা বিচার করে বললেন, 'জলকে বলা হয় সৃষ্টি। তুমি তোমার ক্রোধকে সমুদ্রের জলে স্থাপিত কর; এতে তোমার সত্য রক্ষা হবে। ঔর্ব ঋষি তখন নিজের ভিতর থেকে সেই ক্রোধাগ্নিকে যোগবলে বার করে নিয়ে এলেন। তারপর সেটাকে জলে স্থাপন করে দিলেন। ওই অগ্নিকে বলা হয় বডবানল, জলের আগুন। যে প্যাশানস্গুলো হয় এগুলো সব কেমিক্যাল কিনা, এর দরকার অভিব্যক্তি। আপনার ভিতর যদি কাম আসে, তখন দরকার একটি বস্তু যেখানে এই কাম হুশ্ করে বেরোবে। যেমন ক্রোধ; স্ত্রী স্বামীর উপরে রেগে আছে, কিছু করতে পারছে না, হয়ত ছেলেকেই একটা চড় মেরে দিল। খুব প্রচলিত কথা –ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়া। ভিতরে রাগ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে, সেটাকে কারুর না কারুর উপর প্রকাশ করতেই হবে। ঔর্ব যেমন করলেন, তাকে ক্রোধ প্রকাশ করতেই হবে, প্রকাশ করলেন অন্য একটা জায়গায়।

আমাদের বেলুড় মঠে একটা খুব মজার ঘটনা মনে পড়ছে। ঘটনাটা আমাদের ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারের। একজন মহারাজ কোন এক ব্রহ্মচারীর উপর কোন কারণে রেগে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মচারীকে উনি ঠিক চিনতেন না। ভুল করে অন্য একজন ব্রহ্মচারীকে আচ্ছা করে বকেছেন। বেচারী বুঝতেই

পারলেন না, মহারাজ তাঁকে এত বকাঝকা কেন করলেন। মন খারাপ করে বেরিয়ে আসছেন, হঠাৎ আর-একজন ব্রহ্মচারী এসে বলছেন, 'আরে ওই বকুনিটা তো আমার জন্য ছিল'। যাঁর বকুনি খাওয়ার ছিল সেই ব্রহ্মচারী বলছেন, 'আমি কি গিয়ে বলে আসব যে ওটা আমি ছিলাম'? তখন এই ব্রহ্মচারী বলছেন, 'যা বকুনি খাওয়ার ছিল সেটা তো আমি হজম করে নিয়েছি, এখন আর তুমি বকুনি খাবে না, তাতে আমার কোন শান্তি হবে না; এখানেই ব্যাপারটা থাক'। খুব মজার ঘটনা। ভিতরে যখন কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো জমে, এগুলোকে কোন একটা জায়গায় প্রকাশ করে দিতে হয়। যদি ভিতরে জমে থাকে, এলেমেলো হবেই; খুব সাবধান।

উপায় হল, ঠাকুর যেটা বলছেন, ছয় রিপুকে ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। একটা জিনিস মনে রাখবেন, শরীর যদি থাকে আর আপনার আমিত্ব বোধ যদি শরীরের সঙ্গে জুড়ে থাকে; কাম, ক্রোধ, লোভাদি এই ইমোশানস্গুলো পুরো দমে থাকবে, আপনি কেন, কেউই কিছু করতে পারবেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলো নিজেদের মধ্যে সমস্যা করছে না। এই যে বিভিন্ন কেমিক্যালসের কথা বলা হল, এগুলো কেন হচ্ছে? এই যে বলা হল –কেমিক্যালস্, ভাবনা-চিন্তা আর ইমোশানস্; আপনার চিন্তা-ভাবনা শরীরের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, শরীর সংসারের সঙ্গে চলে আর সংসারে চলার জন্য ইমোশানস্ দরকার। কেমিক্যালস্ না হলে ইমোশানস্ চলবে না। দেখছেন, কেমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে। কোন একটা জায়গায় আপনাকে মারতে হবে।

মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, ওষুধ খাইয়ে কেমিক্যালসে দাবানো যায় এবং জাগানোও যায়। কাউনসিলারস যাঁরা কাউনসিলিং করেন, তাঁরা চিন্তা-ভাবনাগুলিকে ঠিক করতে বলেন। আমাদের শাস্ত্র চিন্তা-ভাবনাকে ঠিক করতে বলেন। অন্য দিকে বাড়ির লোকেরা বলবে, তোমার মধ্যে এত ক্রোধ কেন? তোমার এত লোভ কিসের? বাড়ির লোকেদের কাছে এগুলো সমস্যা। যাঁরা সমাধান দিচ্ছেন, তাঁরা হয় কেমিক্যালস্ দিয়ে দেন আর নয়তো বলেন চিন্তা-ভাবনাকে ঠিক করতে। চিন্তা-ভাবনা কিভাবে ঠিক হয়? ঠাকুর মোড় ফিরিয়ে দিতে বলছেন। ঔর্ব ঋষিকে যেমন বলা হল, এই ক্রোধকে তুমি অন্য জায়গায়, অর্থাৎ সমুদ্রে স্থাপিত কর।

আমারও এমন একটা ঘটনা কিছু ঘটেছিলা, যার জন্য তখন আমি বড়দের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কাম নিয়ে এই যে এত সমস্যা, কিভাবে এই জিনিসটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়'? জানার জন্য অনেক গুরুজনের কাছে আমি গিয়েছিলাম। ওনাদের মধ্যে অনেকে যা বলেছিলেন, এখন মনে হচ্ছে ওনারা ভুলভাল বলছিলেন, আন্দাজে কিছু একটা বলে যাচ্ছিলেন। তবে অনেকের কথা শুনে মূল যে জিনিসটা বুঝলাম, এর সঠিক উত্তর দুই প্রকার –একটা জ্ঞানমার্গের দিকে যাচ্ছে আরেকটা ভক্তিমার্গের দিকে যাচ্ছে। আমি রাম মহারাজের কথা অনেকবার বলেছি, স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজ। উনি খুব সুন্দর বলেছিলেন, 'যখন এ-ধরণের সমস্যা হয়, তখন নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলিকে বেশ সচেতন ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়'। স্বামী তুরিয়ানন্দজী মহারাজ এই জিনিসটাকে খুব পপুলারাইজ করেছিলেন। আপনি চুপচাপ দেখে যাচ্ছেন যে, আপনার মনে কামের ভাব উঠছে। তার মানে আপনি আলাদা, আপনার কামের ভাব আলাদা, আপনি আলাদা আপনার ক্রোধ আলাদা। ঔর্ব ঋষি যে ক্রোধকে সরালেন, সেখানে উনি আলাদা হয়ে গেলেন, ক্রোধ আলাদা হয়ে গেল।

কিন্তু আমি বললাম, 'যাঁদের সমস্যা হয় তাঁরা তো ফিজিক্যালি জড়িয়ে পড়েন; ঝগড়া-ঝাটি, লোভে, কামে, ক্রোধে indulged হয়ে যান'। উনি তখন বললেন, 'যাঁরা সংসারে আছেন তাঁদের উপায় নেই, কিন্তু যাঁরা সন্ন্যসী তাঁরা তো সন্ন্যাসী, তাঁরা কক্ষণ এগুলোকে প্রশ্রয় দেবেন না, নিজেকে আটকাতে হবে। আর তার সাথে সাক্ষীর মত চিন্তা-ভাবনাগুলিকে দেখে যেতে হয়'। আর-একজন খুব বড় মহারাজ, প্রতিষ্ঠিত মহারাজ, উনি ওনার নাম বলতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি খুব সুন্দর বলেছিলেন। এক সময় ওনার নিজের এই সমস্যা হয়েছিল, নিজের অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন। আমি বললাম, 'আপনি

মহারাজ বুঝলেন কি করে'? বলছিলেন, 'নিজের ভিতর একটা ছটফটানি হয়, তখন বুঝেছি এটা ওই সমস্যা। সাধু-সন্ন্যাসীদের এটা হয়'। উনি তখন চব্বিশ ঘণ্টা ঠাকুর, মাকে হৃদয়ে চিন্তন করতে লাগলেন। জেগে আছেন, কাজ করছেন, কিন্তু মনটা সব সময় ওখানে; শুয়ে আছেন মন ওখানে। এক মাস ধরে উনি এভাবে ঠাকুর, মায়ের ভাবে ছিলেন। তারপর যেমনটি তোড় এসেছিল, তেমনি চলে গেল। এই বলে বললেন, 'জীবনে আর কোন দিন হয়নি'। আমি বললাম, 'সাধারণ লোক এ-জিনিস কিভাবে করবে? সাধারণ লোক দু-মিনিট জপধ্যান করতে পারে না'। উনি বললেন, 'দেখ, যাদের এ-ধরণের সমস্যা আসে, তার এই রকমই না করবে। যাদের কাছে আরও দশটা জিনিস আছে, তার সাথে এটাও আছে, তাদের জন্য এই উপায় নয়'। এটা আমি আপনাদের প্রত্যক্ষ বর্ণনা করলাম, যেটা আমি আমার গুরুজনদের কাছে শুনেছি; কিভাবে জ্ঞানমার্গ –লক্ষ্য কর, জিনিসটাকে দেখতে থাকা। ভক্তিমার্গ –ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছি।

খ্রীশ্চানদের মধ্যে এটা এক বিরাট বড় সমস্যা। কারণ ক্যাথলিকদের মধ্যে বিয়ে হয় না। কাম ভাব এলে তারা পাগলের মত হয়ে প্রার্থনা করে, যীশু ক্ষমা কর, ইত্যাদি করে। ঠাকুর বলছেন, মোড় ফিরিয়ে দাও, আগেও আমরা এই ঘটনা পেয়েছি। আজকে বিস্তারে আলোচনা করলাম। মোর ফিরিয়ে দাও –সমস্ত কিছু, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি। প্রথম হল, আপনি আগে বুঝুন আপনার এই সমস্যাটা আছে। একটা ঘটনা আগেও বলেছিলাম।

নরেন্দ্রপুরে একটা ছেলে পড়ত, ছেলেটি সব পরীক্ষায় ফেল। মা এসে খুব কান্নকাটি করছে, ছেলেটাও কান্নাকাটি করছে। ওখানে মহারাজ যিনি ছিলেন, খুব বিচক্ষণ মহারাজ। তিনি বুঝতে পারছেন যে ছেলেটি কিন্তু কাঁদছে না, নাটক করছে। পরে একা পেয়ে ছেলেটিকে ধরে বলছেন, 'হ্যাঁরে তুই তো উত্তরগুলো সব জানিস, তুই যে কাঁদছিলি ওটা তো তোর ড্রামা ছিল'। ছেলেটি বুঝে গেছে যে ধরা পড়ে গেছি। 'তুই ফেল করলি কেন'? 'আমি এখানে হস্টেলে থেকে পড়তে চাই না। আমি হস্টেলে থাকতে চাই না, আমি বাড়িতে থাকতে চাই, সেইজন্য জেনেশুনে আমি ফেল করেছি'। 'তাহলে তুই মায়ের সঙ্গে কাঁদছিলি কেন'? 'ওটা করতে হয়, ওটা না করলে মা রেগে যাবে, সেইজন্য কাঁদছিলাম'। মহারাজের কাছে ঘটনাটা শুনছিলাম, বলছেন, ক্লাশ ফাইভের ছেলে, কি বুদ্ধি!

আগে বিচার করতে হয়, এরা আমার কাছে সমস্যা কিনা। পরীক্ষায় পাশ করতে হবে এটা সমস্যা কিনা। ছেলেটার কাছে সমস্যা না, ও তো ফেল করতেই চাইছে। সমাজে যাঁরা আছেন, সংসারে যাঁরা আছেন, তাঁরা তো কাম ক্রোধ নিয়ে থাকতে চাইছেন। কাম, ক্রোধ রিপুগুলি যদি না থাকে সমাজ চলবে না, সংসার চলবে না। আপনি বলবেন, 'আমি যখন আসতে বলব তখন আসবে', সেটা হয় না। একটা কুকুর এনে পুষেছেন, কুকুরটি আপনার কথায় ওঠে বসে ঠিকই; কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের মতও করে ফেলে। ষড়রিপু মাঝে মাঝে নিজের মতও করে বসে। সেইজন্য কাম, ক্রোধ যদি থাকে, আপনাকে বুঝতে হবে, একটা সময় থেকে এগুলো ঝামেলা করবে। তা নাহলে যোগীর মত, সন্ন্যাসীর মত দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করতে হয়। ঠাকুর এটাকেই বলছেন, মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়। কিভাবে?

আত্মার সহিত রমণ করা, এই কামনা।

এটা বাস্তবিক হয়। এখানে বলে দিই, আপনারা যাঁরা এই ক্লাশ শুনছেন, আপনারা এই জিনিসটা বুঝতেও পারবেন না, পালন করতেও পারবেন না; কারণ এখনও এটা আপনার কাছে সমস্যা মনে হচ্ছে না। কিন্তু যদি এটা আপনার কাছে সমস্যা হয়, আর আপনি যদি সত্যিই আধ্যাত্মিক পথের পথিক হয়ে থাকেন, যোগী হয়ে থাকেন, তখন ওই ভাব –আত্মার সাথে রমণ। যেমন মীরাবাঈ ছিলেন, নিজেকে কৃষ্ণের কাছে বিলিয়ে দিয়েছেন। ঠিক তেমন বলা, আমি তো আত্মার সঙ্গে রমণ করব। মা সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গেল; মা সীতা রাবণকে বলছেন, 'তুমি এক শৃগাল হয়ে সিংহীর সাথে রমণ করতে চাইছ? সে কি কখন সম্ভব'? এই ভাবটাকে জাগিয়ে নেওয়া –আমি সিংহ, মেয়েরা যাঁরা

শুনছেন, তাঁরা মনে করবেন আমি সিংহী, আমি শৃগালের সাথে রমণ করব না। যার তার সঙ্গে রমণ করব না। কার সঙ্গে করব? আত্মার সঙ্গে রমণ করব। রমণ অবশ্যই করব, পুরোদমে করব, কিন্তু করব আত্মার সঙ্গে।

আমি প্রায়ই ক্লাশে বলি, নিজেকে মনে করাতে হয় –I am the best, I want the best। নিজের আত্মসম্মানকে যদি জাগিয়ে রাখেন, নিজের অহম্‌কে যদি জাগিয়ে রাখেন; এখানে আপনি ঠাকুরের পথে চলে এসেছেন, হ্যাঁ রমণ করব, আমার ভিতরে প্রচুর কাম; কিন্তু কার সাথে? আমার অন্তরাত্মার সাথে। একটা মজার ঘটনা বলি, আমি জানিও না যে এটা কোন মজার না সিরিয়াস, কিন্তু আমার সামনে ঘটেছে। লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণনা আছে, ঠাকুর সুপুরি খেতেন। একজন তান্ত্রিক ঠাকুরকে বলল, 'সুপুরি খেও না, কাম বৃদ্ধি হবে'। ঠাকুর তারপর থেকে সুপুরি খেতেন না। আমাদের এক মহারাজ ছিলেন, উনি খুব হিউমারাস ছিলেন। যে কোন কথাকে উনি এমন হাস্যরস মিশিয়ে বলতেন যে বোঝা মুশকিল হত উনি এটা সিরিয়াসলি বলছেন নাকি মজা করে বলছেন।

একবার কি একটা কথা হতে গিয়ে উনি বলছেন, 'আরে ভাই সুপুরির কথা ছাড়, সুপুরি খেলে আমার আর কোন দিন কাম বৃদ্ধি হবে না, কারণ আমার শরীরে এত বেশি কাম রয়েছে যে, আরও কাম বাড়লে আর-একটা শরীর ধারণ করতে হবে'। তখন আমাদের বয়স কম ছিল, হাসিতে লুটোপুটি খেতে আরম্ভ করে দিলাম। উনি কি বলতে চাইছিলেন সত্যি আমার জানা নেই। সাধুরা অনেক সময় হাসি-মজা করে কিছু কথা বলেন বোঝা যায় না। যিনি আধ্যাত্মিক পথে আছেন, তিনি যদি বলেন, বাচ্চা যেমন বলে আমার মাকে চাই, সেই রকম যদি বলেন, আমার কাম ভাব আছে আমি আত্মার সঙ্গে রমণ করব; হয়ে গেল। দুটো জিনিস –এই কাম-ক্রোধাদি সমস্ত ভাবগুলি আসে শরীর বোধের জন্য। এখন আমার দেহবোধ আছে, কিন্তু উচ্চ আদর্শ আছে, তখন নিজের এই রিপুগুলির আদর্শটাকে একটু উঁচু করে দিতে হয়। মারিত গণ্ডার লুটিত ভাণ্ডার, রমণ যদি করতে হয় আত্মার সঙ্গে করব। যারা ঈশ্বরের পথে আমাকে বাধা দেয়, তাদের উপর ক্রোধ করব। ক্রোধ কার উপরে? আমি জপধ্যান করতে পারছি না, নিজের উপর ক্রোধ।

যারা ঈশ্বরের পথে বাধা দেয় তাদের উপর ক্রোধ। তাঁকে পাবার লোভ। 'আমার আমার' যদি করতে হয়, তবে তাঁকে লয়ে। যেমন –আমার কৃষ্ণ, আমার রাম। যদি অহংকার করতে হয় তো বিভীষণের মতো –আমি রামকে প্রণাম করেছি –এ-মাথা আর কারু কাছে অবনত করব না।

ঈর্ষাকে নিয়ে ঠাকুর এখানে বলেননি। ঈর্ষা কি রকমের? –ও বুঝি আমার থেকে এগিয়ে গেল। ঠাকুরও এক জায়গায় বলছেন, ভাবলুম ও বুঝি আমার থেকে এগিয়ে গেছে। ধর্ম জীবনে আমার থেকে বেশি যেন কেউ না এগোতে পারে –এই ভাবনা থেকে মানুষ সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। আগে বুঝে নিতে হয়, নিজের ভিতরে কি কি দুর্বলতা আছে। যদি আপনি একদিকে মনে করেন যে, সংসার ভাব ধরে রাখবেন; আবার অন্য দিকে দেহে আত্মবোধ জাগিয়ে রাখবেন, আর কাম-ক্রোধকে কাটিয়ে দেবেন; মুশকিল আছে। কিন্তু যদি আপনার আগে থেকে জীবনে একটা আদর্শ থেকে থাকে, যেমন স্কুল-কলেজে এমন একটা ট্রেনিং পেয়ে এসেছে যে, তার কাছে মূল্যবোধ, আদর্শ, এই জিনিসগুলো একটা বড় সংস্কার হয়ে তৈরী হয়ে গেছে। কারুর সন্তান কলেজে পড়তে পড়তে হয়ত প্রেম করছে, বাবা-মা তাকে বলবেন –বাবা তুমি আগে ডিগ্রিটা পেয়ে নাও, নিজের পায়ে দাঁড়াও, তারপর তুমি বিয়ে করে নিও; আমরা কেউ আপত্তি করব না; এটা একটা আদর্শ। জীবনে আদর্শ নিয়ে আসা। তাই না, আবার অনেকে কলেজে পড়তে পড়তে ভালবেসে বিয়েও করে নেয়। আমরা সেটাতে যাচ্ছি না, একটা জেনারেল যে সিদ্ধান্ত সেটাকে নিয়ে বলছি। কি করবেন? বুঝে গেলেন যখন আমার এই সমস্যা আছে –এটাই। তখন বলছেন, আমার সোনার হরিণ চাই, ঠিক তেমনি আমার আত্মার সঙ্গে রমণ চাই, তার নিচে আমার চলবে না। তখন ব্রাহ্মভক্ত বলছেন।

ব্রাহ্মভক্ত –তিনি যদি সব করাচ্ছেন, তাহলে আমি পাপের জন্য দায়ী নই? এবার পাপ নিয়ে শুরু করছেন।

এই প্রশ্ন অনেক পুরনো প্রশ্ন, আমাদের সবারই মনে এই প্রশ্ন আগেও এসেছে, এখনও আসে, পরেও আসবে। সকলই তোমারি ইচ্ছা যদি হয়, তাহলে পাপের জন্য দায়ী কে? এই প্রসঙ্গটা আমরা আগে আগেও আলোচনা করেছি। তা সত্ত্বেও যখন প্রসঙ্গটা পুনরায় আসে, তখন সংক্ষেপে একটু বলতে হয়, কারণ সবাই তো ধৈর্য ধরে সব ক্লাশগুলো শোনেন না।

দুটি জিনিস –প্রথম হল পাপকে বিভিন্ন ধর্ম কিভাবে দেখে। দ্বিতীয় আমরা দায়ী কিনা। পাপ নিয়ে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। ধর্ম দুই প্রকার –একটা এ্যব্রাহামিক ধর্ম, আর-একটা হল ভারতীয় ধর্ম। মাঝখানে পার্সিদের ধর্ম আছে, জুরুষ্ট্রিয়ান ধর্ম; এটা যেন মাঝামাঝারি। এ্যব্রাহামিক ধর্ম হল –খ্রীশ্চানিটি, জুদাইজিম্ আর ইসলাম। এই তিনটি ধর্মের মূল হল, তিনি কাউকে বেছে নেন, কেন বাছেন সেটা পরিষ্কার নেই; তাঁকে তিনি কিছু আদেশ করেন। সেখান থেকে একটা দল দাঁড়িয়ে যায়। জুহুদিদের তাই, খ্রীশ্চনদের তাই, ইসলামেও তাই। এদের কাছে ঈশ্বরীয় আদেশ পালন করা, এটাই ধর্ম। আদেশের উল্লঙ্ঘন –এতে যে শুধু শাস্তি পেতে হবে তা না, এটা একটা পাপ। কি করে জানব এটা ঈশ্বরীয় আদেশ? জুহুদিদের যে ধর্মগ্রন্থ, ওল্ড টেস্টামেন্টে পরিষ্কার, বাইবেল কনফিউজি, কারণ নিউ টেস্টামেন্টে সেই রকম ঈশ্বরীয় আদেশ বলে বেশি কিছু নেই। ওল্ড টেস্টামেন্ট তাঁরা বিরোধিতা করলেও, ওর অনেক কিছু জিনিস নেন। ফলে চার্চ হয়ে গেল তাদের সব কিছু। চার্চ যখন যেমনটা বলে তখন তেমনটাই চলে। খ্রীশ্চানিটিতে এটা বিরাট একটা কনফিউজিং জিনিস। যারা চার্চকে মানে না, যেমন প্রোটেস্টান্টরা মানে না, ওদের আবার নিজস্ব হায়ারারকি আছে, তাঁরা যেমনটি বলেন, তেমনটি করেন। কিন্তু ওরা মূল যেটা ধরবেন সেটা ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট থেকে। ইসলামের কাছে জিনিসটা সহজ, কোরান শরিফে যা কিছু আছে সেটাই ওদের শেষ কথা –এটা করলে ঠিক, এটা না করলে পাপ। পূণ্য বলে কিছু নেই, করলে ঠিক, না করলে পাপ।

হিন্দুরা এভাবে চলে না। হিন্দুরা মনে করে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান; আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য একটাই ঈশ্বরের কাছে ফেরত যাওয়া; কারণ আমরা সবাই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি, ঈশ্বরেই ফেরত যাব। কিন্তু হিন্দুদের ঈশ্বর কোন কিছুতে দখল দেন না। অন্য দিকে এ্যব্রাহামিক ধর্মে ঈশ্বর দখল দেন; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষমতাবান, ওনার আদেশ না মানলে নরকে স্থান হবে। কিন্তু যিনি সর্বক্ষমতাবান তিনি কাউকে কেন পাপে লিপ্ত হতে দেবেন, সেটা পরিষ্কার নেই। ওনারা একটা উত্তর দেন ঠিকই, কিন্তু খুব গভীরে যদি যান তখন এই জিনিসটাকে ওর পরিষ্কার করতে পারে না। হিন্দুদের যে ঠিক ঠিক ধর্ম, বিশেষ করে বেদ, উপনিষদ, গীতা থেকে যে ধর্ম আসছে; সেখানে বারবার বলছেন, ঈশ্বর হলেন বায়ুর মত, ঈশ্বর সূর্যের মত, ঈশ্বর আলোর মত। তোমার একটা স্বাধীন সত্তা রয়েছে, তুমি যেমনটি করবে তেমনটি তোমার কর্ম হবে, যেমনটি চিন্তা-ভাবনা করবে তেমনটি তোমার জ্ঞান হবে। তোমার যেমন কর্ম, যেমন জ্ঞান হবে, এই কৃতকর্ম এবং লব্ধ জ্ঞানই তেমন তেমন তোমাকে ধীরে ধীরে সেই ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে।

তাহলে আমি কোথা থেকে এলাম? কেন এলাম? হিন্দুরা বলবে এর উত্তর আমার জানা নেই, আমি এটুকু জানি আমি আছি। ডেকার্ডের খুব নামকরা কথা –I know, therefor, I exist। এখানে উলটো, I exist, this I know; এখান থেকেই শুরু। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখতে গিয়ে প্রথমেই তিনি এই একটি কথা দিয়ে শুরু করলেন –*যুস্মদ্ অস্মদ্*; আমি আছি আর জগৎ আছে। আমি আছি, জগৎ আছে আমার কাছে পরিষ্কার। এটাকে কেউ না করতে পারবে না, কারণ এটাকে যদি না করে দেওয়া হয়, তাহলে আমার অস্তিত্বই থাকবে না, কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না, এমনকি ভগবানেরও অস্তিত্ব থাকবে না। এই সত্তাকে যদি একবার গ্রহণ করে নেওয়া যায়, তখন বাকিটা নিজে

থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন ওখানে মিছিমিছি জিজ্ঞেস করা, আমি কোথা থেকে এলাম, কেন এলাম; এসব প্রশ্নের উত্তর কোন ধর্মের কাছেই নেই।

ভগবান বুদ্ধকে এসব প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন –অত শত জেনে তোমার কি হবে? তীর এসে লেগেছে, এখন তুমি তার তীরটা বার করে আগে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে, নাকি পঞ্চাশ খানা প্রশ্ন করবে –তীর কোন দিক থেকে এসেছিল, কে তীরটা বানিয়েছিল, কে ছুড়েছিল, এসব প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। ঠাকুরও বলছেন, জো সো করে আগে তাঁর ভক্তি লাভ কর। আমার উত্তর জানা নেই, তবে এটা জানি যে আমি সমস্যায় আছি। আর আমাকে যেতে হবে তাঁর কাছে, কারণ ঋষিরা বলে দিয়ে গেছেন ওটাই আমার সত্তা, কারণ তাঁরা এই জিনিসটা প্রত্যক্ষ করেছেন।

তাহলে আমি যেতে পারছি না কেন? আরে ভাই তুমি এতদিন উল্টো পথে হাঁটছিলে, উলটো কাজ করছিলে বলে এতদিন যেতে পারছিলে না। যে অর্থে এ্যব্রাহিমিক ধর্মে পাপ হয়, সেই অর্থে হিন্দুদের পাপ বলে কিছু হয় না। আমাদের পাপ শব্দ আছে, কিন্তু তার অর্থ হল দোষ, দোষটাই পাপ। ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়া, মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া, এটাই পূণ্য। যে কোন জিনিস যেটা আমাদের ঈশ্বরের দিকে যেতে বাধা দেয়, মুক্তির পথে বাধা দেয়, সেটাই পাপ, এর বাইরে আমাদের পাপের অন্য কোন পরিভাষা নেই। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, মা রান্না করছেন, বাচ্চাকে চুষণি দিয়ে রেখেছেন, বাচ্চা চুষণি নিয়ে মজায় আছে। ওদিকে মা নিশ্চিন্ত মনে রান্না করে যাচ্ছেন। হঠাৎ বাচ্চা চুষণি ফেলে দিয়ে 'মা' 'মা' চিৎকার করে ডাক ছেড়েছে। মা বাচ্চার ওই ডাক শুনে হুড়মুড় করে ভাতের হাড়ি নামিয়ে বাচ্চার কাছে দৌড়ে এলেন।

ইউটিউব ও সোস্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে অনেকে ধর্মের কথা জানছেন, অনেকে নিজের ভাব প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছেন। ধর্মের কথা শোনার পর অনেকে বলেন, 'আগামী জন্মে আমি সন্ন্যাসী হবই হব'। কি করে আপনি সন্ন্যাসী হবেন? এই জন্মেই কি আপনার মধ্যে ত্যাগের ভাব এসেছে? সন্ন্যাসীদের বাইরেরটা গেরুয়া, কিন্তু ত্যাগের ভাবটা তো ভিতরে। দুনিয়ে জুড়ে চারিদিকে শুধু সমস্যা, চারিদিকে শুধু হতাশার ছবি। সব কিছু যার ঠিকঠাক চলছে; সুন্দর স্বাস্থ্য, শরীর সদা রোগমুক্ত, পরিবারে স্বাচ্ছল্য, টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই, সুখ আর শান্তিতে সমৃদ্ধ সংসার, এরপরেও বলছে, আমার সংসার লাগবে না। এই ভাবটা যখন আসে, মানুষ তখন এগোতে শুরু করে। সংসারের এই জিনিসগুলো চুষণি। ভগবান যখন দেখেন এই চুষণি দিয়ে চলছে না, তিনি আর-একটা ভাল চুষণি দিয়ে দেন বা আর-একটা খেলনা দিয়ে দেন। যারা বলে আমি আর এগুলো চাইছি না, আসলে এগুলো কিছু না, এখন ওর একটা নূতন খেলনা দরকার। ভিতর থেকে যখন সত্যিকারের ত্যাগের ভাব আসে, তখন একটা একটা করে ভগবান দিতে থাকবেন, আর সেও বলে যাবে –আমার লাগবে না।

এই যে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করা পাপ, বা ভুল পথে যাওয়া পাপ বলা হচ্ছে; কিন্তু মূল জিনিসটা হল পাপ শব্দটি আছে। আপনি ওটাকে দোষ বলুন, পাপ বলুন, কোন অসুবিধা নেই। এই পাপের জন্য দায়ী কে? এই প্রশ্নই এ্যব্রাহিমিক ধর্মে গিয়ে বিরাট বড় সমস্যা তৈরী করে দেয়। কারণ স্পিরিট বা চেতনা, এটা ভগবান দিয়েছেন। তাহলে আমি কেন ভুল পথে যাচ্ছি? এই প্রশ্নের কোন উত্তর ওদের ধর্মের কারুর কাছে নেই। তার সঙ্গে ওদের আরেকটা বড় সমস্যা হল, ওদের কাছে এই একটাই জন্ম। এই একটি জন্মে মানুষ এত ভুল নিয়ে কি করে জন্ম নিচ্ছে? অন্য ধর্মে গিয়ে কেন তাকে জন্ম নিতে হচ্ছে? হিন্দুদের কাছে এই সমস্যা নেই –এই ক্ষেত্রে হিন্দুদের মূল হল, মানুষের কর্ম। চুষণির কথা বলা হল, কিন্তু আমি যখন আমার আধারে চলে আসছি, আমি যে দোষ করলাম, এর কি সাজা হবে? হ্যাঁ হবে, অবশ্যই হবে। যে কোন কর্ম করলে সেই কর্মের ফলটা অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবেই লাগবে। পাপের সাজা হয় না, পূণ্যের ফল হয় না। তাহলে কি হয়? কর্মফল হয়। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে, বিষ খেলে মরবে। আবার আরসেনিক খেলে ধীরে ধীরে মরবে,

সায়ানাইট খেলে তাড়াতাড়ি মরবে। কিছু সাপ কামড়ালে পাঁচ ঘণ্টায় মরে, কিছু সাপ কামড়ালে আধ ঘণ্টায় মরে।

আর ভালটা ভাল, আপনাকে কে বলেছে? আপনার মন বলেছে বলে আপনি বলছেন, এটা ভাল। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন আমাদের অনেক কিছুকে মনে হত ভাল। আজকে বড় হয়ে মনে হচ্ছে ওগুলো বিষ ছিল। আমাদের শরীরে যৌবনের আবির্ভাব যখন হল, তখন অপরের প্রতি যে আকর্ষণ কত ভাল মনে হত। এখন মনে হচ্ছে, কি সাংঘাতিক জিনিস, অপরের প্রতি এই আকর্ষণ আমাকে শেষ করে দেবে। তার মানে, আমাদের মন বলে দিচ্ছে ভাল কোনটা, মন্দ কোনটা। ঠিক তেমনি ফলের ব্যপারেও আপনি ঠিক করেন, ভাল কি, মন্দ কি। কর্মফল অন্ধ, ব্যাট দিয়ে জোরে মারলে বল বেশি দূরে যাবে, কর্ম যেমন করবেন ফল তেমন হবে। যেটাকে আপনি ভাল মনে করেন, সেই অনুরূপ কর্ম করলে ভাল ফল হবে, সেই অনুরূপ বাজে কর্ম করলে বাজে ফল হবে। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তো এ-জিনিস নিতে পারে না, সেইজন্য পরে পরে যে স্মৃতিগুলি এলো, মনুস্মৃতি থেকে শুরু করে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, পরাশর স্মৃতি, রঘুনন্দন স্মৃতি এই রকম দেশে শত শত যে স্মৃতি এলো; এই স্মৃতিগুলো বানিয়ে দিলেন এটা পাপ, সেটা পাপ। যেমন নদীতে স্নান করার সময় কেউ যদি মুত্র বিসর্জন করে এটা পাপ, মূলতঃ এটা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়, এটা একটা ethical জিনিস, কিন্তু নিয়ে গেলেন পাপের স্তরে যাতে মানুষ ভয় পায়, কারণ মানুষ পাপকে ভয় পায়। কিন্তু এ্যব্রাহামিক ধর্মে যে অর্থে পাপ হয়, এটা সেই অর্থে পাপ হয় না। তবে কি হয়, এই যে দোষ অর্থে বলা হল, যার জন্য এনারা নিয়ে এলেন প্রায়শ্চিত্ত কর্ম। অজান্তায় যে দোষযুক্ত কর্ম হয়ে গেছে, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম করলে সেগুলো ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক ঠিক দোষ কোথায় হবে আমি কি করে জানব?

আপনি বলতে পারেন, আমি স্মৃতিশাস্ত্র পড়িনি, বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ আমি পড়িনি, আমি এখন জানতে চাইছি, আমি একটা কর্ম করতে ওই কর্ম করলে আমার পাপ হবে কিনা। এই ব্যাপারে আমাদের শাস্ত্রে খুব পরিষ্কার রাগ আর দ্বেষ এই দুটো জিনিসের কথা বলা হয়। রাগ হল অনুরাগ আর দ্বেষ হল বিদ্বেষ। মন দিয়ে, বাণী দিয়ে, শরীর দিয়ে কোন কর্ম যদি আপনি করেন, এই কর্ম যদি কামনা প্রেরিত হয় বা দ্বেষ প্রেরিত হয়, এই কর্ম পাপকর্ম। এমন কি আপনি যদি এই ভাব নিয়ে জপধ্যান করেন, ভগবান আমার উপর প্রসন্ন হবেন, এটাও পাপ। আপনি পাঁচ টাকার সন্দেশ কিনে কালীঘাটে পূজা দিতে যাচ্ছেন এই কামনা করে যে, জয় মা, আমার এই কাজটা যেন হয়ে যায়; এটাও পাপ। তবে পাপের যে তারতম্য হয়, এটাও সেই আরসেনিক আর সায়নাইটের তফাৎ। এই পাপটা ছোট পাপ। এসব কথা শুনে আমাদের আতঙ্ক লাগে। কিন্তু এটাই সত্য।

গীতাতে ভগবান বলছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, সেখানে আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, শুভকর্ম উচ্চতর দৃষ্টিতে এটাও অধর্ম, এটাও বন্ধন, সত্ত্বগুণের বন্ধন। দুর্গাপূজা করে বলছেন, আমাদের প্যাণ্ডেল, আমাদের আলোকসজ্জা ফাটাফাটি হয়েছে –এটাও পাপ। রাগ আর দ্বেষ প্রেরিত যে কোন কর্ম, যে কোন চিন্তা, যে কোন বচন, এটা পাপ। আর-একটা কি হয়, যেমন ধরুন একজন খুনী কিংবা মিথ্যাবাদী, মিথ্যা কথা বলে বলে এমন হয়ে গেছে যে, মিথ্যা বলাটা স্বভাবেই হয়ে গেছে। সেখানে ওর আর রাগ দ্বেষের প্রশ্নই নেই, অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, এখানে এই কথাগুলো তাঁদের জন্যই বলা, যাঁরা একটু ধর্মপথে চলছেন।

ভাল করে নিজেকে দেখুন, যে কাজ করতে যাচ্ছেন, সেখানে আপনার কোন কামনা আছে কিনা। আপনি বলবেন, কেন, যখন স্কুল কলেজে পড়তাম তখন তো কামনা থাকত ভাল রেজাল্ট করব। আপনি একবার ভেবে দেখুন, আপনার পূর্বপুরুষরা এভাবে পড়াশোনা করতেন না। আপনার পূর্বপুরুষরা যখন ঋষিদের আশ্রমে অধ্যয়ন করতে যেতেন, তখন তাঁদের এই কামনা থাকত না যে, আমি বেদ পড়ে নেব, সংস্কৃত শিখে নেব, আমার চাকরি হবে। তখন ছিল –*ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ*। সারাটা জীবন

তাঁদের এটাই ছিল তপস্যা। পড়াশোনা করা, এটাও তোমার তপস্যা। তাঁরা কোন লোভের বশবর্তি হয়ে অধ্যয়ন করতে যেতেন না, সেইজন্য তাঁরা মহাপুরুষ ছিলেন। আমাদের যে এখন কত পতন হয়ে গেছে, আমরা যে কত নিচে নেমে এসেছি, আমরা নিজেরাও জানি না। এটাকে আমাদের মাথায় বসিয়ে নিতে হবে, যে কোন কর্ম যদি রাগ আর দ্বেষ প্রেরিত হয়, এটা পাপ।

অনেক আগেকার কথা, তখন বয়স কম ছিল, আমার যিনি আচার্য ছিলেন তাঁকে যখন কিছু বলতাম, উনি খুব মিষ্টি করে বলতেন, অতটুকু তোমার চালাকি। এখন ভাবলে হাসি পায়। আমরা অপরের সামনে খারাপ কিছু হোক চাই না, একটা মিষ্টি করে কিছু বললাম, মহারাজ, 'আপনি নিশ্চয় এখন ব্যস্ত আছেন, আমি তাহলে আজ আসি'। আসলে আমাকে কোথাও যেতে হবে, আমিও ভদ্র ভাবে বলছি। উনি ধরে ফেলতেন, আপনজন বলে কিছু বলতেন না, মিষ্টি করে বলে দিলেন –'অতটুকু তোমার চালাকি'। তুমি পরিষ্কার করে বল না যে, আমাকে এবার আসতে হবে। এই যে কথা বলছি, এটা যে আমার ভদ্র স্বভাব, মধুর স্বভাবশতঃ বলছি তা না, কামনা প্রেরিত; উনি যেন আমাকে ভাল মনে করেন, আমি আমার নিজের কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি না। এটাও কামনা, এটাও পাপ; ছোট পাপ।

যে কোন কামনা, হে ঠাকুর আমার মুক্তি হোক; এটাও একটা কামনা; কোন দিন মুক্তি হবে না। হে ঠাকুর আমি এত জপধ্যান করেছি, আমার বিপদ কাটিয়ে দাও, আমার অমুকটা যেন হয়ে যায়। শ্রীশ্রীমা খুব সুন্দর বলছেন, ঠাকুর কি আলু-পটল যে পয়সা দিয়ে কিনে নেওয়া যাবে, জপধ্যান করলে বলে তুমি ঠাকুরকে পেয়ে যাবে? আমরা এগুলো অল্প-বিস্তর সবাই করি, কামনা প্রেরিত ও দ্বেষ প্রেরিত না হয়ে কায়োমনবাক্যে কাজ করাটা অভ্যাসে নামানো খুব মুশকিল। এই যে এতগুলো কথা বলা হল, এগুলোকে একটু ভেবে দেখবেন, পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রাজযোগে খুব সুন্দর বলছেন, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আর অভিনেবেশ, এই পাঁচ রকমের ক্লেশ। আমি নিজেকে আত্মা না ভেবে 'আমি শরীর' মনে করছি, 'আমি মন' মনে করছি –এটাই অবিদ্যা। অস্মিতা –যেখান চৈতন্য আর জড়ের সংযোগ। রাগ আর দ্বেষের কথা বলা হল। তার সঙ্গে অভিনিবেশ, বেঁচে থাকার ইচ্ছা। বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাও যদি রাগ দ্বেষ প্রেরিত হয়, গোলমাল তো একটু হবেই। সাধু-সন্ন্যাসীদের বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই, আবার মরে যাবারও কোন ইচ্ছে নেই। বেঁচে আছি, শরীর আছে, শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য খেতে হবে, এই ইচ্ছাটা ঠিক ইচ্ছার মধ্যে পড়ে না। এটা হল শরীরের যে ধর্ম, এই ধর্মকে রক্ষা করার জন্য শরীরের জন্য যা যা দরকার দিয়ে দিলাম। শেষ কথা হল মনের অবস্থা।

আগে আগে একটা গল্প বলেছি। গল্পটা এত সুন্দর গল্প যে, যতবার শুনবেন ততবারই ভাল। যদি পাপকর্ম কি বুঝতে হয়, এই গল্পটা দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে। দুজন খ্রীশ্চান ফাদার এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যাচ্ছেন। নদীর তীরে এসে দেখছেন, একজন যুবতীর পায়ে কোন ভাবে চোট লেগেছে। নদী পেরোতে পারছে না বলে কাঁদছে। একজন ফাদার এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার। সব শুনলেন। তিনি মেয়েটিকে কাঁধে বসিয়ে নদী পার করিয়ে দিলেন। নামিয়ে দিয়ে ফাদার দুজন চার্চে চলে এসেছেন। সন্ধ্যে হল, রাত হল। রাতের খাওয়ার পর দুই ফাদার পায়চারি করছেন। পায়চারি করতে করতে অন্য ফাদার বলছেন, 'ফাদার আমার মনে কিন্তু শান্তি নেই'। 'কেন'? 'আপনি একজন খ্রীশ্চান ফাদার হয়ে, একজন সন্ন্যাসী হয়ে একটা যুবতী মেয়েকে কাঁধে বসালেন'? এই ফাদার শুনে হেসে বলছেন, 'আমি তো মেয়েটিকে ওখানেই কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে এসেছি, তুমি এখনও মেয়েটিকে বয়ে যাচ্ছ'। খুব সূক্ষ্ম পয়েন্ট। আদপেই কি এই কাজটা ঠিক ছিল?

একবার একজন মহারাজের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন, দ্বিতীয় যে ফাদার তিনিই ঠিক। আমি কিছু বললাম না, কি দরকার, নিজের নিজের মন, নিজের নিজের মত। কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের যেটা

ধর্ম, শাস্ত্র যে জায়গাতে চলেন, অন্তর্যামী যেখানে শেষ বিচারক, সেখানে কোন কাজ করতে গিয়ে যদি সেই কাজের পিছনে কোন কামনা-বাসনা না থাকে, রাগ-দ্বেষ যদি না থাকে তাহলে কোন মতেই সেই কাজে পাপ হবে না। আপনার কোন কামনা নেই, আপনি একটা কাজ করেছেন, কিন্তু কাজের তো একটা ফল হবে। যেমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এত লোক মারা গেল, এত বড় একটা নরসংহার হল, তার জন্য তো একটা পাপ হবে। গান্ধারী অভিশাপ দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মাথা পেতে নিয়ে নিলেন। তিনি নিষ্কাম ভাবে যুদ্ধ করিয়েছেন, নিষ্কাম ভাবে অভিশাপটাও নিয়ে নিলেন –এই হল পয়েন্ট।

এই যে ঠাকুর হেসে বলছেন, দুর্যোধন ওই কথা বলেছিল; যদি আপনি ঈশ্বরকে মানেন, আপনি হিন্দু, আপনি খ্রীশ্চান বা মুসলমান নন, তাহলে আপনাকে মানতে হবে ঈশ্বর আপনার অন্তর্যামী। ঈশ্বর বাইরের কোন নিয়ন্তা নন, তিনি ভিতর-নিয়ন্তা। তাহলে তিনি করাচ্ছেন, সুখ-দুঃখ তিনিই ভোগ করছেন, আপনি কোথায় মাঝখান থেকে আসছেন। এই হল সমস্যা, আমরা যখন কথা বলি, একটা জিনিসের ব্যাপারে ভারতবাসীদের নিয়ে সত্যিকারের খুব দুঃখ হয়, আমরা যে কোন বিষয়ে এত ফাঁপা, চিন্তা-ভাবনার কথা বলছি না, আমি খুব সাধারণ কথা বলছি। একজন বাঙালী তার বাংলা জ্ঞান, বাংলা সাহিত্যের জ্ঞান, একজন হিন্দিভাষী তার হিন্দি সাহিত্যের জ্ঞান, এত ফাঁপা যে দেখে আতঙ্ক লাগে। এখন ইউটিউব হওয়াতে সবাই এখন ধর্মের কথা বলে যাচ্ছেন। ওনাদের কথা একবার শুনুন, সাধু সন্ন্যাসীরা বলছেন, কিন্তু এত শ্যালো, শুনে মনটা আপনার খারাপ হয়ে যাবে। এই হল হিন্দুদের বিরাট সমস্যা। বিদেশিরা যেটাকে ধরে একেবারে মরণ কামড় দিয়ে ধরে।

সহজ কথা –কর্তা যিনি ভোক্তাও তিনিই হন, একেবারে সহজ যুক্তি। যার স্বাধীনতা রয়েছে, তিনিই কর্তা, ভোক্তাও তিনিই হন। ঈশ্বর যদি কর্তা হন, ভোক্তাও তিনি। আর আপনি যদি কর্তা হন, ভোক্তাও আপনি। আগে আপনি ঠিক করুন আপনি কোনটা? আগে আপনি ঠিক করুন আপনি স্বাধীন না পরাধীন। এই স্বাধীনটা কে, ঈশ্বর স্বাধীন, না আপনি? আপনার দুটো সত্তা আমি মেনে নিলাম। এটা কোন রকেট সাইন্স না, অত্যন্ত সহজ –হয় আমি আছি, নয় ঈশ্বরই আছেন; আর তা নাহলে ঈশ্বরও আছেন আর আমিও আছি। যে কর্তা, ভোক্তা সেই হবে। খুব সুন্দর একটা প্রবাদ আছে, ক্ষেত চড়ে গাধা, মার খায় ধোপা। গাধা গিয়ে অপরের ক্ষেতে ফসল খেয়েছে। এবার মারটা কে খাবে? বড়লোকের ক্ষেত, সে এসে ধোপাকেই পিটিয়ে দেবে, তোমার গাধা আমার ক্ষেত নষ্ট করেছে। এখানে কি তাই প্রযোজ্য হবে? একেবারেই না, কারণ যে কর্তা সেই ভোক্তা। ধোপা আর গাধার মত দুটো আলাদা এখানে কিছু নয়, এখানে একজনই। যদি ঈশ্বরই কর্তা হন, তাহলে তিনি ভোক্তা হবেন, যা কিছু ভুগতে হবে তিনিই ভুগবেন, আপনি নন। আর আপনি যদি মনে করেন আপনি ভোক্তা, তাহলে আপনিই কর্তা, আপনিই দায়ী। ঠাকুর যার জন্য বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে এই জিনিসটাকে বোঝাতে চাইছেন।

একটা গরু একজনের বাগানে ঢুকে বাগানের গাছপালা খাচ্ছিল। বাগানের যে মালিক সে গরুটাকে এমন মেরেছে যে গরুটা ওখানেই মরে গেল। মালিকের এবার গোহত্যা পাপ লেগেছে। মালিক বলছে, আমি কেন দায়ী হব, আমার হাত মেরেছে, হাতের দেবতা ইন্দ্র, ইন্দ্রই এই গোহত্যার জন্য দায়ী। ইন্দ্র দেবতা ব্রাহ্মণ বেশে এসে লোকটিকে জিজ্ঞেস করছে, 'এই বাগান কার'? 'হ্যাঁ, এই বাগান আমার'। 'এই ফুল গাছের চাষ কে করেছে'? 'হ্যাঁ, আমি করেছি'। 'সব কিছুতে তুমি আর পাপের সময় আমি'? যিনি কর্তা তিনিই ভোক্তা। যদি আপনি দুঃখ ভোগ করে থাকেন, তাহলে সেটা আপনিই করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন সবই মা করাচ্ছেন, তাই তাঁর কোন দুঃখ-কষ্ট নেই। কারণ তিনি জানেন যেটা হচ্ছে তাতে ওনার কিছু নেই। এগুলো হল স্পিরিচুয়াল ফ্রডগিরি –ঠাকুর করাচ্ছেন, আমি কেন ভুগব। ভুগছেটা কে? ঠাকুর বলছেন, তুমি মানো আর নাই মানো তুমি সেই রাম। আমি বলে যাচ্ছি, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনাদের বলে যাচ্ছি যাতে আপনাদের পরিষ্কার হয়। হয়ত মনে করছেন পরিষ্কার, কিন্তু পরক্ষণেই দেখবেন ফেকরি এসে গেছে।

শুধু এতটুকু মনে রাখলেই হবে –রাগ আর দ্বেষই সব করায়, এটা হল প্রথম; দ্বিতীয়, যিনি কর্তা তিনিই ভোক্তা। এটুকু মাথায় ধরে রাখতে পারলে দেখবেন আপনার কোন সংশয় হবে না। রাগ-দ্বেষ প্রেরিত হয়ে মানুষ যেটাই করে ওটাই পাপ। যারা বলে ঠাকুরই করাচ্ছেন, ভুল হলে ঠাকুরই দায়ী হবে –আসলে এরা ধর্মের গভীরে ঢুকছে না, চিন্তনের গভীরে ঢুকছে না। যদি আপনি মনে করেন আপনি ভুগছেন, এই ভোগান্তি ভগবান আপনাকে দেননি, এর জন্য আপনি নিজে দায়ী। আর আপনি যদি মনে করেন ভগবান দিয়েছেন, তাহলে এটা জানবেন, দিচ্ছেন ভগবান, আপনি নন। যেমনি 'আমি' নিয়ে এলেন, আর ভগবান নেই। এ্যব্রাহামিক ধর্মে তাই পাপের কথা এলে ওরা আর মেলাতে পারেনা। কারণ ওদের কাছে ভগবানের সত্তা আলাদা, জীবের সত্তা আলাদা। হিন্দু ধর্মে এই জিনিস নেই। আমাদের এখানে দ্বৈতবাদে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সব কিছুতে জীব আর ঈশ্বর জুড়ে আছে।

যার ঠিক বিশ্বাস –'ঈশ্বরই কর্তা আর আমি অকর্তা' –তার পাপ কার্য হয় না। এখানে এসে আবার দুটো পয়েন্ট এসে যায়। প্রথম পয়েন্ট হল, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ঈশ্বরকে জেনেছেন, যেমন ঠাকুর, তাঁদের সম্বন্ধে গীতায় ভগবান বলছেন, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে*, যাঁর আমিত্ব নেই আর বুদ্ধি যাঁর লিপ্ত হয় না; লিপ্ত হওয়া মানেই দুটি শক্তি –রাগ আর দ্বেষ। *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে*। তিনি যদি পুরো বিশ্বকে নাশ করেও দেন, তাও তিনি জানেন যে তিনি কিছু করেন না। আর নিজেরও যদি সংহার হয়ে যায়, তাতেও তাঁর কিছু আসে যায় না। সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে এগুলো বোঝা যায় না। প্রথম যেটা বলছেন, তিনি নির্বিকার; দ্বিতীয় রাগ-দ্বেষ থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, ঈশ্বরদর্শন হবেই না। তাঁর আর রাগ-দ্বেষ নেই, তাই পাপকর্ম কখনই তাঁর দ্বারা হবে না।

যিনি আত্মজ্ঞানী, তিনি পাপকর্ম করতেই পারবে না, কারণ তাঁর রাগ-দ্বেষ শেষ হয়ে গেছে। যখন রাগ-দ্বেষকে কেউ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন, সেখান থেকে তিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধে চলে যান, তারপর নিজেকে যখন জেনে গেলেন তিনি সেই আত্মা, তখন সেই যে অস্মিতা, পুরুষ-প্রকৃতির যেটা সংযোগ, সেটারই নাশ হয়ে গেল। আর তো সে কোন দিন মনের সঙ্গে জড়াবেই না। তিনি যেটা করবেন সেটাই সৎকর্ম। তাঁর নিচে যাঁরা আছেন, আমি, আপনি, আমাদের মত লোক; যদি আপনি ঠিক ঠিক; বলছেন, ঈশ্বরই কর্তা আর আমি অকর্তা। এখানে জ্ঞানের কথা ঠাকুর বলছেন না, বিশ্বাসের কথা বলছেন। আমি, আপনি কেন পাপ করি? আমার এক বন্ধু একদিন সোস্যাল জাস্টিস নিয়ে কথা বলছিলেন। আমি ওনাকে বললাম, 'দেখুন আপনি ঠাকুরের ভক্ত, আপনি ধর্মে বিশ্বাস করেন, আপনি বেদান্তের শেষ কথা অহং ব্রহ্মাস্মি, এটা মানেন, যাঁর এই ভাব এসেছে আমি ঈশ্বরের সন্তান, অন্য কে কি আছে ওটা আমার ব্যাপার না, আপনি নিজেকে দেখুন। আমি যদি রাজার ব্যাটা হই, আমি কি কখন কারুর কাছে চাইব?

অত্যন্ত সাধারণ কয়েকটা প্রশ্ন আপনাকে করছি। শান্ত মনে একটা কাগজে উত্তর লিখুন। আপনি কি বিশ্বাস করেন, অহং ব্রহ্মাস্মি সত্য? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনি ঠাকুরের সন্তান? ঠাকুরের সন্তান মানে আপনি রাজার ব্যাটা, অহং ব্রহ্মাস্মি মানে আপনি নিজে রাজা। তার মানে আপনার কাজ হল সবাইকে দেওয়া। রাজার ব্যাটা কারুর কাছে হাত পাতবে না। তাহলে আমি আপনি দিনরাত এগুলো কি করছি? সব সময় অপরের দিকে হাত বাড়াচ্ছি। তোমার ভালবাসা পেলে আমি ধন্য হয়ে যাব। তুমি একটু কৃপা করলে আমি ধন্য হয়ে যাব। এই কাঙালিপনা কেন? দেওঘরে আমি তখন নূতন ব্রহ্মচারী। স্বামী সুহিতানন্দজী তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠে প্রিন্সিপাল ছিলেন। দেওঘরে খুব গরম পড়ত, গরমকালে যশিডি থেকে কুঁজো কিনে আনা হত। গরমের সময় পাঁচটা-ছটা কুঁজো কিনে আনা হত। আমি ওনাকে গিয়ে বললাম, 'মহারাজ একটা যদি এক্সট্রা থাকে দেবেন? অফিসে যেখানে আমরা বসে কাজ করি সেখানকার জন্য চাইছিলাম'। উনি আমার উপর অত্যন্ত রেগে গেলেন, বললেন –'দরকার থাকে একটা নিয়ে যাও, ভিখারীর মত আচরণ করো না'। খুব লজ্জা পেলাম। তাই বলে কি জীবনে ভিখিরির মত আচরণ করা বন্ধ করে দিয়েছি? একেবারেই না, এখনও করি। দু-মিনিট পরে লজ্জাও করে, কেন চাইতে

গেলাম। মুখে না, মনে মনেও যদি আশা থাকে, কোন আকাঙ্খা, কারুর সাথে দেখা করার ইচ্ছে পর্যন্তও মনে জাগে; নিজেরই তখন পাপ বলে বোধ হয়।

অহং ব্রহ্মাস্মি আপনার জ্ঞান না হতে পারে, আপনি ঠাকুরের সন্তান, এই জ্ঞান আপনার না হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু এই পথে যখন চলতে শুরু করেছেন, একটু তো বিশ্বাস জন্মাবে? অল্প একটু বিশ্বাস? জ্ঞানপথে গেলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনিই হয়েছেন; ভক্তিমার্গে গেলে আপনি ঈশ্বরের সন্তান, রাজার ব্যাটা। ঠাকুর অন্যত্র বলছেন, রাজার ব্যাটার মাসে মাসে মাসোয়ারা এসে যায়। আপনার যা দরকার তিনি আপনাকে পাঠিয়ে দেবেন। কেন চাইছেন আপনি? এগুলোই হল ফ্রডগিরি। যদি কারুর ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয় আমি রাজার ব্যাটা; ঠিক ঠিক যদি বিশ্বাস হয় অহং ব্রহ্মাস্মি; কক্ষণ কোন কিছুর জন্য কারুর কাছ থেকে মন থেকেও কিছু প্রত্যাশা করবে না, বাণী দিয়ে তো প্রশ্নই নেই আর দেহ দিয়ে হলে ভয়ঙ্কর পাপ। যোগশাস্ত্রে পরিষ্কার বলছেন, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এগুলোর অন্যথা যেটা সেটাই পাপ। কিন্তু সব কিছু হয় রাগ-দ্বেষ থেকে। কিন্তু যার বিশ্বাস আমি রাজার ব্যাটা, সে কেন রাগ-দ্বেষ করবে, তার দরকার হলে রাজা নিজেই পাঠিয়ে দেবেন।

যদি ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়ে যায়, ঈশ্বরই কর্তা, তার দ্বারা আর পাপকার্য হবে না। কারণ তার রাগ-দ্বেষ থাকবেই না। আপনার যদি মনে হয় কোন দোষ করেছেন, আপনার যদি মনে হয় কোন পাপকার্য করেছি, তাহলে বুঝবেন আপনি পাপ করেননি। আপনার মন রাগ-দ্বেষ প্রেরিত হয়ে আপনাকে দিয়ে করিয়েছে। কেন করিয়েছে, আপনার ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই বলে। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে মনে রাগ-দ্বেষ কোন মতেই আসবে না। বিদেশীরা ভারতকে যখন আক্রমণ করতে শুরু করল, তখন কত লোকেরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করে নিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দক্ষিণেশ্বরে যখন এলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কেন অন্য ধর্ম নিলেন? তিনি বললেন, পেটের জন্য। ঠাকুর বলছেন, কে জানে বাপু আমার মুখ কে যেন চেপে ধরলে, আমি তার সাথে কথা কইতে পারলুম না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নামকরা কবি, ঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথাই বললেন না। বঙ্কিমচন্দ্র এত বড় লেখক, তাঁকে ঠাকুর বললেন, তুমি তো দেখছি বড় ছ্যাঁচড়া। কেন বলছেন? কারণ ওনাদের বৃত্তিগুলো রাগ-দ্বেষ প্রেরিত, যে ঠিক ঠিক ঈশ্বরের সন্তান তার রাগ-দ্বেষ থাকবে না।

এখানে ঠাকুর এটাই বলছেন, **যার ঠিক বিশ্বাস –ঈশ্বরই কর্তা আর আমি অকর্তা –তার পাপকার্য হয় না। যে নাচতে ঠিক শিখেছে তার বেতালে পা পড়ে না**। এখানে ওস্তাদের কথা বলছেন না, ওস্তাদ যে তার তো কোন প্রশ্নই নেই ভুল পা ফেলার। কিন্তু এখানে বলছেন, যে ঠিক ঠিক নাচতে শিখেছে তারও বেতালে পা পড়বে না। আবার উল্টো দিকটাও বলছেন।

অন্তর শুদ্ধ না হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না। আপনার যদি রাগ-দ্বেষ থাকে, ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হবে না। পূজ্যপাদ স্বামী গীতানন্দজী খুব সুন্দর বলতেন, We believe that we believe in God, আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করা কি অত সহজ! একটুও যদি রাগ-দ্বেষ থাকে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। যদি জপধ্যান করতে থাকেন, যদি কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেন, হে ঠাকুর আমার মন থেকে ময়লা সরিয়ে দাও, তাহলে রাগ-দ্বেষ কমে। কারণ ঈশ্বর অন্তর্যামী সর্বদা বিরাজমান।

ঠাকুর উপাসনাগৃহে সমবেত লোকগুলিকে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন –মাঝে মাঝে এরূপ একসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নামগুণকীর্তন করা খুব ভাল।

এই যে আমাদের এখানে আলোচনাগুলো হচ্ছে বলেই না শাস্ত্রের কথাগুলো পরিষ্কার হচ্ছে। এই যে রাগ আর দ্বেষ, রাগ মানে কামনা আর দ্বেষ মানে বিদ্বেষ। যেটাকে আমরা পছন্দ করি না, সেটাকে যোগে খুব সুন্দর পরিভাষিত করেন –যে জিনিসটা আমাকে সুখ দেয় বা দিয়েছে সেটা হল রাগ আর যে

জিনিসটা দুঃখ দিয়েছে বা দুঃখ দেবে বলে মনে করছি, তার প্রতি দ্বেষ। রাগ-দ্বেষ এটাই সংসারের চালিকা শক্তি। এই রাগ-দ্বেষই জন্ম দেয় শোক আর মোহ, শোক আর মোহ এটাই সংসার। রাগ-দ্বেষ থাকলে ঈশ্বরে বিশ্বাসই হবে না, দর্শন তো অনেক দূরের কথা। উপায় কি? প্রার্থনা করুন। আপনার তো বিশ্বাস নেই, মেকানিক্যালি করুন। মেকানিক্যালিও যদি দিনের পর দিন প্রার্থনা করা হয়, করলে কি হবে? করতে করতে তিনি শুনবেন।

বিহারের এক ভদ্রলোক, উনি রাজবাড়ির ছেলে, একটা বড় কোম্পানিতে পাবলিক রিলেশানে ছিলেন। ইংরাজীতে ওনার একটা বই আছে, 'The Famous Musician'। ভদ্রলোকের বাবা কোন লোকাল রাজা ছিলেন। ওনাদের বাড়িতে বড় বড় সব মিউজিসিয়ানসরা আসতেন। উনি তখন বাচ্চা ছেলে। একজন নামকরা মিউজিসিয়ানকে দেখিয়ে ওনার বাবা বললেন, তুমি ওনাকে বল আমার জন্য একটা বাজাতে। বাচ্চা ছেলে অত বাজনা বোঝে না। বাচ্চাটি গিয়ে বলছে, 'আপনি আমাকে গান শোনাবেন'? উনি তখন বাচ্চাটিকে খুব মিষ্টি করে বলছেন, 'হ্যাঁ বাবা, তুমি বলেছ গেয়ে শোনাতে, অবশ্যই শোনাব'। তিনি একজন সেতার বাদক, সেখানে তাঁর সেতার বাজানরই কথা। কিন্তু বাচ্চাটির অনুরোধে তিনি সেতারটা পাশে রেখে গান শুরু করলেন। যাঁরা সঙ্গীত সাধক ও উচ্চমানের শিল্পী হন, তাঁরা সবটাই পারেন, বাজনাও জানেন, গানও করতে পারেন।

ছেলেটির বাবা, যিনি ওখানকার একজন রাজা, গান শুরু হতেই ওনার মাথায় হাত। ভেবেছিলেন সেতার বাজাবেন, যার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ; কিন্তু পুরো প্রোগ্রামে তিনি গান পরিবেশন করে পার করে দিলেন। রাগ-দ্বেষ নিয়ে যখন প্রার্থনা করবেন, তখন এটাই হবে, 'হ্যাঁ বাবা অবশ্যই হবে, তুমি ওটা নিয়েই থাক'। তিনি শুনবেন, যতটুকু দেওয়ার দিয়েও দেবেন। কিন্তু যখন বলে, 'না ঠাকুর আমায় ভক্তি দাও', মেকানিক্যালিই বলছে। অনেকদিন ধরে মেকানিক্যালি করতে করতে এক সময় তিনি শুনবেন। তখন বিশ্বাস জাগে। বিশ্বাস যখন জাগে, তখন আর সে কাম, ক্রোধ, রাগ-দ্বেষ প্রেরিত কোন কর্ম করে না। সেখান থেকে জ্ঞান হয়ে গেলে আর কোন প্রশ্নই নেই, রাগ-দ্বেষই তো নেই।

তবে সংসারী লোকেদের ঈশ্বরে অনুরাগ ক্ষণিক –যেমন তপ্ত লৌহে জলের ছিটে দিলে, জল তাতে যতক্ষণ থাকে!

সংসারী লোক ঈশ্বরের কথা নিতে পারে না। ঠাকুর বলছেন, বিষ্ঠার ক্রিমি ভাতের হাড়িতে রাখলে হেঁদিয়ে হেঁদিয়ে মরে যাবে। শুদ্ধ শাস্ত্রীয় কথা কজন নিতে পারবে? উচ্চ তত্ত্ব নিতে গেলে মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হয়ে যাবে। সিংহের দুধ মাটির হাড়িতে থাকবে না, হাড়ি ফেটে যাবে। একটু নাচ-গান, খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন পর্যন্ত ঠিক আছে। ভক্তরা বলবে, 'মহারাজ কি সুন্দর গান করেন'! যিনি বেদান্ত সন্ন্যাসী তাঁর কাজ কি গান করা? বিষয়ী লোকেরা ধর্ম নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, উচ্চ চিন্তন নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

এরপর বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ব্রহ্মসঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্তব পাঠ করা হচ্ছে। উপাসনা হয়ে গেল। ভক্তদের লুচি, মিষ্টান্ন খাওয়ানো হচ্ছে। রাত নটা হয়ে গেছে। ঠাকুর এবার দক্ষিণেশ্বর ফিরবেন। গৃহস্বামীরা গণ্যমান্য লোকেদের নিয়ে ব্যস্ত, যাদের মধ্যে ঠাকুর পরিবার লোকজনরাও আছেন। ঠাকুরের দিকে কারুর নজর নেই, ঠাকুরের খবর কেউ নিচ্ছে না। নটা বাজে। ঠাকুর রাখালকে বলছেন। এখন রাখাল পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, কত কম কথা বলতেন, কত তিনি গম্ভীর মানুষ। এই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে তিনি দাঁড় করিয়ে দিলেন, তাঁকে ঠাকুর কি বলছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখাল প্রভৃতির প্রতি) –কিরে কেউ ডাকে না যে রে!

খাওয়ার জন্য কেউ ডাকছে না। ভোজবাড়ি, অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, খাওয়ানো হচ্ছে। কিন্তু না ডাকলে কি করে খাওয়ার ওখানে যেতে পারেন। রাখাল খুব রেগে গেছেন।

রাখাল (সক্রোধে) –মহাশয়, চলে আসুন –দক্ষিণেশ্বর যাই। কম বয়স থাকলে যা হয়, আমরাও কম বয়সে একটুতেই রেগে যেতাম। রক্তের তেজ কম বয়সেই থাকে। বয়স কম আবার চঞ্চল, এদের রক্তের তেজ বেশি। বয়সের সাথে সাথে রক্তের তেজ যত কমতে থাকে, সব কিছুতে তখন শান্ত ভাব অবলম্বন করতে ইচ্ছা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –আরে রোস্ –গাড়িভাড়া তিন টাকা দুআনা কে দেবে! –রোখ করলেই হয় না। ভিতরে তোমার দম নেই আর মিছিমিছি তিড়িংবিড়িং করে লাফালে কি হবে। **আর এত রাত্রে খাই কোথা**! এত রাত্রে যখন ফিরব তখন কোথায় খাব, কে এত রাতে আমাদের খেতে দেবে!

কথামৃতের এই লাইনটা খুব ইন্টারেস্টিং। অনেক সময় ইমোশানালি আমাদের মনে হবে যে, আমাদের ঠাকুর তিন টাকা দুআনা গাড়িভাড়া পাচ্ছেন না! খেতে পাচ্ছেন না! এখানে এটা কিছু করার নেই, পরিস্থিতিটাই এখন এমন। কিন্তু এখানে যেটা লক্ষণীয় তা হল, এই ঘটনার ভিতর দিয়ে ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব পরিষ্কার বেরিয়ে আসছে। আগে আগে তিন অবস্থার কথা বলে হয়েছিল –বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা ও অন্তর্দশা। অন্তর্দশাতে ঠাকুর সমাধিস্থ, অর্ধবাহ্যদশায় ভাবে তিনি নৃত্য করছেন, গান করছেন, ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন। বাহ্যদশা মানে পুরো সংসার, সব রকমের সংসার। যিনি জ্ঞানী, যিনি অবতার তিনি কখনই ইমপ্র্যাক্টিক্যাল হন না। ঠাকুরের যে প্র্যাক্টিক্যাল বোধ, এটাকে নিয়ে প্রচুর লেখালেখি বেরিয়েছে। বিভিন্ন জায়গার সব কথা বলার আর দরকার নেই; মূল কথা হল ঠাকুর একশ ভাগের একশ ভাব প্র্যাক্টিক্যাল।

সংসারে সবাইকে প্র্যাক্টিক্যল হতে হবে। লাটু মহারাজ মশলার বেটুয়াটা আনতে ভুলে গেছেন, ঠাকুর বলছেন, আমি সমাধিতে থাকি তাও আমার এতটা ভুল হয় না, আর তোর এখনই এতটা? একটু আগে আমরা দেখলাম, রাখালকে জিজ্ঞেস করছে জুতো আছে, না চুরি হয়ে গেছে? রাত্রিবেলা ঠাকুর আনাজ গুছিয়ে রাখছেন। হৃদয়রাম দেখে বলছেন, 'মামা! তুমি একি করছ'? ঠাকুর খুব সুন্দর কথা বললেন, দুটো টাকার জন্যই না দেশ ছেড়ে এখানে পড়ে আছিস, সেই পয়সা দিয়ে কেনা অন্ন কি নষ্ট করতে হয়। কি সাংঘাতিক প্র্যাক্টিক্যাল! রাখালকে বলছেন, পয়সা নাই আবার ফাঁকা রোখ।

অনেকক্ষণ পর শোনা গেল, পাতা হইয়াছে। সব ভক্তদের এককালে আহ্বান করা হইল। সেই ভিড়ে ঠাকুর রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে দ্বিতলায় জলযোগ করিতে চলিলেন। ভিড়েতে বসিবার জায়গা পাওয়া যাইতেছে না। অনেক কষ্টে ঠাকুরকে একধারে বসানো হইল।

স্থানটি অপরিষ্কার। একজন রন্ধনী-ব্রাহ্মণী তরকারি পরিবেশন করিল। বোঝা যাচ্ছে যে গৃহস্বামীরা আপ্যায়ন করছেন না, তার মানে গৃহস্বামীদের ঠাকুরের প্রতি সেই সম্মান নেই, নজর নেই। ঠাকুরের খেতেই ইচ্ছে হচ্ছিল না, তাও **তিনি নুন টাক্না দিয়ে লুচি খাইলেন ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলেন**। এইটুকু বর্ণনা, বাকিটা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

ঠাকুর দয়াসিন্ধু। গৃহস্বামীদের ছোকরা বয়স। তাহারা তাঁহার পূজা করিতে জানে না বলিয়া তিনি কেন বিরক্ত হইবেন? তিনি না খাইয়া চলিয়া গেলে যে, তাহাদের অমঙ্গল হইবে। এই কথা মাস্টারমশাই বলছেন। কিন্তু তিন টাকা দুআনা থেকেই যাচ্ছে, কে দেবে গাড়িভাড়া? কিন্তু মাস্টারমশাই এখানে খুব সুন্দর বলছেন –**আর তাহারা ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়াই এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছে**। এটা কোন শ্রাদ্ধবাড়ি বা বিবাহবাড়ির নিমন্ত্রণ নয়, ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করেই সব আয়োজন করা হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া হল। ঠাকুর গাড়িতে উঠেছেন। কিন্তু গাড়িভাড়া কে দেবে? গৃহস্বামীদের দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। পরে ঠাকুর ভক্তদের কাছে আনন্দ করতে করতে গল্প করছেন –**গাড়িভাড়া চাইতে গেল। তা প্রথমে হাঁকিয়ে দিলে! তারপর অনেক কষ্টে তিন টাকা পাওয়া গেল, দুআনা আর দিলে না। বলে, ওইতেই হবে**।

এই প্রসঙ্গটা যে এত সুন্দর ভাবা যায় না। আমরা ঠাকুরকে বলছি তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, সবাইকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ দিচ্ছেন; অথচ তিনি গৃহস্বামীদের কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে নিচ্ছেন। কিছু করার নেই, তিনি কোথা থেকে গাড়িভাড়া দেবেন। এই হল প্র্যাক্টিক্যাল প্রবলেমস্, লোকেরা সাধুদের কাছে যায়, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে আসছে; দেখছে মঠে এত সেবামূলক কাজ হচ্ছে, প্রতিদিন এত লোককে খাওয়ানো হচ্ছে, ভক্তরা না দিলে কোথা থেকে এত খরচ আসবে। কথায় কথায় শোনাবে, আপনারা তো বিদেশ থেকে টাকা পান। ভিতরটা যেমন ঢেকুরটাও তেমন বেরোয়। সাধুদের কাছে আসছে, সাধুকে যে কিছু দেবে সেই বোধটুকুও নেই। ঠাকুর বলছেন, সাধুদের কাছে খালি হাতে যেতে নেয়। এখানে গৃহাস্বামীদের কোন দোষ নেই, তারা জানে না। কিন্তু ঠাকুরের কোথাও এক বিন্দু অভিমান নেই, আবার মজা করে প্রথম কথা বলছেন –ফাঁকা রোখ করতে নেই, দ্বিতীয় মজার ছলে বলছেন –দুআনা আর দিলে না, বলে ওতেই হবে।

এদিনের আলোচনায় আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এমন জায়গায় উপস্থিত আছেন যেখানে ঠাকুর এসেছেন। তার সঙ্গে দেখলাম ঈশ্বরই যদি সব করান তাহলে পাপের দায়ীত্ব কার? এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের খুব মূল্যবান কথা। এরপরের দৃশ্য হল –খাওয়ার আয়োজন হয়েছে, কিন্তু ঠাকুর ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গর কেউ ডাকছে না। যাই হোক অনেকক্ষণ পর খেতে গেছেন, কিন্তু সেখানে এত ভিড় যে একটা কেমন বিশৃঙ্খলার পরিবেশ। রাখালের রাগ, তা দেখে ঠাকুর বলছেন, ফাঁকা রোখ্, ভাড়া কে দেবে। ঠাকুর অন্য জায়গায় বলছেন, সাধু হবি তো বোকা হবি কেন। প্র্যাক্টিক্যাল সেন্সটা ছাড়তে নেই। যাঁরা ইমপ্র্যাক্টিক্যাল হন, নিজেকে যাঁরা সরল বলে মনে করে, সরলতা তো নেই আসলে বোকার হদ্দ। কেউ যদি বলে আপনি সরল, বুঝবেন আপনাকে তিনি বলতে চাইছেন আপনি একটা বোকা। ঈশ্বরকে নিয়ে যে সরল, সেখানে সে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আলু-পটল যেমন সিদ্ধ হয়ে যায়। সেখানে পুরো জিনিসটাই আলাদা, আর তাঁরাও কখন ইমপ্র্যাক্টিক্যাল হন না। তিনি জগতের দিকে দৃষ্টি দেন না, দরকার নেই বলে। কিন্তু যখন দৃষ্টি দেবেন তখন আমার আপনার থেকে অনেক বেশি দক্ষ নিজেকে প্রমাণ করে দেবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখুন, পুরো যুদ্ধটাকে তিনি কিভাবে সঞ্চালন করে গেলেন, অথচ পুরোপুরি অনাসক্ত। এরপর আমরা সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখব ঠাকুর হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় গেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ হরিকীর্তনানন্দে –হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় ও রামচন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় কাঁসারীপাড়া হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় শুভাগমন করিয়াছেন; রবিবার, ১৩ই মে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (পৃঃ১৮৬)। এখানে রাধা-কৃষ্ণ ভাবের উপর পালাগান হচ্ছে। এগুলোতে আমরা যাচ্ছি না। ধর্মে সবটাই থাকে। ধর্মে এ্যকশান আছে, ধর্মে ইমোশানও আছে। আপনারা সংসারে আছেন, এমনিতেই আপনাদের ইমোশান আছে। এখানে তাই আমাদের আলোচনা করার কিছু নেই। তবে দু-চারটে কথা বলতে হচ্ছে। পালা গান, হরিভক্তি, এই জিনিসগুলো আমাদের হিন্দুদের যে মূলধারা, এগুলো তা নয়। রাধা আমাদের ভাগবতেও নেই, রাধা আমাদের মহাভারতেও নেই। তাহলে রাধা কোথা থেকে এলেন?

ভক্তিতে তিনটে জিনিস হয় –ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান। শেষ অবস্থায় গিয়ে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান এক হয়ে যান। তখন কি থাকে মুখে বলা যায় না। খুব হলে বলা যেতে পারে, থেকে যায় ভক্তি, ভালবাসা; এছাড়া আর কিছু থাকে না। এই যে ত্রিপুটি, এক যিনি তিনি এখন তিন হয়ে গেলেন।

হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্ম হল বেদান্ত। বেদান্ত হল অদ্বৈত, যেখানে সব কিছু মিলে এক হয়ে যাচ্ছে। যখন তিন এসে যাচ্ছে তখন কর্তা, ভোক্তা আর মাঝখানে সেই বস্তু। যখন আমি তুমি ভেদ এসে যায় তখন শ্রেষ্ঠতম ভেদ হবে –ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান। এই যে ভক্তের ভগবান হবেন, ভগবান ভক্তেরই হন, তখন ভগবান কেমন হবেন? শ্রীকৃষ্ণের মত; যিনি ভক্তের ভিতরে সেই রসকে জাগিয়ে দেবেন। ভক্ত কেমন হবেন? শ্রীরাধার মত। তাহলে আমরা এই যে পালা গান দেখছি, যা দেখে ঠাকুর ভাব-বিহ্বল হয়ে যাচ্ছেন, যেটাকে দেখে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে যচ্ছেন, এগুলো কি? এগুলো ভাব জগৎ। ভাব জগৎ নিয়ে আমরা অন্যান্য জায়গায় অনেক আলোচনা করেছি।

তিনটি জগৎ -স্থূল জগৎ, যেটা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে নিই; সূক্ষ্ম জগৎ, যেটা আমরা মন দিয়ে নিই; আর কারণ জগৎ, যেখানে আত্মার উপর একটা 'আমি-তুমি'র আবরণ রয়েছে। তার বাইরে যা আছে, ওটাকে জগৎ বলা যায় না, ওটাই মহাকারণ। ভক্তিকে নিয়ে সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করছেন, তখন এটাকে বলা হয় ভাব। তুলসীদাসের যে রামচরিতমানস, তুলসীদাসের যিনি শ্রীরামচন্দ্র তিনি ভাব জগতের রাম। কথায় কথায় আমরা বলি 'যো রাম দশরথ কা বেটা', কিন্তু আসলে উনি ভাব জগতের রাম। বৈষ্ণবদের যে শ্রীকৃষ্ণ, উনি হলেন ভাব জগতের কৃষ্ণ, এই কৃষ্ণ আমার আপনার কৃষ্ণ নন। এখন কোন একটা জিনিসকে বোঝানর জন্য যে মাধ্যম নেওয়া হয়, সেই মাধ্যমকে বলে আইডিয়াস। আইডিয়াগুলির প্রতিনিধি হন কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তি। তা নাহলে আমরা ধারণা করতে পারব না, কারণ অমূর্ত সবার জন্য নয়। স্কুলে পড়ার সময় আমাদের বীজগণিত পড়তে হত, কিন্তু তখন বীজগণিত আমাদের মাথায় ঢুকত না, বুঝতেও পারতাম না, শিখতেও পারতাম না। কারণ বীজগণিত সব সময় abstraction দিয়ে চলে, যেটা সবাই বুঝতে পারেনা।

ধর্মের abstraction আরও কঠিন। সেইজন্য দরকার একটি ব্যক্তিত্ব। আগেকার যাঁরা সন্ত কবি ছিলেন, এনারা ঋষি নন। সন্ত কবিরা ভক্তদের জন্য বা নিজের ভিতরের ভাব ভক্তিকে প্রকাশ করার জন্য, যেটাকে তাঁরা abstract জিনিস দিয়ে অভিব্যক্ত করতে পারবেন না, করতে পারলেও এনারা জানতেন সাধারণ মানুষ নিতে পারবে না; সুন্দর সুন্দর দেহ দিয়ে দিলেন; আর এই সুন্দর সুন্দর দেহকে বর্ণনা করে রচিত হল নানান ধরণের গীতিকাব্য। এইভাবেই ভক্তি জিনিসটা, ভালবাসা জিনিসটা তিনটে ভাগে চলে গেল –ভক্ত, ভক্তি, ভগবান। ভক্ত হয়ে গেলেন শ্রীরাধা, ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ আর ভক্তি রাসলীলা। মনে রাখতে হবে এখানে আমরা বৈধী ভক্তির আলোচনা করছি না। যদি আপনি প্রেমাভক্তি চান, আপনি যদি পরাভক্তি নিয়ে চলতে চান, যে ভক্তি ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যায়, তাহলে আপনাকে শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে রাসলীলায় যেতে হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে এনারা গোপীদের এনেছেন, শ্রীকৃষ্ণকে এনেছেন আর নিয়ে এলেন রাসলীলা। তাতেও কিন্তু হল না, হবার কথাও না; আর-একটা চরিত্রের দরকার পড়ল। নিয়ে এলেন শ্রীরাধাকে। সুফিরা লায়লা-মজনুতে একই জিনিস করেছেন। মজনু মানে যে ভালবাসায় ডুবে যায়। কিন্তু আমাদের সাধারণ মন, সাধারণ মন দিয়ে আমরা গূহ্য তত্ত্বগুলি দেখতে পারব না। স্থূল দৃষ্টি কিনা, বড়বড় ফোঁকরওয়ালা জাল আমাদের। ওই জাল থেকে ছোট মাছগুলো বেরিয়ে যায়, বিশাল আকারের মাছগুলো শুধু থাকে। আমরা তখন দেহে নেমে যাই, যার জন্য স্বামীজী এত বিরক্ত ছিলেন যে বলতেন, যেখানে এগুলো দেখবি, লাঠি দিয়ে মারবি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি এগুলোতে বেশি যাই না, কারণ প্রথম কথা হল, এগুলো আমাদের মূল ধর্মের নয়। আমাদের মূল ধর্ম হল নারদীয় ভক্তিসূত্র, ভাগবত। ব্যসদেব ভাগবতে ভক্তিকে খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন। মায়ের ভালবাসা, বন্ধুদের ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা; বিভিন্ন ভাবে তিনি এই জিনিসগুলিকে নিয়ে এসেছেন।

এগুলো ভক্তিশাস্ত্র, খুব উচ্চমানের জিনিস। মহাপুরুষরা সাবধান করে বলছেন, যাদের মধ্যে একটু কামগন্ধ আছে, বা বিগত দশ বছরে ছিল, কি কুড়ি বছরে ছিল; তাদের এই জিনিসগুলো কোন

ভাবেই শোনা উচিত না। কারণ এগুলো দিয়ে তাদের কামভাবই জাগবে, তত্ত্ব তো নিতেই পারবে না। যখনই কোথাও এই কথাগুলো আসে, আমি শ্রোতাদের বলে দিই, আপনারা পড়ে নেবেন। কিন্তু যেখানে ঠাকুর যদি কোন কথা বলেন, তাহলে আমি অবশ্যই ব্যাখ্যা করব। কিন্তু এমনি গান, নৃত্যের বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আপনারা কথামৃতের এই অংশটা পড়ে নেবেন, নিজের মত যতটুকু বুঝলেন।

শুধু তত্ত্বটা জেনে রাখবেন। বেদান্তের উচ্চ আদর্শ সবাই বুঝতে পারেনা। আমরা ক্লাশ নিই ঠিকই, কিন্তু জানি যে লোকেরা বুঝবে না। অশ্বত্থামা দেখছে বন্ধুরা দুধ খাচ্ছে, দেখে ওরও ইচ্ছে হয়েছে সেও দুধ খাবে। কিন্তু ওর বাবা-মা খুব গরীব ব্রাহ্মণ, ডালভাত ঠিকমত জোটে না, সেখানে ছেলেকে কোত্থেকে দুধ খেতে দেবে। মা আটা গুলে খেতে দিয়েছে, অশ্বত্থামা মনে করছে আমিও দুধ খাচ্ছি, খুব খুশি। আমাদের বেদান্ত পাঠ হল অশ্বত্থামার দুধ খাওয়ার মত। লোকেরা মনে করছে আমি বেদান্ত শিখছি, এই শরীর মন নিয়ে আপনি বেদান্ত শিখবেন?

ভক্তিতে গিয়ে ঠিক একই সমস্যা হয়। কামের ভিতর দিয়ে বড় হয়েছে কিনা, শরীরে কাম কিলবিল করছে, বয়স হয়ে গেছে, রোগে জরাজীর্ণ, বা এমন লোকেদের সঙ্গে আছে যারা প্রচণ্ড বিষয়ী, এইসব কারণে মানুষ ঠিক ঠিক যে ভক্তি, সেই ব্যাপারটাতে পিছিয়ে যাচ্ছে। *বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ*। আপনার ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে গেছে, আপনার ভোগ করার ক্ষমতা চলে গেছে বলে আপনি নিরাহারী হয়ে গেছেন; গীতায় ভগবান বলছেন, *বিষয়া বিনিবর্তন্তে* আপনি বৈরাগী হয়ে গেলেন, আপনি নিজেকে মনে করছেন যে আপনি একজন কাম-ক্রোধ ত্যাগী সন্ন্যাসী। তা নয়, ভিতরের রসটা তো তার শুকিয়ে যায়নি, *রসবর্জং রসোহপ্যস্য*। এটা বলা এইজন্য যে, এই ধরণের গান যেখানে যেখানে আসে, সেখানে আমরা বেশি ব্যাখ্যা করিনা। যাঁরা সংসারে আছেন, তাঁদের সামনে এসবের ব্যাখ্যা করাও উচিত না। কৃষ্ণ, গোপী, রাধা, এনাদের কথা সাধারণ লোকেদের জন্য নয়।

প্রথম কথা রাধা বলে কেউ ছিলেন না, দ্বিতীয় যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, যেভাবে এনারা আমাদের সামনে কৃষ্ণ, রাধার কথা উপস্থাপন করেন তাতে মনে হবে কৃষ্ণ যেন একজন পনের ষোল বছরের যুবক। কিন্তু কৃষ্ণ যখন রাসলীলা করেছেন তখন ওনার বয়স ছিল মাত্র আট বছর। এরপর বাকিটা আপনি আপনার মত নিয়ে নিন।

ঠাকুর সব শুনলেন, সব শোনার পর বলছেন, **তিনি আর তাঁর নামে অভেদ; তাই শ্রীমতী এইরূপ বলছেন। যেই রাম সেই নাম**।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে ওঁমের উপর খুব সুন্দর একটা আলোচনা আছে। সেখানে এই জিনিসটাকে খুব পরিষ্কার করে বলছেন, ওঁ কেন সব কিছু। ওঁ বলতে সমগ্র জগৎ, ওঁ বলতে ঈশ্বর –এই ভাবটা আমাদের খুব পুরনো ভাব, উপনিষদেই এসে গেছে। যাবতীয় যা কিছু আছে সব ওঁ, নাম নামী অভেদ। নামও যা, নামীও তাই, যেই রাম সেই নাম। আপনি যখন ইষ্ট নামের জপ করছেন, তখন আসলে আপনি ঈশ্বরের সামনেই কথা বলছেন। আজকে এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছিলেন, বয়স হয়েছে, আমাদের সব ক্লাশগুলো ইউটিউবে নিয়মিত শোনেন। সবার সাথে আমি যেমন হাসিমজা করি, তেমনি মজা করে আমি বললাম, 'আপনি তো নিয়মিত আমাদের ক্লাশগুলো শোনেন, ক্লাশগুলো কেমন হচ্ছে'? উনি বলছেন, 'একটা লাভ হয়েছে, আমার জপ অনেক বেড়ে গেছে, এখন দিনে একত্রিশ হাজার জপ করি'। শুনে ভাল লাগল। ভদ্রলোকের সংসার আছেন, সংসারের কত কাজ, কত সমস্যা, তার মধ্যেও তিনি একত্রিশ হাজার জপ করছেন। যখনই সময় পান, চেয়ারে হোক, আসনে বসে হোক, যেভাবে সুযোগ পান জপ করছেন। তবে এই বোধ রাখা –নাম নামী অভেদ। যাঁর জপ করছেন, তিনিই আপনার

হৃদয়ে বিরাজ করে আছেন। আবার তিনি বাইরে সর্বব্যাপী হয়ে আছেন। এক সময় এটা আপনি বাস্তবিক দেখবেন।

ইসলামে এই সমস্যাটা আছে। এক সময় ওনাদের এই প্রশ্ন ছিল, আল্লা আর কোরান, এই দুটো কি এক, নাকি আলাদা? ওনাদের তৎকালীন যে পণ্ডিতরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এটাকে নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু শেষে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন যে দুটো আলাদা –আল্লা কোরান থেকে অনেক উপরে। কারণ ওনারা এই জিনিসটাকে অন্য ভাবে দেখেন। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র যেভাবে দেখে তাতে দেখানো হয়ে যে নাম আর নামী অভেদ।

এই কথা বলার পর, **ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া এই মাথুর কীর্তন গান শুনিতেছেন**। গান এখনও চলছে। অধ্যায়টা এখানেই শেষ, এখানে মূলতঃ গানই হয়েছে। পরিচ্ছেদও পাল্টে যাচ্ছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

২৭শে মে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে আছেন (পৃঃ ১৮৭)। ঠাকুর নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) –বিদ্বেষভাব ভাল নয়, –শাক্ত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে একটা খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, যেখানে বলছেন, যিনি আত্মাকে জেনেছেন, যদি আত্মজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকে, তখন তিনি দেখেন এই যে নানান দেবদেবী, নানান যে মত, এগুলো সমস্ত আত্মারই প্রকাশ, ফলে আত্মজ্ঞানী কাউকে বিদ্বেষ করে না। ঠাকুরও কখন কাউকে বিদ্বেষ করতেন না, কারণ তিনি সত্যকে দেখেছেন। তাহলে বিদ্বেষ কে করে? যে সত্যকে দেখেনি।

এই বলে ঠাকুর খুব নামকরা ঘটনা বলছেন –**পদ্মলোচন বর্ধমানের সভাপণ্ডিত ছিল; সভায় বিচার হচ্ছিল, –শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচন বেশ বলেছিল –আমি জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নেই, ব্রহ্মারও আলাপ নেই**। (**সকলের হাস্য**) যে জিনিসটাকে আপনি জানেন না, শাস্ত্র দেখে আপনি এক রকম বলছেন, কিন্তু আর-একটা শাস্ত্র অন্য এক রকম বলবে।

একবার একজন খ্রীশ্চান ভদ্রলোক, উনি পাদরি, পিএইচডি করছিলেন। পেপার আদি লিখছেন, ওনার গাইড তাঁকে পরামর্শ দিলেন, 'আপনি অন্য ধর্মের লোকেদের সাথে কথা বলুন, তাঁদের রেফারেন্স টানুন'। সেই কারণে উনি ঘুরতে ঘুরতে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলেন। ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। উনি আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন, দেখাতে চাইছেন খ্রীশ্চান ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমি তর্ক করার জন্য বললাম, 'ধরুন, আমি যদি বলি যীশু খ্রীষ্ট বলে কেউ ছিলেন না, আপনি কি এটাকে কাটতে পারবেন? আপনি তো বিশ্বাসে চলছেন, আমিও বিশ্বাসে চলছি'। উনি বললেন, 'বাইবেলের প্রতি আমার নিজের বিরাট সম্মান'। উনি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন না, আমি আবার বললাম, 'যীশু খ্রীষ্টই যদি নাই থাকেন তাহলে বাইবেল তো আর ধর্মগ্রন্থ হল না। যে কোন ধর্মের যিনি প্রবর্তক, তাঁকে নিয়েই যদি আমি প্রশ্ন তুলে দিই; দ্বিতীয় কথা, আমি কেন মানব তাঁকে, যে এটা ঈশ্বরীয় কথা'?

আমি বললাম, 'তাহলে আমি আর আপনি যে আলোচনা করব, সিদ্ধান্তে এসে আলোচনা করব'। একজন বলছে, আমার বাবা এই রকম বলেছেন; আর-একজন বলছে, আমার বাবা এই রকম বলেছেন। এভাবে তো আলোচনা হয় না। আলোচনা করতে গেলে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলতে হবে।

আচার্য শঙ্কর ভাষ্য লিখতে গিয়ে তিনি এটা বলছেন না যে, বেদে এই রকম বলেছে, উপনিষদে এই রকম বলেছে; তিনি সিদ্ধান্তের উপর গেলেন। কারণ যারা বৌদ্ধ তারা তো বেদ উপনিষদ মানবে না। এরপর আচার্য বৌদ্ধ ধর্মকে তুলোধুনো করে একেবারে শেষ করে দিলেন, ভারত থেকে তাড়িয়ে ছাড়লেন। কারণ তাঁদের কথা যুক্তিতে দাঁড়াতে পারছে না। যুক্তি মানেই, সিদ্ধান্তের উপরে। ওর প্যারামিটারস, পেরিমিটারস পরিষ্কার ভাবে পরিভাষিত করে তারপরে করতে হয়।

এই যে দ্বেষ, বিদ্বেষ, ধর্মের নামে মারামারি, কাটাকাটি, এদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'তুমি কি ঈশ্বর দেখেছ'? 'না'। 'তাহলে কেন এ-রকম বলছ'। 'না, এটা আমার ধর্মগ্রন্থে আছে'। তোমার ধর্মগ্রন্থ এই বলছে, আমার ধর্মগ্রন্থ এই বলছে; তাহলে কিভাবে ফয়সালা হবে? তলোয়ার বার করে নাও। এটা কি কোন ধর্ম হল? আইনস্টাইন বলবে, ই ইক্যুয়াল টু এমসি স্কয়ার, আর অন্য দিকে হিটলারের বৈজ্ঞানিকরা যারা আইনস্টাইনের বিরোধিতা করছিল, তারা বলবে, এটা ই এমসি স্কয়ার হবে না, এটা ই ইক্যুয়াল টু হাফ এমসি স্কয়ার হবে। কিভাবে মেলাবে? তলোয়ার বার করে নাও। হিটলার তাই করলেন। হিটলারের সময় বই বেরোল, Why 50 Scientists think that Einstein is wrong। আইনস্টাইন এটাকে হেসে উড়িয়ে দিলেন –আমি যদি ভুল হতাম তাহলে পঞ্চাশ জন লাগত না, একজন বৈজ্ঞানিকই যথেষ্ট।

কোন জিনিসকে নিয়ে যখন বিচার করতে যাবেন, তখন সব সময় সিদ্ধান্তকে নিয়ে চলবেন। জগৎ কারুর কথায় চলে না, সিদ্ধান্তে চলে। সূর্যোদয় একটা সিদ্ধান্তকে মেনে চলে, আমরা ওটাকে বলি ঋতম্। ঋতমকে মেনে এই জগৎ চলছে, আমার আপনার কথায় চলবে না। এ্যরিস্টটল, সক্রেটিস, প্লেটো বড় বড় গ্রীক দার্শনিকরা মনে করতেন, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সব ঘুরছে। গ্যালিলিও এসে বললেন, না, সূর্যকে কেন্দ্র করে আমরা ঘুরছি। ভাই তুমি একটা জোনাকি পোকা থেকেও ক্ষুদ্র, তুমি কি মনে করছ, কি বলছ; তাতে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীর কি এসে গেল। তাঁরা ঋতমকে পালন করে নিজের মত ঘুরছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ে যাঁরা কথা বলেন, তাঁরা বলেন প্রত্যেকটি পয়েন্টই কেন্দ্র, যেটাকে আপনি মনে করবেন কেন্দ্র, সেটাই কেন্দ্র। তাহলে গ্রীক দার্শনিকরা ঠিক, না গ্যালিলিও ঠিক? এসব কথা শুনলে আমার মাথা গুলিয়ে যায়। মূল হল, সিদ্ধান্তের উপর চলতে হবে। আর এমন সিদ্ধান্ত যেটা দুজনই মানছেন। ঠাকুর এখানে কি বলছেন?

ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। তার মানে ধর্ম লড়াইয়ের জন্য নয়, ধর্ম তর্কাতর্কির জন্য না, ধর্ম দ্বেষ-বিদ্বেষের জন্য না; ধর্ম হল ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য। ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য যদি আপনি চেষ্টা না করেন, তাহলে আপনি যেটা করছেন ওটা আচার, ওটা আর ধর্ম থাকল না; কারণ আচার কখন ধর্ম হয় না। আর ব্যাকুলতা, একটু আগে যে ভদ্রলোকের কথা বললাম, একত্রিশ হাজার করে জপ করছেন; কোথাও তাঁর মধ্যে একটা ইচ্ছা জেগেছে, আমি ঠাকুরকে এভাবেই ভালবাসব। এই যে ঠাকুর বলছেন, ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই পাওয়া যায়, এটা হল মত পথ, যত মত তত পথ বলেননি, বলছেন মত পথ। যে কোন মত একটা পথ। ব্যাকুলতা যদি থাকে, সব পথই তাকে তার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু পরে কি হবে সেটা ঠাকুর এখানে বলছেন না। মাণ্ডুক্য উপনিষদ থেকে যেটা বলা হল, আত্মাই সব, আত্মা আপনার আমার সবার ভিতরের সত্তা। ব্যাকুলতা যখন হয়েছে, ছটফটানি যখন এসেছে, তখন বলছেন মনটাকে এবার ছিঁড়ে ফেলে দেব; আত্মা তো নিজের প্রকাশ দেবেনই দেবেন, যে রূপেই আপনি দেখতে চান। ইসলাম ধর্মে যেভাবে দেখতে চায়, ওরা ওই ভাবে দেখবে। খ্রীশ্চানরা যেভাবে দেখতে চায়, তারা সেইভাবে দেখবে, বেদান্তীরা যেভাবে দেখতে চায় তারা সেইভাবে দেখবে। আমাদের এখানে রামানুজরা এক রকম দেখলেন, মাধ্বাচার্য আর-এক রকম দেখলেন, চৈতন্য মহাপ্রভু আর-এক রকম দেখলেন।

ব্যাকুলতার কথা বলার পর ঠাকুর বলছেন –**তবে নিষ্ঠা থাকা ভাল। নিষ্ঠাভক্তির আর-একটি নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি**। এটাও আমরা আগে আগে আলোচনা করেছি। গীতাতেও বলছেন, ভক্তি অব্যভিচারিণী। ব্যভিচার মানে যেখানে একের বেশি থাকে। সাহিত্যেও আসে, যেখানে একজন স্ত্রী একজন থেকে আর-একজনকে বেশি ভালবাসে, তখন তাকে বলে দুরাচারিণী বা ব্যভিচারিণী। **যেমন এক ডেলে গাছ, সোজা উঠেছে**। ঠাকুর নিজেকেও এক ডেলে গাছ বলছেন, তালগাছ যেমন সোজা উঠে যায়, তবে তালগাছ একাই ওঠে। কিছু আমগাছ আছে সোজা উঠে যায়। **ব্যভিচারিণী ভক্তি মানে পাঁচ ডেলে গাছ**। আমাদের প্রায় সবারই ভক্তি আসলে ব্যভিচারিণী ভক্তি। একজন নামকরা নেতাকে আমি জানি, এখনও এমপি আছেন। এক জায়গায় তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন, আবার রামকৃষ্ণ মিশন থেকেও দীক্ষা নিলেন, পরে দেখা হল তখনও জানলাম আরও একজনের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। খুব মিষ্টি করে আমাকে বুঝিয়ে বললেন, 'বুঝতেই তো পারছেন মহারাজ, কলিযুগ কিনা, এক গুরুতে হয় না'। শুনে আমার আর হাসি থামতে চাইছে না। কি বলার আছে একে? কিছুই না। এখানে এদের কথা আনা হচ্ছে না। এখানে বলা হচ্ছে তাদের কথা যাদের এখানেও মন আছে, সেখানেও মন আছে, আরও দশটা জায়গায় মন আছে।

ঠাকুর গোপীদের কথা নিয়ে আসছেন –**গোপীদের এমনি নিষ্ঠা যে, বৃন্দাবনের মোহনচূড়া, পীতধড়াপরা রাখালকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভালবাসবে না। মথুরায় যখন রাজবেশ, পাগড়ি মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে তখন তার ঘোমটা দিলে। আর বললে, ইনি আবার কে? এঁর সঙ্গে আলাপ করে আমরা কি দ্বিচারিণী হব?** এক্ষুণি দেখবেন ঠাকুর বলবেন, দ্বিচারিণী করতে নেই, আমি তোমাকে ভালবেসেছি; যেভাবে ভালবেসেছি সেভাবেই ভালবেসেছি।

অনেক আগে একটা ঘটনা পড়েছিলাম, হলিউডের একজন ফিল্মস্টার, নামযশ হয়েছে। কিন্তু বাড়িতে প্রায় ডিভোর্স হতে চলেছে। ছেলেও আর বাবার সঙ্গে কথা বলতে চায় না। কিভাবে কিভাবে উনি তখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কোন ব্যাপারে ভারতের একটা সরকারী হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখেন বছর ছয়-সাতের একটা বাচ্চা ছেলে বেডে শুয়ে আছে, ছেলেটির এমন কি একটা রোগ হয়েছে যে আর বাঁচবে না। বাবা-মা গ্রামের লোক, হাসপাতালে ছেলের বেডের পাশে বসে আছে। ছেলে যখন কোন হাসির কথা বলছে, বাবা-মা খুব হাসছে। ছেলে চুপচাপ, এরাও চুপচাপ। ফিল্মস্টার খুব সুন্দর লিখছেন –আমার জীবনের এটা একটা শিক্ষা। তোমার পাশে যখন আমি আছি, কোন কিছু করার জন্য না, আমি আছি তাতেই তোমার হবে। আমার আপনার জীবনে দেখবেন, আমাদের অনেক সময় মনে হয় জীবনের লড়াই আমিই লড়ে নেব, তুমি কেবল আমার পাশে থাক, তোমাকে কিছু করতে হবে না। কারণ আমি জানি তুমি পাশে থাকলে আমার যদি কোন দরকার পড়ে, তুমি আমার জন্য ওটা করবেই।

ওই ভদ্রলোকের জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল। সে নিজের ছেলের কাছে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল। প্রায়ই দেখা যায়, কেউ বিরাট কোন লোক হয়ে যাওয়ার পর ছেলেকে গিয়ে বলবে, জানো বাবা! আমি তোমার জন্যই তো এত কিছু করলাম। ছেলে বলে যে, আমার তো এগুলো দরকার ছিল না, আমার তো দরকার ছিল তোমাকে। যে রূপে আমি তোমাকে ভালবেসেছি, সেই রূপেই আমি তোমাকে চাই। একজন মহিলা, তার সন্তান আছে। মহিলা এখন চলল নিজের ক্যারিয়ার বানাতে একটা কোন বড় কোম্পানিতে কাজ করতে বা সিনেমাতে কাজ করতে। প্রচুর টাকা-পয়সা অর্জন করে এনে ছেলেকে বলল, সব কিছু তো আমি তোমার জন্যই করলাম। ইতিমধ্যে মাঝখান থেকে একাকীত্ব গ্রাস করে নেওয়ার ফলে ছেলে ড্রাগ এডিকটেড হয়ে গেছে। ছেলের দরকার ছিল মায়ের সান্নিধ্য। কেন তুমি সন্তানের জন্ম দিলে? জন্ম দিয়েছ মানেই ওর সারা জীবনের দায়ীত্ব তোমার। মা হতে গেলে কেন? নারীবাদীদের কাছে এই কথাগুলো হয়ত পছন্দ হবে না। দায়ীত্ব যখন নিয়েছেন, দায়ীত্ব পালন করুন। এখানে এই যে অব্যভিচারিণী ভক্তি, এখানেও বলতে চাইছেন, তোমাকে এই রকম ভালবেসেছি, এই

রকমটিই চাই, অন্য কিছু আমার লাগবে না। তোমার উন্নতি তোমার ব্যাপার, তাতে আমার কি! জীবনেও তাই, ভক্তিতেও তাই। যদি কেউ বলে, তোমার জন্য এগুলো করেছি, বুঝবেন সে শুধু যে ফ্রড তাই নয়, একটা বদমাইস।

স্ত্রী যে স্বামীর সেবা করে সেও নিষ্ঠাভক্তি, দেবর, ভাসুরকে খাওয়ায়, পা ধোওয়ার জল দেয়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ। সেইরূপ নিজের ধর্মতেও নিষ্টা হতে পারে। এগুলো নিজেকে বুঝতে হয়, অন্য কেউ বোঝালে হবে না। যার সঙ্গে যে বণ্ডটা রেখেছেন, আপনাকে ওইটাই সারা জীবন রাখতে হবে। যদি পাল্টান, তাহলে জেনে নিন, ও গেল। আপনি মা, সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, এরপর আপনি বলছেন –self-fulfillment, self-expression? তাহলে ছেলেকে হারাবেন। আপনি বিয়ে করলেন, বিয়ে করে বলছেন, ক্যারিয়ার বলেও তো একটা জিনিস আছে। আপনি যান আপনার self-fulfillment হবে, কোন অসুবিধা নেই, আপনার self-expression হবে, কেউ নিষেধ করছে না; কিন্তু স্বামীকে হারাবেন। যে জায়গায় শুরু, ওটাকে সারা জীবন আপনাকে ওভাবেই নিয়ে যেতে হবে। কৃষ্ণকেই গোপীরা বলছেন, এঁর সঙ্গে আলাপ করে আমরা দ্বিচারিণী হব? কৃষ্ণকে যে গোপীরা ওই ভাবেই ভালবেসে ছিল।

এই মাটি; এই গঙ্গা, নর্মদা নদী; ঋষিদের দেওয়া এই সনাতন ধর্ম, বেদ-উপনিষদের এই ভূমি; এখানে আমি আছি। তার সঙ্গে আমার এই বোধ হয়ে গেছে, এবার আমাকে এটা কাজে লাগাতে হবে। বোধ যদি না হয়ে থাকত তাহলে কোন সমস্যা ছিল না। এই জিনিসগুলো যে কোন না কোন কাজে লাগে, এই বোধ হয়ে গেছে। এটাকে নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া যায় না, সেইজন্য আমার নিজের রক্ষা নিজেকে করতে হবে। এটাই নিষ্ঠা ভক্তি, কিন্তু কারুর প্রতি বিদ্বেষের কিছু নেই।

আমার নিজের ব্যক্তিগত কথা বলি, কলেজে পড়ার সময় মুসলিম বন্ধুরা আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ওই বন্ধুর উপর একটা লেখা আমার ব্লগে দেওয়া আছে। এখন সে বেঁচে নেই কিন্তু ওর পরিবার এখনও আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসে। খ্রীশ্চান কলেজে পড়েছি, খ্রীশ্চান ফাদাররা আমাকে খুব ভালবাসতেন। কলেজে আমার পার্সি বন্ধু ছিল, শিখ, জৈন বন্ধুরাও ছিল। আমার 'World of Religion' বইতে ওদের সবার নাম উল্লেখ করেছি। এরা সবাই আমার ভাল ভাল বন্ধু হতে পারে, কিন্তু তাই বলে আমি তোমার মত হয়ে যাব, কোন প্রশ্নই নেই।

ঠাকুর গঙ্গাস্নান করিয়া কালীঘরে গিয়াছেন। সঙ্গে মাস্টার। ঠাকুর পূজার আসনে উপবিষ্ট হইয়া, মার পাদপদ্মে ফুল দিতেছেন, মাঝে মাঝে নিজের মাথায়ও দিতেছেন ও ধ্যান করিতেছেন।

এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং, ইন্টারেস্টিং এইজন্য যে, ঠাকুর অবতার। অবতার যদি না মানেন, ঠাকুর সমাধিবান পুরুষ, মুহুর্মুহু সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে; তাও তো তিনি পূজা করছেন। হিন্দু ধর্ম কত কাঁচা লোকেদের হাতে ছিল, কথামৃত না পড়লে বোঝা যায় না। আমাদের একটা ধারণা যে, যাঁর সমাধি হয়ে গেছে তাঁর জন্য সব মিথ্যা, তিনি পূজা করেন না। তা নয়, ঠাকুর সমাধির পরেও পূজা করছেন। এটাই প্রকৃত অদ্বৈত ভাবে পূজা। কিভাবে অদ্বৈত ভাবে পূজা? মায়ের পাদপদ্মেও ফুল দিচ্ছেন আবার নিজের মাথাতেও দিচ্ছেন।

আমাদের সাধুদের মধ্যে একটা জোক আছে, খুব মজার জোক। মায়াবতীতে স্বামীজী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বামীজী চেয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে অদ্বৈতের ভাব, তাঁরা ওখানে গিয়ে অদ্বৈত ভাব নিয়ে সাধনা করবেন। কিন্তু সাধুদের মধ্যে যাঁদের ওখানে পোস্টিং হয়, তাঁরা তো সব সময় অদ্বৈত ভাবে থাকেন না, দ্বৈত ভাবেও থাকেন। আমাদের খুব নামকরা সাধু শ্রীমৎ স্বামী মুমুক্ষানন্দজী মহারাজ মায়াবতীর এক সময় অধ্যক্ষ ছিলেন। আমাকে খুব ভালবাসতেন, আমার ব্লগে ওনার উপর আমার একটা লেখাও আছে। উনি স্বভাবে ছিলেন বিরাট ভক্তিভাবের সাধু। সারা জীবন ভক্তি করে করে বড়

হয়েছেন। কিন্তু হয়ে গেলেন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। এবার ভাবুন ওনার কি অবস্থা। কোন মন্দির নেই, পূজো নেই, কোন অর্চনা নেই, কোন আচার নেই। ওখানে একটা মেডিটেশান রুম করা হয়েছিল। ভক্তরা যারা ওখানে বেড়াতে যায়, বেড়াতে গিয়ে হো হো করে শুধু ঘুরে বেড়াবে ভাল দেখায় না। মহারাজ খুব মিষ্টি করে ভক্তদের বলতেন, 'ঠাকুর সব জায়গায় আছেন, ওখানে একটা মেডিটেশান রুম আছে, ঠাকুর ওখানেও আছেন, আপনার ওখানে গিয়ে বসবেন'। তখন আমাদের বয়স কম ছিল, যা হয়, কম বয়স হলে একটুতেই হাসি পায়, আমাদেরও খুব হাসি পেয়েছিল। কিন্তু কি সুন্দর কথা! ঠাকুর সব জায়গায় আছেন, তাহলে কি মেডিটেশান হলে নেই? অবশ্যই আছেন, যান ওখানে গিয়ে ঠাকুরের ধ্যান করুন।

অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর আসন থেকে উঠলেন। ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করছেন আর মুখে মার নাম করছেন। বলছেন, **মা বিপদনাশিনী গো বিপদনাশিনী**। মাস্টারমশাই নিজের থেকে বলছেন যে, দেহধারণ করলেই দুঃখ বিপদ, তাই বুঝি জীবকে ঠাকুর শেখাচ্ছেন 'বিপদনাশিনী' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করে কাতর হয়ে ডাকতে।

কিছুক্ষণ পর নকুড় বৈষ্ণব এসেছেন। ভাবাবেশে পর পর ঠাকুক অনেকগুলো গান গাইছেন। শেষ গানটা গাইছেন –

মায়ে পোয়ে দুটো দুঃখের কথা কই।
কারুর হাতির উপর ছই, কারু চিঁড়ের উপর খাসা দই।

গানে বলতে চাইছেন, কারুর কপাল ভাল আবার কারুর কপাল মন্দ। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর বলছেন –**সংসারীদের সম্মুখে কেবল দুঃখের কথা ভাল নয়। আনন্দ চাই। যাদের অন্নাভাব, তারা দুদিন বরং উপোস করতে পারে, আর যাদের খেতে একটু বেলা হলে অসুখ হয়, তাদের কাছে কেবল কান্নার কথা, দুঃখের কথা ভাল নয়।**

খুব প্রয়োজনীয় কথা। আধ্যাত্মিক জগৎ, যেখানে আমরা আছি, এখানে সুখ-আনন্দ আমাদের বেঁধে রাখে; দুঃখ উপরের দিকে ঠেলে দেয়। মুণ্ডকোপনিষদে দুটো পাখির কথা দিয়ে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পাখি কটূ ফল খেলে সে ওই ডাল ছেড়ে উপরে চলে যায় আর মিষ্টি ফল খেলে ওই ডাল ছেড়ে যেতে চায় না, ওখানেই বসে থাকে। সংসারে এটাই পুরো উল্টো হয়ে যায়। দুঃখ হল, নদীতে পুকুরে সাঁতার কাটছেন, কিন্তু পায়ে একটা পাথর বাঁধা আছে, টেনে পিছিয়ে নিয়ে আসে। আনন্দ, আপনাকে খুলে দিল, ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে যায়। দুঃখ পিছনের দিকে টানে, আনন্দ সামনের দিকে ঠেলে দেয়। সেইজন্য কারুর কাছে দুঃখের কথা বলতে নেই। বাইবেলে যীশু কত সুন্দর বলছেন, বরযাত্রীরা এসেছে, বর যতক্ষণ আছে বরযাত্রীরা কেন দুঃখ করবে। স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজকে (খোকা মহারাজ) ঠাকুর বলছেন, এই সব সময় হৈ হৈ করিস, জপধ্যান করিস না? মহারাজ ঠাকুরকে বলছেন, জপধ্যান করার হলে আপনার কাছে আসতাম কেন? ঠাকুর আছে আনন্দ কর। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, যতদিন ঠাকুর আছেন এটাকে কাজে লাগিয়ে নাও। দুটো আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী। যাঁরা একমাত্র আধ্যাত্মিক তত্ত্বলাভের জন্য লেগে আছেন, তাঁদের জন্য দুঃখ হল আশীর্বাদ। আমাদের সাধুজীবনেও বলা হয়, দুঃখ হল আশীর্বাদ, উপরে নিয়ে যায়। দেববাণীতে স্বামীজী বলছেন, আধ্যাত্মিক জীবনে যত এগোয় দুঃখ তত ঘন ঘন আসে। এটা আবার সংসারীদের জন্য ভাল না। তেমনি সংসারীদের সামনে বৈরাগ্যের কথা বেশি বলতে নেই।

পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম। যেখানেই দুঃখের কথা দেখবেন, সেখান থেকে সরে আসবেন। সিনেমাতে যদি দেখেন দুঃখের কাহিনী, ওই সিনেমা দেখা ছেড়ে দিন। নাটক-নভেলেও একই ব্যাপার, দুঃখ থাকলে ছেড়ে দিন। খবরের কাগজে আজেবাজে খবরগুলোকে এড়িয়ে যান। আমার মন

এমনিই বিষিয়ে আছে, আবার নূতন করে কেন বিষ নিতে যাব। আপনি বলবেন –কেন, জগতের বাস্তবটা একটু দেখুন। আমাদের কাছে জগতের বাস্তব একটাই, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। এক কলেজের কোন সেমিনারে একটা প্যানেল ডিসকাশান হবে, সেখানে আমাকে বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল; বিষয় ছিল –ছাত্ররা রাজনীতি করবে কিনা। আমি সরাসরি বলে দিলাম, ছাত্ররা পড়তে এসেছে পলিটিক্স কেন করবে? একজন ভদ্রলোক এর বিরুদ্ধে বলতে লাগেলন; 'না, পলিটিক্সটা এখন জীবনের বাস্তব'। আমি বললাম, 'জীবনের বাস্তব তো বিয়ে থা করা, তাহলে ক্লাশ ফোর ফাইভ থেকে বাচ্চাদের বিয়ে দিয়ে দিন'। ভদ্রলোক চুপ করে গেলন। কোথাও আপনাকে একটা দাড়ি টানতে হবে। সব কিছু বাস্তব দিয়ে justify করছেন। দুঃখ যদি বাস্তব হয়, তাহলে আনন্দটা আরও বড় বাস্তব –কারণ ঈশ্বরের নাম সৎ, চিৎ ও আনন্দ।

বৈষ্ণবচরণ বলত, কেবল পাপ পাপ –এ-সব কি? আনন্দ কর।

বাইবেলে কোথাও পাপের কথা নেই, কিন্তু খ্রীশ্চান ধর্ম কোথা থেকে নিয়ে এলো পাপ। যীশুও আনন্দ করতে বলছেন। আমি যদি সত্যিই একবার জেনে যাই যে, ঠাকুর সত্য, আমি তো আনন্দে নৃত্য করতে থাকব। একটা আড়াই থেকে চার বছরের বাচ্চার কাছে মা নেই, কোথাও গেছে, মার জন্য বাচ্চা কাঁদছে। মা ফিরে এসেছে। এখন বাচ্চা কি করবে? আনন্দে তো ধেই ধেই করে নাচবে। আমাকে অনেক সময় ইয়ং ছেলেমেয়েরা এসে জিজ্ঞেস করে, 'স্বামীজী, ঈশ্বর আছেন কি'? আমি বলি, 'আমি তো দেখিনি, কি করে বলব? আমাদের গুরুজনরা বলেছেন, গুরুজনদের বিশ্বাস করি; তাঁরা বলেছেন ঈশ্বর আছেন, আমার কাছেও তাই ঈশ্বর আছেন'। 'তাহলে আপনি গেরুয়া কেন পরেছেন'? 'ঈশ্বর যে আছেন, এটা বোঝার জন্য'। আমাদের এতটুকুও যদি বিশ্বাস হয়ে যায়, ঈশ্বর আছেন, তখন আনন্দ ছাড়া তো আর কিছু হবে না।

তিনি সৎ, সৎ মানে অস্তিত্ব, কোন কিছুকে ভয় পেতে নেই। তিনি চিৎ, অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর তিনি আনন্দ, আনন্দ করে থাকতে হবে। আবার গান হচ্ছে, খুব সুন্দর সুন্দর গান। ঠাকুরের মহাভাব। আগে আমরা কয়েকবার আলোচনা করেছি, কিভাবে মহাভাব হয়।

গোস্বামী কীর্তনিয়া ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়ে করজোড়ে ঠাকুরকে বলছেন – **আমার বিষয়বুদ্ধি ঘুচিয়ে দিন**।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) –"সাধু বাসা পাকড় লিয়া"। এই যে সৎএর কথা বলা হল, সৎ মানে সত্য কথা না; অস্তিত্বের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া, এর মানে বাস পাকড়ানো; ঈশ্বরের সঙ্গে আমি জুড়ে গেলাম। ঠাকুর বলছেন –**তুমি এত বড় রসিক, তোমার ভিতর থেকে এত মিষ্ট রস বেরুচ্ছে**।

গোস্বামী –প্রভু, আমি চিনির বলদ, চিনির আস্বাদন করতে কই পেলাম?

আবার কীর্তন চলিতে লাগিল। এই পরিচ্ছেদ এখানেই শেষ হয়ে যায়।

নবম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় বলরাম ও অধরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

২রা জুন, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ (পৃঃ ১৯০), ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে গাড়ি করে কলকাতা আসছেন। আজ ঠাকুর বলরামের বাড়ি হয় অধরের বাড়ি যাবেন। প্রথমে বলরামের বাড়ি এসেছেন। ঠাকুর গাড়ি করে আসতে আসতে রাখাল ও মাস্টার প্রভৃতি ভক্তদের বলছেন –**দেখ, তাঁর উপর ভালবাসা এলে পাপ-টাপ সব পালিয়ে যায়, সূর্যের তাপে যেমন মেঠো পুকুরের জল শুকিয়ে যায়**।

আবার বলছেন – **বিষয়ের উপর, কামিনী-কাঞ্চনের উপর, ভালবাসা থাকলে হয় না। সন্ন্যাস করলেও হয় না যদি বিষয়াসক্তি থাকে। যেমন থুথু ফেলে আবার থুথু খাওয়া**। আপনি একটা পথ নিয়ে নিলেন, আমি ঈশ্বরের পথে যাচ্ছি; কিন্তু আবার বিষয়ে নেমে যাচ্ছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়িতে ঠাকুর আবার বলিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীরা সাকার মানে না। (সহাস্যে) নরেন্দ্র বলে 'পুত্তলিকা'। এটা ১৮৮৩ সালের কথা চলছে, নরেনের তখন বয়স কুড়ি বছর, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব আছে, তাই সাকারবাদীদের তিনি বলতেন 'পুত্তলিকা'। **আবার বলে, 'উনি এখনও কালীঘরে যান'?** এটা খুব ইন্টারেস্টিং –উনি এখনও কালীঘরে যান। আমাদের সন্ন্যাসীদের ভিতরে এটা একটা জোক হয়ে আছে। কোন সাধু যদি বেশি রিচুয়ালসে যান, তাঁকে মজা করে বলা হয় –উনি এখনও কালীঘরে যান। ঠাকুরও মজা করে বলছেন, মিষ্টি করে বলছেন। এই জিনিসটাকে একটু বোঝা দরকার।

ঠাকুর আবার ভাবে চলে গেলেন। মাস্টারমশাই বর্ণন করছেন –**বুঝি দেখিতেছেন, ঈশ্বরই জীবজগৎ হইয়া রহিয়াছেন, ঈশ্বরই মানুষই হইয়া বেড়াইতেছেন। জগন্মাতাকে বলিতেছেন, "মা, এইকি দেখাচ্ছ! থাম; আবার কত কি! রাখাল-টাখালকে দিয়ে কি দেখাচ্ছ! রূপ-টুপ সব উড়ে গেল। তা মা, মানুষ তো কেবল খোলটা বই তো নয়। চৈতন্য তোমারই"**।

পরে ঠাকুর বলছেন, **ইদানিং ব্রহ্মজ্ঞানীরা মিষ্টরস পায় নাই, চোখ শুকনো, মুখ শুকনো; প্রেমাভক্তি না হলে কিছুই হল না**। রাধাকৃষ্ণের ভক্তি ঠাকুর মানছেন। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন –*স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা, মোদনীয়* মান আনন্দিত হওয়া, যেঁটা আনন্দ পাওয়ার, সেটাকে নিয়ে তারা আনন্দ করে। ধর্ম করে আপনার চোখ, মুখ যদি শুকনো শুকনো দেখায়, ধর্ম করে যদি আপনার ভিতর বিষের কুণ্ড জ্বলতে থাকে, তাহলে আপনি কিসের ধর্ম করছেন! *রসো বৈ সঃ,* তিনি রসস্বরূপ, রসের সাগর, তাঁকে যদি পাওয়া যায়, তখন রস ছাড়া আর কি হবেন। চিনির পাহাড়ে যদি বাস করেন, মিষ্টি ছাড়া আপনি আর কি দেবেন! তাহলে কেন আপনার ভিতরে কামের আগুন, ক্রোধের আগুন জ্বলছে; আপনার ভিতরে কেন এত দুঃখ-কষ্ট?

ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে এত যেতেন, কিন্তু কখনও তিনি কারুর নিন্দা করতেন না; কেশবচন্দ্র সেনকে ভালবাসতেন, নরেনও ব্রাহ্মসমাজ থেকে এসেছেন। কিন্তু একটা সহজ সত্য কথা বলে দিচ্ছেন –ভাই ঈশ্বরকে তুমি যদি এতই ভালবেসে থাক, তাহলে তোমার চোখে মুখে আনন্দের ভাব নেই কেন? খবরের কাগজে যখন দেখি যে কেউ সুইসাইড করেছে, তখন প্রথমে আমার মনে হয়, মরার আগে দু মিনিট যদি ওর সাথে কথা বলতে পারতাম, তাহলে জিজ্ঞেস করতাম –কি তোমার দুঃখ? যার জন্য তুমি এই অমুল্য জীবনটাকে হারিয়ে ফেলতে চাইছ? আমি তোমাকে আটকাতে পারব না, কিন্তু আমার শুধু জানার ইচ্ছা, এমন কি দুঃখ পেলে?

যিনি *রসো বৈ সঃ,* যিনি My Father in heaven, আমি তাঁকে ভালবাসছি। একটা ছেলে যদি একটা মেয়েকে পেয়ে যায়, রাস্থায় ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে যায়। একটা মেয়ে যদি তার মনের মত কোন ছেলেকে পায়ে যায়, তার মুখ থেকে সব সময় গান বেরোতে থাকে। সেখানে আপনি ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছেন, তাঁকে ভালবাসছেন, আনন্দে আপনার মুখ থেকে ভক্তি গান বেরোবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানগুলো দেখুন, কি মাধুর্য, বোঝা যাচ্ছে ভিতরে কোথাও আনন্দ আছে। ভিতরে যদি আনন্দে না থাকে, মুখে কি করে আনন্দের ভাব আসবে, নকল করে আর যাই আসতে পারে, আনন্দের ভাব আনা যায় না। কিছু আনন্দ তো সেখানে রয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মসমাজের লোকেদের চোখে মুখে সেই আনন্দ নেই। ঠাকুর তাই বলছেন, এদের চোখ শুকনো, মুখ শুকনো; প্রেমাভক্তি না হলে কিছুই হল না।

কিন্তু নরেন তিনি কমিটেড, এমনকি নরেনের পিতৃদেব বলছেন, কোথা থেকে এই ব্রহ্মদৈত্য এসেছে? ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়ে ছিলেন বলে, বলছেন ব্রহ্মদৈত্য এসেছে। বিশ্বনাথ দত্ত লিবারেল ছিলেন, কিন্তু নরেনের কিছু কিছু আচার-ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এত বড় একজন সাধু মহাপুরুষ, নরেনের মাথায় আছে, এত বড় সাধু-সন্ন্যাসী তিনি কেন কোন দেবদেবীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন? এবার ভেবে দেখুন, এর দশ বছর পর এই নরেন যখন শুরু করলেন বলতে Sisters and brothers of America, এখনও এই কথা ভাবলে আমাদের শরীরে কাঁটা দেয়, আমাদের আনন্দ হয়, আমাদের ভিতরে উৎসাহ বর্ধন হয়। তার দশ বছর আগে ঠাকুরকে বলছেন 'পুত্তলিকা', আর বলছেন, 'উনি এখনও কালীঘরে যান'।

এই হচ্ছে দেখার ধর্মের কি প্রভাব! তখনও ঠাকুর তাঁর গুরু হননি, তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলছেন, উনি এখনও কালীঘরে যান। সেই ধর্ম যখন ভিতরে ঢুকল, নরেন তারপর শুধু স্বামী বিবেকানন্দ হলেন না, তিনি হলেন যুগাচার্য। তাই না, তাঁর কথাগুলো এখনও আমাদের ভিতর শিহরণ জাগিয়ে দেয়, শক্তিতে ভরপুর করে দেয়। ধর্ম প্রবেশ করলে কি হয়, এই ধর্মের ছোঁয়া যদি আপনার লাগে, তাহলে আপনার কি হওয়ার কথা, একবার ভেবে নিন। নরেনের ভিতর ধর্ম প্রবেশ করল, আর তিনি সারা বিশ্বকে তোলপাড় করে দিলেন। আপনাকে সারা বিশ্বে তোলপার লাগাতে হবে না, ধর্মের প্রবেশে আপনার জীবনেই একটা তোলপাড় হোক, একটু তো হোক। আপনি অনুভব করুন, আমার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, ধর্ম ঢুকছে বলে। এখানে কোন ইমোশানালিজম্ থাকবে না। স্বামীজী যখন বলছেন, Sisters and brothers of America, কোন উত্তেজনা নেই, কোন ইমোশান নেই, পুরো শান্ত, স্নিগ্ধ, সমাহিত। তিনিও তখন জানতেন না, এই শব্দগুলো ধর্ম জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। এই ধর্ম হল পরশমণি, দেখুন ছোঁয়া লাগছে কিনা, আর কিছু না হোক আপনার চেহারাটা আনন্দে ভাসছে কিনা দেখুন।

ঠাকুর বলছেন, **মা, তোমাকে বলেছিলাম, একজনকে সঙ্গী করে দাও আমার মত। তাই বুঝি রাখালকে দিয়েছে**। রাখাল যেন Alter ego, একই প্রাণ দুই শরীর।

ঠাকুর অধরের বাড়ি এসেছেন। কীর্তনের আয়োজন হয়েছে। যেখানেই ঠাকুর যেতেন সেখানে কীর্তনাদির আয়োজন হত। পাড়া-প্রতিবেশীরা অনেকে এসেছেন। এমনটাই হয়, কাউকে যখন বাড়িতে আনা হয়, আশেপাশের লোকেদের মধ্যে কৌতুহল তো একটা জাগে। আগেকার দিনে গ্রামদেশে বিয়ে করে বৌমাকে নিয়ে এলে সেখানে গ্রামের কুড়ি পঁচিশজন পৌঁছে যেত। মানুষ নূতনের দিকে দৌড়ায়। নূতন সব সময় মানুষকে আনন্দ দেয়, পুরনো জিনিস মানুষকে একঘেঁয়ে করে। একমাত্র সচ্চিদানন্দ যিনি তিনি সেই পুরাতন, কিন্তু তিনি অনন্ত কিনা তাই ওনার নূতনত্ব কখন শেষ হয় না। এখানেও সেই একই চিত্র। **অধরের বৈঠকখানায় অনেকগুলি ভক্ত ও প্রতিবেশী ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলের ইচ্ছা ঠাকুর কিছু বলেন**। ঠাকুর এখানে কথা বলতে গিয়ে বলছেন –

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) –সংসার আর মুক্তি দুই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনিই সংসারে অজ্ঞান করে রেখেছেন; আবার তিনিই ইচ্ছা করে যখন ডাকবেন তখন মুক্তি হবে। ছেলে খেলতে গেছে, খাবার সময় মা ডাকে।

যখন তিনি মুক্তি দিবেন তখন তিনি সাধুসঙ্গ করিয়ে নেন। আবার তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা করে দেন।

এই বিষয়টা আগেও অনেকবার এসেছে, পরেও অনেকবার আসবে। কথামৃতের একটাই সুর – ঈশ্বরদর্শন। উপনিষদেরও একটাই সুর –মুক্তি বা আত্মজ্ঞান। ঈশ্বরদর্শন আর মুক্তি একই জিনিস। সেইজন্য এই জিনিসগুলো কথামৃতে ঘুরে ঘুরে অনেক ভাবে আসে। তবে উপনিষদ যেমন একটা

জিনিসকে পোঁ ধরে আছে, কথামৃতে তা নেই। যাঁদের সময় আছে কিন্তু সময় কাটে না, অথচ ইচ্ছা আছে যে সৎচিন্তনে সময় কাটাবেন, আপনারা তাহলে কথামৃতকে নিয়ে রিসার্চ করতে পারেন। সবচেয়ে সহজ একটা বিষয় হতে পারে –ঠাকুর ঈশ্বরের ব্যাপারে কি কি বলেছেন। যদি বেশি সময় থাকে তাহলে কথামৃতে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানকে কিভাবে দেখা হয়েছে, এই বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। কথামৃতে ভগবান কিরূপ বলছেন, ভক্ত কে হতে পারে আর ভক্তি কিভাবে হতে পারে। চেষ্টা করে দেখুন, দেখবেন জীবনটা ধন্য হয়ে যাবে। কাউকে দেখানোর জন্য আপনি করছেন না, আপনার চিন্তার স্তরকে উন্নত করার জন্য করা।

আমাদের ছিলেন স্বামী ভাবঘনানন্দজী মহারাজ। বাইরের লোকেরা ওনাকে সেভাবে জানতেন না। ট্রেনিং সেন্টারে ছিলেন, আর প্রায় সারা জীবন ওখানেই ছিলেন। আমার আচার্যের কাছে শুনেছি, উনি নাকি কথামৃত সংস্কৃতে অনুবাদ করতেন। অনেকটা লেখা হয়ে গেলে উনি পুরো লেখাটা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতেন। আসলে ওটা কারুর জন্য নয়, এটাই ওনার সাধনা। গীতার উপর ওনার খুব সুন্দর বই আছে, উদ্বোধন থেকে বেরিয়েছে। একজন বড় মাপের পণ্ডিত আর খুব সহজ সরল। রামকৃষ্ণ মিশনের সবাই সহজ সরল, কিন্তু উনি যেন আর-একটু বেশি। আপনারাও এটাকে সাধনা রূপে নিতে পারেন। কথামৃত ঠিক ঠিক মনযোগ দিয়ে পড়লে দেখবেন, হিন্দু ধর্মের যে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, আপনার সামনে পরিষ্কার হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তার সাথে আর-একটা কথা বলি, এই ধরণের সাধনা না থাকলে মন ঈশ্বরের দিকে যায় না, আসল কথা খাটতে হয়, ঠাকুর যে কথা অনেকবার বলছেন। এখানে ঠাকুর বলছেন, সবটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা; এটাই এখানে বলবেন মায়ের ইচ্ছা।

যখনই আমরা, ঈশ্বর, ভগবান এই শব্দগুলো নিয়ে আসি, অজান্তায় তখন আমাদের মনে কিন্তু এই ভাব এসে যায় যে, উপরে একজন আছেন যিনি ওখান থেকে সব কিছু চালাচ্ছেন। অজান্তায় ইসলামের যে ভাব, ভগবানকে ওনারা যেভাবে দেখেন, সেই ভাবটা এসে যায় –তিনি নিয়ন্তা। কিন্তু আমাদের হিন্দুদের কাছে তিনি নিয়ন্তা ঠিকই আবার তিনি অন্তর্যামীও, একাধারে তিনি আমাদের নিয়ন্তা আবার আমাদের সবার অন্তর্যামীও। যেমন তিনি সবার নিয়ন্তা, তেমন তিনি সমস্ত ভূতের অন্তর্যামী। শুধু নিয়ন্তা রূপে দেখাটা ইসলামে যেমন আছে তেমনি জুহুদিদেরও মধ্যে আছে। খ্রীশ্চানদের কেমন যেন সব কিছু মিলেমিশে রয়েছে, সেইজন্য তাদেরও অনেক ধরণের সমস্যা এসে যায়।

তখন প্রশ্ন আসবে, কেন তিনি একজনকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, কেন কাউকে তিনি বন্ধনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি কেন কাউকে ভাল করেছেন, কেন কাউকে খারাপ বানিয়েছেন, কেন কাউকে বড়লোক করেছেন, কেন কাউকে সাধারণ লোক করেছেন; এই কেন কেন কেন আসতেই থাকে –এই কেনর কোন উত্তর নেই। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা হয় না, হিন্দুদের কাছে তিনি শুধু উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন না, তিনি আবার অন্তর্যামী হয়ে প্রত্যেকটি প্রানীর হৃদয়গুহায় বসে আছেন। কিন্তু প্রশ্ন বা সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে, তা হল, এটা কে ঠিক করেন, কিভাবে ঠিক করেন, কেন করেন? এই প্রশ্নের উত্তর কারুর কাছে নেই।

রাজযোগ এই জিনিসটাকে খুব স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন যে, কিভাবে মনের কোন স্বাধীনতা নেই। আমরা মনে করছি মন স্বাধীন, আসলে মন স্বাধীন নয়। যা কিছু হয় সবটাই হয় চৈতন্যের ইচ্ছাতে। এর আগে ঠাকুর বললেন, মানুষ তো কেবল খোলটা বই তো নয়। চৈতন্য তোমারই। চৈতন্য ছাড়া অন্য কেউ ইচ্ছা করতেই পারে না। যদি এমন হত, কিছুটা তোমার ইচ্ছা, কিছুটা আমার ইচ্ছা, তবেই এই সমস্যা হত। যদি দুই থাকত তবেই এই সমস্যা হত। এক বই আর কিচ্ছু নেই। যিনি এক, তিনিই বুদ্ধি রূপে আছেন, তিনিই মন রূপে আছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পঞ্চম অধ্যায়ে দেবতারা স্তুতি করে বলছেন, *যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা*, বুদ্ধিটাও তিনি। সমস্ত ভূতের মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, সেটা তিনি। যাঁদের আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, যাঁরা আচার্য, অবতার; তাঁরা জানেন ঈশ্বর বই আর কিছু

নেই, ঈশ্বর ছাড়া স্বাধীন ইচ্ছা কেউ করতে পারে না। কিন্তু আমরা মানুষ, আমাদের মনে হয়, আমার ইচ্ছাতে আমি সব করি।

কথামৃতে এই বিষয়ের উপর আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। যতই আমরা আলোচনা করি, যতই আপনারা শুনুন, যতই চিন্তা-ভাবনা করুন, অশ্বত্থ গাছ কেটে দিলে আবার পরের দিন যেমন ফেকড়ি বেরিয়ে আসে, তেমনি আগামীকাল আবার আমাদেরও ফেকড়ি বেরিয়ে আসবে। এই অহং ভাব যায় না, যেতে চায় না, ঘুরে ঘুরে এসে যাবে। তাই নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন, শাস্ত্র পাঠ, জপধ্যান করতে হয়। অন্তর্যামী যাঁর মূল, তাঁর বিস্তারটাও তাঁর। এটাই ঠাকুর বলছেন –যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। কখন তিনি নিত্যে থাকতে চান, কখন তিনি লীলায় থাকতে চান। ঠাকুর এই জিনিসগুলোকে বোঝাবার জন্য, ধারণা করবার জন্য এত উপমা দিয়েছেন যে, এত উপমা শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যাবে না। শাস্ত্রের পক্ষেও সম্ভব না, কারণ শাস্ত্র যাঁরা রচনা করেন, তাঁরা মূল জিনিসটাকে লিখে চলে যান। কিন্তু ঠাকুর এখানে কিছু রচনা করছেন না, ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। যে যেমন প্রশ্ন করছেন, ঠাকুরও তাঁর মত করে বোঝাচ্ছেন। বক্তব্য হল, আমি, আপনি, সবাই সেই ঈশ্বরেই বাস করছি; সেই ঈশ্বরেই ঘুরঘুর করছি, কিন্তু লীলাতে। লীলাতে সুখ-দুঃখ আসে, লীলাতে কাম-ক্রোধ আসে। আমাদের কাছে দুঃখটা যেমন বাস্তবিক, সুখটাও আমাদের কাছে বাস্তবিক। সমস্যা হল আমরা লীলার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি।

যাঁরা এই ক্লাশগুলো শোনেন, দেখবেন, শুনতে শুনতে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, আপনার চোখ দিয়ে হয়ত জলও বেরিয়ে আসছে। এই কথা বলতে গিয়ে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমেরিকা যখন স্বাধীন হয় তখন সেই সময় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন, ওনার একটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল নোট্ আছে, চটি বই কিন্তু খুব সুন্দর। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একটা ঘটনায় বলছেন, তখন আমেরিকা স্বাধীন হয়েছে, নূতন ভাবে তৈরী হচ্ছে। আর সেই সময় প্রচুর খ্রীশ্চান যাজকরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। মাইক ছিল না, খোলা বিশাল মাঠে খালি গলায় এই সব যাজকরা খ্রীশ্চান ধর্মের উপর লেকচার দিতেন।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একটা ঘটনার বর্ণনা করছেন। এই রকম একজন খ্রীশ্চান ফাদার ছিলেন, প্রায় এক কিলো মিটার পর্যন্ত তাঁর গলা একই রকম শোনা যেতে, তার মানে গলার এত জোর ছিল। একবার উনি পরীক্ষা করার জন্য সভাস্থলের একদিক থেকে অন্য দিক হেঁটে গেলেন, দেখছেন ফাদারের গলা একই রকম শোনা যাচ্ছে, এত জোরাল গলার আওয়াজ। ওই ফাদার যখন বলতেন, তখন শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনতেন আর লেকচারের পর ওনাকে ডলার দান করতেন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন পণ্ডিত লোক ছিলেন। পরে তিনি ফ্রান্সে এ্যমবাসাডর হয়ে গিয়েছিলেন। আর আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকায় সেটা যে তড়িৎ শক্তি, তিনি তা প্রমাণিত করেছিলেন। ফ্রাঙ্কলিন একদিন ওনার লেকচারে এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে উনি ফাদারকে দশ ডলার দিতে চাইছেন। আর যাতে তিনি মুগ্ধ হয়ে ফাদারকে অনেক ডলার না দিয়ে ফেলেন, তাই পকেটে ডলার নিয়ে যেতেন না। কিন্তু ফাদার এমন ভাবে বলছেন, যে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। পাশে একজন পরিচিত লোক দেখতে পেয়ে তাঁকে বলছেন, 'আমাকে দশ ডলার দেবেন'? সেই ভদ্রলোক বলছেন, 'আপনি মুগ্ধ হয়ে সম্মোহিত হয়ে গেছেন। এই মিটিংটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমি আপনাকে দশ ডলার দেব, এখন দেব না'। ফ্রাঙ্কলিন খুব মজা করে এই ঘটনাটা লিখেছিলেন।

আসলে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই; সিনেমা দেখতে গিয়ে, নাটক দেখতে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে যাই। লীলাতেও আমরা ঠিক এই রকম মুগ্ধ হয়ে আছি। এমন মুগ্ধ হয়ে গেছি যে, আমরা আমাদের আসল যে স্বরূপ নিত্য, সেটাই ভুলে গেছি। ভিতরে যিনি অন্তর্যামী, যিনি মনকে আশ্রয় করে লীলা দেখছেন, দেখতে দেখতে বিরক্তি এসে যায়। বিরক্তি এসে গেলে বলে, আর না। মনকে বলেন –মন চল নিজ নিকেতনে। কিন্তু বললেই তো নিজ নিকতেন যাওয়া যাবে না, কাঠখড় পোড়াতে হয়। তখন কিছু কিছু জিনিস হয়,

প্রথম যেটা হয় সেটা হল, সত্ত্বগুণের উদয় হয়। ঠাকুরও এই সত্ত্বগুণের উদয়ের কথা আগে আগে বলেছিলেন। আপনার আহার, নিদ্রা, মৈথুন সবটাই সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে নেয়। বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ সরে গিয়ে সত্ত্বগুণের দিকে চলে যায়।

তিনটে জিনিস হয়। একটা হল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গের আবার দুটো ভাগ। একটা হল সাধুদের মুখে ঈশ্বরীয় কথা শোনা, তার সঙ্গে হল শাস্ত্র, শাস্ত্রসঙ্গ। শাস্ত্রকে সাধুসঙ্গ হিসাবে নিতে পারেন, আলাদা করেও নিতে পারেন। সেখান থেকে যখন আরও এগিয়ে যায়, তখন আসে ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা খুব সহজে আসে না। আমি অনেক মহারাজদেরও জিজ্ঞেস করেছিলাম, সবাই মোটামুটি একই কথা বলছেন –ব্যাকুলতা আসা অনেক কঠিন, ব্যাকুলতা আসাটা অনেক অনেক উচ্চস্তরের ব্যাপার। আর কার ভিতরে ভিতরে কি কি জিনিসের জন্য ব্যাকুলতা আছে, আমরা কি করে বুঝব। অনেক সময় ব্যাকুলতাটা ইমোশানসের খেলার মত আসে। সঙ্ঘে অনেকদিন আছি, অনেক কিছু দেখেছি। কিন্তু সাধুর প্রতি প্রীতি, সাধু বলতে সাধু, রামকৃষ্ণ মিশনের যে মন্দিরগুলো আছে, সেখানে যাওয়া, ঠাকুরের কাছে বসে থাকা বা ওই ধরণের উৎসবাদি পালন করা; তার সঙ্গে শাস্ত্রের প্রতি প্রীতি হয়ে যায়।

এখানে একটা উদাহরণ আনা যায়, খুব ভাল উদাহরণ হবে না, কিন্তু জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিভিন্ন সময় আমি রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম করেছি, এদিকে সেদিক যেতে হত। অনেকবারই আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু একটা ঘটনা আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। অনেক আগে, প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর আগে আমি অমরনাথ গিয়েছিলাম। দিল্লি থেকে যাওয়া শুরু হল। দিল্লি পর্যন্ত জানা ছিল। তারপর সব হাঁ করে দেখছি –এটা হরিয়ানা, এটা পাঞ্জাব, জম্মু; সব জায়গাগুলো দেখছি যেগুলোর নাম শুনেছিলাম, এটা শ্রীনগর। স্বামীজীর বর্ণনাতে অমরনাথ পড়েছিলাম। অমরনাথ দর্শন করে ফেরা হল। দিল্লি এসে ট্রেনে উঠলাম। উঠে রাত্রিবেলা শুয়ে পড়েছি। ঘুম থেকে উঠে দেখছি সব চেনা জায়গা, আসানসোল, তারপরেই বর্ধমান এসে গেল। এ্যক্সপ্রেস ট্রেন ছুটে চলেছে। এবার জিনিসপত্র বাঁধা শুরু হল। একবার উঁকি মেরে দেখলাম, দেখছি বালি, তারপর বেলুড়, লিলুয়া। ট্রেন এবার আস্তে আস্তে হাওড়া স্টেশনে এসে থামল। জীবন দৌড়াচ্ছে। যখন সময় হয়ে যায়, তখন বলে, চল নিজ নিকেতনে। এবার চলতে শুরু করলেন, দেখছেন ওই তো বর্ধমান এসে গেছে। মেইন লাইন ধরে গাড়ি এগোচ্ছে, একটা একটা করে স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শেওড়াফুলি, উত্তরপাড়া, সব কিছু চেনা পরিচিত, কোন এ্যক্সাইটমেন্ট নেই, কিন্তু নিজের জায়গায় ফিরছি। কেমন একটা স্থৈর্যের ভাব, কেমন একটা স্থিরতার ভাব, সব কিছু শান্ত, শীতল মনে হচ্ছে।

জগতের কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে, নামযশের মধ্যে মানুষ দৌড়াচ্ছে। কথামৃতেই ঠাকুর এক জায়গায় বর্ণনা করছেন, দুই বন্ধু মেলাতে বেড়াতে গেছে। মেলাতে নানা রকমের ছবি টাঙানো আছে। এক বন্ধু আর-এক বন্ধুকে চিৎকার করে ডেকে বলছে, 'ওরে ওখানে কি আছে, এদিকে এসে দ্যাখ কিভাবে এক মহিলা উপপতিকে ঝাঁটা দিয়ে পেটাচ্ছে'। আমাদেরও একটা বয়সে এগুলো দেখতে ভাল লাগত –উপপতিকে ঝাঁটা পেটাচ্ছে। কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ, সাইন্স, আর্টস, স্পোর্টস, পলিটিক্স সব কিছু মনের মধ্যে ঘুরঘুর করছে। সব কিছু দেখে দেখে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন মনে পড়ে আমাকে তো ফেরৎ যেতে হবে আমার নিজ নিকেতনে। যখন ফেরত আসা শুরু হয়, তখন দেখছে আরে সবটাই তো আমার চেনা, তখনই আসে একটা স্থিরতা, একটা স্থৈর্যের ভাব। কি স্থিরতা? যখন এই শাস্ত্রগুলো শুনবেন, সাধুমুখে যখন এই বর্ণনাগুলো শুনবেন, তখন মনে হবে কেমন যেন কথাগুলো আমাকে টেনে নিচ্ছে। একটা স্থৈর্য, একটা শান্তির ভাব, মন তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে না। শাস্ত্র শুনে মন যদি আপনার তিড়িংবিড়ং করে লাফায়, তাহলে বুঝবেন আপনার ভিতরে কোন গোলমাল আছে, শাস্ত্র তাহলে আপনার জন্য নয়।

এই স্থিরতাটা তামসিক নয়, সাত্ত্বিক। এটাই আমার আপনার স্বরূপ। ওই স্বরূপত্বকে ফিরে পাওয়ার জন্য কি হয়, ওই স্বরূপের দিকে অর্থাৎ নিজের জায়গার দিকে যখন এগিয়ে আসে, তখন ভিতরে ভিতরে একটা আনন্দ হয়। মা যেমন নিজের সন্তানকে দেখে আনন্দ পান, নিজের স্থানকে দেখলে ঠিক সেই রকম আনন্দ হয়। শাস্ত্র পড়ে ভিতর থেকে যখন সেই আনন্দ হবে, যে আনন্দ আপনি অপরকে বোঝাতে পারবেন না, বুঝবেন সময় এসে গেছে। শাস্ত্র শুনে ভিতরে যে একটা আনন্দ হচ্ছে, এই আনন্দই সাধুসঙ্গ। শাস্ত্র রূপে এই সাধুসঙ্গ যখন হয়, বুঝবেন গাড়ি এবার এগোতে শুরু হল। নিজের স্থানের দিকে এগোচ্ছে, আস্তে আস্তে সব কিছু চেনা পরিচিত লাগতে শুরু হবে। কোন এ্যক্সাইটমেন্ট নেই, কিন্তু ভিতরে একটা আনন্দের ঢেউ উঠছে। আপনার যদি গীতা, উপনিষদ মুখস্ত থাকে; প্রত্যেক হিন্দুরই এই চারটে শাস্ত্র গীতা ও তার সঙ্গে অন্তত তিনটে উপনিষদ মুখস্ত করা উচিত; তখন দেখবেন অর্থ সমেত একটা কোন শ্লোক ভেসে উঠবে। দেখবেন মুখে একটা আনন্দের হাসি এসে যাবে। এখানে বাইরে থেকে কিছু আসছে না, বাইরে থেকে আপনাকে কিছু আনন্দের খোরাক দিচ্ছে, তা না, ভিতর থেকেই এই আনন্দ আসবে। এটাতে বোঝা যাচ্ছে, আপনার মোড় ফিরে গেছে।

এই মোড় কেন আপনার ফিরল, আমার কেন ফিরল না? এর কোন উত্তর নেই। এর উত্তর কারুর জানা নেই। আর কে এগিয়ে যাবেন, একই পথে কে একটু পিছিয়ে থাকবেন আমরা জানি না। সেইজন্য একটাই জিনিস জানতে হয়, নিজের মনকে বলতে হয়; মন এবার চল নিজ নিকেতনে। মনকে এই কথা বলতে থাকুন; এক বছর, দশ বছর, কুড়ি বছর বলতে থাকুন, তখন একদিন অবশ্যই মন বলবে, চল যাই। কিন্তু বাচ্চা মেলা থেকে বাড়ি ফিরতে চাইছে না, তাকে যেমন মেলা থেকে টেনে হিঁচড়ে বাড়িতে নিয়ে আসা, এটা তা নয়। এটা আপনার স্বাভাবিক স্থিতি।

পেণ্ডুলামের উদাহরণ আমরা আগেও দিয়েছিলাম। পেণ্ডুলাম যেখানে স্থিতি পায় সেটা তার সবচেয়ে অস্থির অবস্থা। যেটা পেণ্ডুলামের স্থান, সেটা ওর সব থেকে গতি। ঠিক তেমনি সংসারে আমাদের মনে হয় সংসারটাই সব থেকে শান্তির স্থান, কিন্তু সংসারটাই সব চাইতে অস্থিরতার জায়গা। ঈশ্বর হলেন আমাদের সব থেকে স্থিতির জায়গায়, কিন্তু ঈশ্বর থেকে সবাই পালাচ্ছে। মন্দিরে গেলে, কোন প্রবচন শুনতে গেলে বলবে আর কতক্ষণ থাকবে; আর কতক্ষণ শুনবে। পেণ্ডুলামের এই দোলনটা যখন আস্তে আস্তে কমতে শুরু হয় তখন ধীরে ধীরে সে স্থির হয়ে যায়। সংসারের অস্থিরতা থেকে মানুষের মন সরে এসে ঈশ্বরে যত স্থিত হয় তত সে স্থির হতে হতে, ওখানেই অবস্থিত হয়ে যায়।

এই অবস্থা আসার ঠিক আগে আসে ব্যাকুলতা। তখন বলে আমার জগতের কিছু লাগবে না, সংসারের কিছু লাগবে না। আমাদের অনেক শ্রোতারা বিভিন্ন ভাবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, তাঁদের অনেকেই বলেন –এই ক্লাশগুলো শোনার পর কারুর সাথে আর আগের মত কথা বলতে ভাল লাগে না। আমরা অনেক মহারাজদের দেখেছি, একটা বয়সের পর ওনারা দেশ-বিদেশের, সঙ্ঘের কোন খবর রাখতে চান না। কিছুদিন আগে আমাদের এক মহারাজ গত হলেন, ক্যান্সার ছিল। সবাই ওনাকে খুব ভালবাসতেন। একজন সাধু, যিনি ওনার সঙ্গে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ছিলেন, আমাকে বলছেন, "উনি একদিন মহারাজকে বলছেন, 'মহারাজ আপনার তো খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না'? উনি হেসে বলছেন, আরে ভাই ক্যান্সার হয়েছে, কষ্ট তো হবেই, এটা তো জানা কথা, অন্য কিছু কথা, শাস্ত্রের কথা, ঠাকুরের কিছু কথা বল"। মহারাজের স্থিরতা কোথাও অন্য দিকে চলে গেছে।

জীবনে আমাদের তো দুটো সম্পত্তি –একটা হল সময় আর আর-একটা মনের শান্তি, এই দুটো সম্পত্তিকে কেন হারাবেন, সযত্নে রক্ষা করুন। মনকে স্থির রাখুন। আপনার মন কি স্থিরতার দিকে যাচ্ছে? যদি যায়, তাহলে বুঝবেন, এবার আপনি এগোচ্ছেন। ব্যাকুলতাটা খুব কঠিন জিনিস। খুব কম লোকের ব্যাকুলতা আসে। ব্যাকুলতা কি রকম? ট্রেন দিল্লি থেকে আসছে, বালি, বেলুড় পেরিয়ে গেল। এবার জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলেন, একটু পরেই নামবেন। মনটা এবার অন্য দিকে চলে গেছে,

বাস পাওয়া যাবে কিনা, ট্যক্সি পাওয়া যাবে কিনা। এতক্ষণ ট্রেনের যে সঙ্গীদের সঙ্গে এত গল্পগুজব হচ্ছিল, সব হাওয়া।

প্রতিবেশী –মহাশয়, কিরকম ব্যাকুলতা? ঠাকুরের উদাহরণগুলো দৈনন্দিন জীবন থেকে নেওয়া, মানুষ তাই সহজেই বুঝতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –কর্ম গেলে কেরানির যেমন ব্যাকুলতা হয়! ইদানিং ইন্টারনেট হয়ে যাওয়াতে লোকেরা নিজের বায়োডাটা তৈরী করে বিভিন্ন কোম্পানীতে পাঠাতে থাকে। **সে যেমন রোজ অফিসে অফিসে ঘোরে, আর জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁগা কোনও কর্মখালি হয়েছে? ব্যাকুলতা হলে ছটফট করে – কিসে ঈশ্বরকে পাব!**

এখানে আমি একটা কথা বলি, ভক্তরা এসব কথা শুনে নিয়ে যা ঢং ঢাং করে, আসলে সব ড্রামা, ইমোশানাল ছাড়া কিছু না। ঠাকুর এখানে যে ব্যাকুলতার কথা বলছেন, এই অবস্থা অত্যন্ত উচ্চমানের সাধকের হয়। কারণ আমরা হলাম শান্ত ভাবের, যা কিছু সব ভিতরে। বাঁধা শুরু হয়ে গেল, এবার নামার প্রস্তুতি। তবে অন্য ভাবে যদি ব্যাকুলতা দেখা হয়, যেখানে মন সংসার থেকে একেবারে সরে গেছে; এই জিনিস প্রচুর আছে, সন্ন্যাসীদেরও দেখেছি, সংসারী ভক্তদের মধ্যেও দেখেছি। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলেন। ওনার সেক্রেটারী ওনাকে বলছেন, মহারাজ জানেন, এই জিনিসটা হয়েছে। মহারাজ সোজা বলে দিলেন, I don't know, I don't care to know, আমি জানিও না, জানার কোন আগ্রহও নেই। মালপত্র বাঁধা হয়ে গেছে, এখন এটাকে ব্যাকুলতাকে বলা যায় কিনা ভাবতে হবে। অর্থ হল, আমার কিছু লাগবে না।

ভাদ্র মাসের জলের যে তোড়, একটা বয়সে কামিনী-কাঞ্চনের তোড় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে, বাঁধ ভেঙে উড়িয়ে দেবে। পশুরা কাম বেগে পাগল হয়ে যায়, মানুষও কামবেগে পাগল হয়ে যায়। ওই বেগটাকে পেরিয়ে এলেন, এবার আস্তে আস্তে ওইদিকে যাওয়া। সেইজন্য আমাদের হিন্দুদের বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চাশ বছর হয়ে গেলে কাজ কমিয়ে দিতে হয়। ষাট পেরিয়ে আসার পর কাজকর্ম থেকে সরে আসতে হয়। বাড়ির লোকেরা আপত্তি করলেও সরে আসতে হয়। ঠাকুর যেমন বলছেন, সামান্য ঝোলভাত খেয়ে দিন চালিয়ে নিতে হয়, কারণ যা করার সব হয়ে গেছে। সব করা হল, সব দেখা হল, আর না, এবার নিজের স্থিতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। তবে এই যে ঠাকুর বলছেন, ব্যাকুলতা হলে ছটফট করে, এই ব্যাকুলতা খুব উচ্চমানের স্তরে হয়, এটা সচরাচর হয় না। আর ব্যাকুলতা অন্যভাবে যেভাবে অনেকের জীবনে আসে, যেটা বলা হল, সংসার থেকে নিজে থেকে সরে আসে। ঠাকুর এতক্ষণ কাদের হয়, সেটা নিয়ে বললেন। এবার বলছেন, কাদের হয় না।

গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন, পান চিবুচ্ছেন, কোন ভাবনা নেই এরূপ অবস্থা হলে ঈশ্বরলাভ হয় না।

ঠাকুরের কি নিখুঁত বর্ণনা –গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন, পান চিবুচ্ছেন। গোঁপে চাড়া মানে, গীতাতে ভগবান বলছেন, *কোহন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া,* আমার সমান কে আছে। পায়ের উপর পা, ভাবখানা হল, ও হবে'খন, তাড়াহুড়োর কি আছে। পান চিবুচ্ছেন, এটা হল রজোগুণের লক্ষণ, সংসারে পুরো ডুবে আছে। তবে এখানে একটা কথা বলতে হয়। খ্রীশ্চান ধর্ম মতে এই পান চিবোন, পায়ের উপর পা যাদের, এরা সবাই গোল্লায় গেছে। কারণ ওদের কাছে জীবন একটাই, হিন্দুদের এ-রকম হয় না। হিন্দুদের কাছে ঈশ্বর থেকে কেউ আলাদা না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি,* সত্যিকারের ঈশ্বরের যিনি ভক্ত তাঁর কোন দিন নাশ হবে না। শুধু যে ঈশ্বরের ভক্ত তার নাশ হয় না, তা না, কারুরই নাশ হয় না। যখন আপনি বলবেন, আর না, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, আপনার নাশ আর কেউ করতে পারবে না।

প্রতিবেশী –সাধুসঙ্গ হলে এই ব্যাকুলতা হতে পারে?

এই ব্যাপারটা আপনারা শ্রোতারা জানবেন, আপনারা সাধুসঙ্গ করেন। বেলুড় মঠের সবাইকে ব্রহ্মচারী অবস্থায় দু-বছর টেনিং সেন্টারে থাকতে হয়। ১৯৮৫ সালে আমি যখন ট্রেনিং সেন্টারে ছিলাম, সেই সময় শ্রীমৎ স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ আমাদের আচার্য ছিলেন। উনি আমাদের লীলাপ্রসঙ্গ পড়িয়েছিলেন। এমন সুন্দর করে পড়িয়েছিলেন যে এখনও মাথায় বসে আছে। একদিন খুব সুন্দর একটা কথা আমাকে বলেছিলেন, 'সাধুরা ভক্তদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলেন। কি নিয়ে কথা বলেন? কাছে গিয়ে শোনার চেষ্টা কর, ঠাকুরের একটি কথা কি বলে'? তখন আমার বয়স কম ছিল, শুনে খুব অবাক লাগল। আমিও প্রথম জীবনে ভাবতাম সাধুরা যে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন, ঠাকুরেরই না কথা বলবেন। সেইজন্য মহারাজের কথা শুনে কেমন অবাক লাগল।

একবার কোন এক ভক্ত এসে কোন মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মহারাজ আপনার কি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে'? মহারাজ রেগে গিয়ে বলছেন, 'আপনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত নন, আর আমিও শ্রীরামকৃষ্ণ নই, এসব আলতু-ফালতু প্রশ্ন করবেন না'। সাধু যদি একবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ছেলে কেমন আছে, মেয়ে কেমন আছে, ব্যস্ আর কে পায়, ওতেই রোমে যাবে। এই সাধুসঙ্গে হয় না। প্রস্তুতি লাগে, প্রস্তুতি ছাড়া সাধুসঙ্গে হবে না। ভক্তরা বেশির ভাগ যে প্রশ্ন করে, বেশির ভাগ প্রশ্নই হল technical question of spirituality, এগুলো জেনে আপনার কি হবে? তার আগের সব কিছু কি আপনার জানা হয়ে গেছে? সময় কাটানো জন্য প্রশ্ন করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ –হ্যাঁ, হতে পারে, তবে পাষণ্ডের হয় না। সাধুর কমণ্ডলু চার-ধাম করে এল, তবু যেমন তেতো তেমনি তেতো!

সাধুদের কমণ্ডলু চালকুমড়োর খোল দিয়ে তৈরী হয়। চালকুমড়োর উপরের মোটা খোসাটা তেতো হয়। সাধুদের পয়সা থাকত না, পিতলের কমণ্ডলু কোথায় পাবেন। চালকুমড়োর খোসা দিয়ে কমণ্ডলু তৈরী হত, এটাকে বলে তুম্বা। সাধুর সময় কাটাতে হবে, চার-ধাম ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন। চার-ধাম হল, আচার্য শঙ্কর যে চারটে মঠ স্থাপন করে চার-ধাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ওই চার-ধাম, কেদারবদ্রী না। যাদের হবে না, তারা পাষণ্ড, মুর্খ; ঠাকুর তাদের তুলনা কার সঙ্গে করছেন? সাধুর কমণ্ডলুর সঙ্গে। কাদের হবে না? যাদের মনে কোন ছাপ পড়ছে না; কারণ এরা এখনও তাদের সাংসারিকতার সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি; চালকুমড়োর খোসার তেতো ভাবটা থেকেই গেছে। ঈশ্বরীয় কথা, শাস্ত্রের কথা, ধর্মের কথা এদের স্পর্শ করে না। এদের ঠাকুর বলছেন পাষণ্ড, এদের কিছু হবে না। আগে রজোগুণীর কথা বললেন, এখন তমোগুণীর কথা বলছেন।

কিছু দিন আগে আমার এক সন্ন্যাসী ভাই আমাকে বললেন, 'আপনি যেভাবে সত্যকথাগুলো বলেন, ভক্তরা তো শুনবে না, আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে'। আমি মহারাজকে বললাম, 'আমার কাজ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা, লোকেদের খুশি করা, entertainment দেওয়া আমার কাজ না'। ঈশ্বরের দিকে মন যাওয়া অত সহজ ব্যাপার না। প্রথম কথা অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, দ্বিতীয় কথা, যাদের স্বাভাবিক ত্যাগ নেই, ঠাকুর যাকে মর্কট বৈরাগ্য বলছেন; তাদের আরও বেশি খাটতে হয়। কিভাবে? জপ, ধ্যান, প্রার্থনা, পূজা, উপাচার এগুলোকে প্রথম প্রথম মেকানিক্যালি নিয়ে যেতে হয়। কিছু সাধু-সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা প্রকৃত সাধু, যাঁদের ছোটবেলা থেকেই সংসারে মন ছিল না, তাঁরা ঠাকুরের দিকে পুরোপুরি ঢুকে আছেন, এনারা সত্যিই ধন্য।

আমাদের ইউনিভার্সিটিতে ছয়-সাতজন ব্রহ্মচারী আছেন বিদেশ থেকে ফিজিক্সে, কম্প্যুটারে পিএইচডি করা। এখানে আসার আগে অনেকে বিদেশে অধ্যাপনাও করতেন। একজন ব্রহ্মচারীর এখানে

দু-তিন বছর হয়েছে। তিনি আবার ফাণ্ডামেন্টাল ফিজিক্সে পিএইচডি করেছেন। খুব মিষ্টি করে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'রামকৃষ্ণ মিশনে আপনার চল্লিশ বছর হল, মহারাজ আপনার কি উপলব্ধি হয়েছে'? আমি বললাম, 'কি আর বলব, হয়েছে; এই আবর্জনাগুলো কিছু পরিষ্কার হয়েছে, এর বেশি কিছু না। যাদের এর থেকে বেশি হয়েছে তাদের কপাল ভাল, ভাগ্যবান। একেবারে আগাছার জঙ্গলে চাপা পড়েছিলাম, কিছু জঙ্গল সাফ হয়েছে'। ব্রহ্মচারী মহারাজ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আর ইচ্ছে কি হয় না'? 'ইচ্ছে! হয়, যতক্ষণে হয় ততক্ষণে চলেও যায়'। এত সহজ নাকি। ঠাকুর যে এই ব্যাকুলতার কথা বলছেন, এটা শেষ অবস্থা।

অমরনাথ যাত্রার কথা বলেছিলাম। অমরনাথ যাওয়ার পথে এক সুফির সাথে কথা হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ভক্তি কিসে হয়'? খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন –'জমিদারি যেভাবে অর্জন করতে হয়, ভক্তিও সেভাবে অর্জন করতে হয়'। এই কথাট কোন দিন ভুললাম না। ভক্তি হয় না, ভক্তি অর্জন করতে হয়। ঈশ্বরে মন যেতে চায় না, মনকে লাগাতে হয়। আধ্যাত্মিক জীবন হয় না, খেটে আধ্যাত্মিকতা জীবন তৈরী করে ওর মধ্যে ঢুকতে হয়। কিভাবে? একটা নিয়মিত অর্থপূর্ণ জীবন-যাপনের মাধ্যমে, নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে, নিয়মিত জপধ্যান করার মাধ্যমে। কারণ আমরা কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নই যে প্রথম থেকেই তৈরী হয়ে এসেছি। আমাদের খাটতে হবে, খেটে তৈরী করতে হবে। আগাছাগুলো পরিষ্কার করতে হবে। যখন দেখবেন শাস্ত্র শুনতে ভাল লাগছে, শুনতে শুনতে বুঁদ হয়ে যাচ্ছেন, তখন বুঝবেন আপনার আগাছাগুলো সাফ হতে শুরু হল। এই এতটুকু থেকে সাবধান –সাধুর কমণ্ডলু হয়ে যেন জীবনটা শেষ না হয়ে যায়। গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা, পান চিবুচ্ছেন – এরকম যেন কখনই না হয়।

পুরো কথামৃত জুড়ে এটাই –কিভাবে ঈশ্বরের দিকে মন যায়। কখন-সখন সংসারে কিভাবে থাকতে হয় যে কথাগুলো বলছেন, সেটাও কিভাবে ঈশ্বরের দিকে যাওয়া যাবে, সেটার জন্য। যার জন্য ভগবানের কথা, অবতারের কথা খুব সহজ-সরল, বোঝা যায় না। কারণ একেবারে খাঁটি কথা বলেন কিনা। উপনিষদ ঋষিদের কথা, বোঝা যায় না, কারণ একেবারে খাঁটি কথা বলছেন। গীতা ভগবানের কথা, বোঝা যায় না। কথামৃত অবতারের কথা, বোঝা যায় না। যেমন যেমন আপনার সাধনা হবে, তেমন তেমন আপনি গীতা, কথামৃত, উপনিষদ বুঝবেন, তা নাহলে এগুলো বোঝা যায় না। ভাগবতের কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী এগুলো তাও একটু বোঝা যায়। কিন্তু কাহিনীর মাধ্যমে যে তত্ত্ব দেওয়া থাকে, সেটাকে কেউ ধারণা করতে পারে না। কথামৃতের ঠাকুরের কথাগুলো বারবার চিন্তন না করলে বোঝা যায় না।

ঠাকুর শুধুমাত্র বলছেন, কিভাবে মানুষ ঈশ্বরের দিকে যেতে পারে। ঠাকুর এখানে খুব সুন্দর বললেন –যখন তিনি মুক্তি দিবেন তখন তিনি সাধুসঙ্গ করিয়ে নেন। কিন্তু তার সঙ্গে এটাও জুড়ে দিচ্ছেন –তবে পাষণ্ডের হয় না। উপমা দিচ্ছেন –সাধুর কমণ্ডলু চার-ধাম করে এল, তবু যেমন তেতো তেমনি তেতো; সত্যিই হয় না। একজন ভদ্রমহিলা আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাশ খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনেন। উনি একবার আমার সাথে দেখা করতে এলেন, সঙ্গে ওনার এক বান্ধবীকেও নিয়ে এসেছেন। সেই বান্ধবী বলছেন, মহারাজ 'আপনাকে এটাই বলি, আরও বেশি করে প্রবচন দিন, যাতে আমাদের অনেকের মঙ্গল হয়'। অসন্তুষ্ট হলাম, হওয়ারই কথা, বললাম, 'আপনার কোন আইডিয়া আছে, কিভাবে আমি সপ্তাহে ছটা করে ছটা বিষয়ে ক্লাশ নিচ্ছি'। উনি বলছেন, 'কেন জানব না, আমি কত আপনার গান শুনেছি'। আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। 'গান! জীবনে আমি কোন দিন গান করিনি'। তাও তিনি বলে যাচ্ছেন, 'কি বলছেন মহারাজ, কত আপনার গান শুনেছি'। যিনি ওনাকে নিয়ে এসেছিলেন, উনি তাড়াতাড়ি করে বুঝিয়ে বললেন, 'ইনি গান করেন না, গান অন্য একজন করেন'। ভদ্রমহিলা সবই করছেন, ঠাকুরের গান সাধুর মুখে শুনছেন, ঠাকুরের কথা শুনছেন সাধুর মুখে। কিন্তু আপনি একজনের সাথে দেখা করতে এসেছেন, আপনি এতটুকু জানেন না যে, উনি কোন বিষয়ে বলেন, কি বলেন। উনি

মনে করছেন, আমি গান করি। আমি একটু অসন্তুষ্ট হলাম, পরে দেখলাম ভুল হয়েছে। আমার অহংকার করা উচিত ছিল। মহারাজরা সবাই আমাকে বলেন, মহারাজ আপনি আর যাই করুন জীবনে গানটুকু করবেন না; 'শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম' করুন, এর বেশি আপনার দ্বারা গান হবে না। কারণ আপনার যা গলা, সুর নেই, তাল নেই। সেখানে কেউ এসে যদি বলেন আমার গান শোনেন, কোথায় শুনলেন ভগবান জানেন, তাতে তো আমার অহংকার হবারই কথা।

বাংলার লোকেরা তাও ধর্মের ব্যাপারে অনেক কিছু বোঝে। আজই আমার এক ব্রহ্মচারী ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিল। কথা এটাই হচ্ছিল, শুধু কথামৃত ও স্বামীজীর বাণী ও রচনা, তার সাথে কিছু ছোট ছোট বই, এই কটি বইয়ের জন্য বাংলার লোকেরা ধর্মতত্ত্ব তাও কিছু বোঝেন। বাংলার বাইরে জয় রাম শ্রীরাম ছাড়া কিছু বোঝে না। শুধু কথামৃত আর স্বামীজীর বাণী ও রচনা আমাদের উদ্বোধনের সৌজন্যে আজ গ্রামেগঞ্জে এমন ঢুকে গেছে যে, বাংলার লোকেরা আজকে ধর্মের ব্যাপারে, ঈশ্বর, জীব, জগতের ব্যাপারে অনেক কিছু জানে ও বোঝে। এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার কথা, সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা আমি আপনাদের বলতে পারব না, কিন্তু বাংলার গ্রাম শহরে ঘোরাঘুরি করে অল্পস্বল্প একটু বাংলার লোকেদের সাথে যতটুকু মিশেছি, তাতে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা যে সংস্কৃতি বাংলাকে দিয়ে গেছেন, এখনও বাংলার গোটা সমাজ সেটাকে ধরে আছে। যদিও বাংলা চৈতন্য মহাপ্রভুর দেশ, কিন্তু ঠাকুরের কথামৃত আর স্বামীজীর লেকচারগুলো পড়ে পড়ে ধর্মের ধারণার ক্ষেত্রে একটা এমন জায়গায় তাঁরা এসে গেছেন, সেটা ভারতের অন্য রাজ্যে পাওয়া যাবে না। পরম্পরা ভাবে যাঁরা আছেন তাঁদের কথা আলাদা, আমি আপামর জনগণের কথা বলছি।

এবার কীর্তন আরম্ভ হয়েছে। গোস্বামী কীর্তন করছেন। কীর্তন শেষ হয়ে যাওয়ার পর ঠাকুর এবার যে কথা বলছেন, এই বিষয়টাকে নিয়েই আমরা এখন আলোচনা করব –কিভাবে ঈশ্বরলাভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ –গোপীরা কাত্যায়নীপূজা করেছিলেন। সকলেই সেই মহামায়া আদ্যাশক্তির অধীনে।

আমি, আপনি সবাই এই মহামায়া আদ্যাশক্তির অধীনে। শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটা জিনিস দিয়ে গেলেন যে, এভাবে আমরা আর কোথাও পাই না। পুরো গীতাতে আদ্যাশক্তির ব্যাপারটা সরাসরি এভাবে নেই। সেখানে প্রকৃতির কথা আছে, যেখানে ভগবান বলছেন, আমিই প্রকৃতি হয়েছি। তন্ত্র মতে ও শাক্ত মতে আছে, কিন্তু হিন্দু ধর্মের যে মূল ধারা সেখানে সরাসরি আদ্যাশক্তি জিনিসটাকে এত স্পষ্ট করে কোথাও বলা নেই। হিন্দুরা চণ্ডীপাঠ করেন, সারা ভারতের লোকেরাই করে। আপনি কাশ্মীরে যান, সেখানে পণ্ডিতরা যাঁরা আছেন তাঁরা নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করেন। দক্ষিণ ভারতে যান, সেখানেও একই ছবি দেখতে পাবেন। যাঁর জন্য বৈষ্ণবরাও বলেন, শ্রীরাধাকে খুশি না করলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না। রামভক্তরা মা সীতাকে নিয়ে এলেন, শিব পরম্পরায় পার্বতীকে নিয়ে আসা হল, বিষ্ণু পরম্পরায় লক্ষ্মীকে নিয়ে এলেন। কিন্তু ব্রহ্মার ক্ষেত্রে আনা যাবে না, ব্রহ্মা স্রষ্টা কিনা, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোন স্ত্রী হতে পারেনা। দেশ থেকে বেচারী ব্রহ্মার পূজাটাও সেই কারণে উঠে গেল কিনা বলতে পারব না। এটা খুব আশ্চর্যের, ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য যদি দেখেন, দেখবেন বেদেও দেবীর স্তুতি রয়েছে, যেমন দেবীসূক্তম্ আছে, তেমনি আবার মেধাসূক্তম্ আছে, দূর্গাসূক্তম্ আছে, এগুলো দেবীর স্তুতি, শক্তি রূপেই করা হয়। কিন্তু একটা সময় এই শক্তি আরাধণাটা ভারতে কমে গিয়েছিল, বিশেষ করে গীতাতে তো শক্তি আরাধণার কথা নেই। উপনিষদে যেমন সরাসরি ভক্তির কথা নেই, গীতাতেও তেমনি সরাসরি শক্তিপূজার কথা নেই। সেইজন্য কথামৃত হল সম্পূর্ণ গ্রন্থ। সম্পূর্ণ গ্রন্থ পেতে হলে হয় আপনাকে বেদে যেতে হবে, নয় কথামৃতে আসতে হবে।

অবতার আদি পর্যন্ত মায়া আশ্রয় করে তার লীলা করেন।

ঠাকুর আগে অতি সাধারণ কথা বললেন –সবাই আদ্যাশক্তির অধীনে; বলেই এখান থেকে অবতারতত্ত্বে চলে গেলেন। অবতারতত্ত্বে এটাই –অবতার যখন আসেন, তিনি মায়াকে আশ্রয় করে থাকেন। গীতার প্রথমের দিকে যেখানে অবতার প্রসঙ্গ আসে, সেখানে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, নিজের মায়াকে বশে করে অবতার মায়ার রাজ্যে আসেন, মায়ার মধ্যেই তাঁকে কিন্তু আসতে হচ্ছে। এই যে শক্তির কথা বলা হচ্ছে, গীতাতে এই শক্তিকে ভগবানেরই শক্তি বলা হয়; কিন্তু চণ্ডী আদিতে শক্তি পরিষ্কার আলাদা। আমাকে যদি কেউ ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞেস করেন, ব্যক্তিগত ভাবে বলার অধিকার নেই আমার, তবে আমি আমাদের আচার্যদের মুখ থেকে যা শুনেছি, তার উপর ভিত্তি করে এটা অবশ্যই বলতে পারি যে, –শক্তির আরাধনা না করলে, মায়ের স্তুতি না করলে, মায়ের কাছে প্রার্থনা না করলে, আধ্যাত্মিক জীবনে এগোন খুব কঠিন। যার জন্য খ্রীশ্চানরাও মাদার মেরীকে পূজাতে নিয়ে এলেন। বৌদ্ধরাও নিয়ে এলেন।

দু-দিক থেকে চলে –একটা হল, মাতৃতত্ত্বকে যেমনি আনা হয়, আমাদের হৃদয়ের ভিতরে যে ভালবাসা জমাট বেঁধে আছে, সেটা জেগে ওঠে। শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের যে শক্তি, সব শক্তি একদিকে চলতে শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তার থেকে বেশী ঠাকুর এখানে যেটা বলছেন –যাঁর জেলখানা থেকে আপনি মুক্তি চাইছেন, আপনার আর্জি তো তাঁকেই দিতে হবে। সুপ্রীম কোর্টের অর্ডারে আপনার যদি জেল হয়, আপনাকে সুপ্রীম কোর্টেই আর্জি করতে হবে। জেলার সাব-জাজ বা জজ সাহেব যদি আপনাকে জেলে পাঠান, জজ সাহেবের কাছেই আপনার আর্জি করতে হবে। মহামায়া আমাদের বন্ধনে রেখে দিয়েছেন, মহামায়ার কাছেই আমাদের আর্জি করতে হবে। এক অধ্যায় করে নিত্য চণ্ডীপাঠ করবেন। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে চণ্ডী থেকে যে কোন একটি শ্লোক, যেমন *যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ*, এতটুকু রোজ কয়েকবার পাঠ করবেন। কারণ আপনি পুরুষ হন আর নারীই হন, আপনি আসলে জীবাত্মা। জীবাত্মাতে নারী-পুরুষ হয় না, কিন্তু জীবাত্মা প্রকৃতির অধীন। আদ্যাশক্তির কাছে প্রার্থনা আমাদের সবাইকেই করতে হবে। এটাই দেখানোর জন্য ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে, নিজের স্ত্রীকে পূজা করলেন, ইতিহাসে আর এমনটি নেই।

তাই তাঁরা আদ্যাশক্তির পূজা করেন। দেখ না, রাম সীতার জন্য কত কেঁদেছেন। এটা এত ইন্টারেস্টিং একটা কথা –রাম সীতার জন্য কত কেঁদেছেন। অন্য কোথাও এই ইন্টারপ্রিটিশানটা নেই। বাল্মীকি রামায়ণ থেকে সব জায়গায় আমরা পাই যে, রাম সীতার বিরহে কেঁদেছেন। তুলসীদাস যার জন্য পুরো জিনিসটাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে পুরোটাই একটা ড্রামা মাত্র। অধ্যাত্ম রামায়ণে পুরো জিনিসটাকে করে দিলেন –মায়া সীতা। যে রাম সীতার জন্য কেঁদে কেঁদে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, অধ্যাত্ম রামায়ণ সেই সীতাকে করে দিলেন মায়া সীতা। শ্রীরাম যখন শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে এলেন, তখন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে মা কালীর দর্শন পাওয়ার জন্য মা মা বলে কেঁদে বেড়াচ্ছেন; দুটো একই কোন তফাৎ নেই। শ্রীরাম যে সীতার জন্য কাঁদছেন, এটা সীতার খোঁজ না পাওয়ার জন্য না; ঠাকুরের কথা, এটা আমার কথা না। মহামায়া নিজের জন্য অবতারকে কাঁদিয়ে দিলেন। লৌকিক ভাবে এই জিনিসগুলিকে যখন ব্যবহার করা হবে তখন জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যাবে। এমনি যদি কেউ বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমার বিশ্বাস হবে না। এইজন্যই শাস্ত্র পড়া, শাস্ত্রগুলি হল ভগবানের কথা। “**পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে**।”

ঠাকুর এখানে হিরণ্যাক্ষের কাহিনী বলছেন। হিরণ্যাক্ষের কাহিনী আপনারা অনেকেই জানেন। হিরণ্যাক্ষ একবার পৃথিবীকে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে লুকিয়ে রেখেছিল। আবার কোন কোন কাহিনীতে পৃথিবীর বদলে বেদের কথা বলা হয়। তখন আবার এটাকে বার করবার জন্য ভগবান বরাহ অবতার হয়ে এলেন। তিনি সোজা গিয়ে পৃথিবীকে নিজের দাঁতের উপর স্থাপন করে দিলেন। কোথাও কোথাও কাহিনী আছে, যেটা ঠাকুর বলছেন –**হিরণ্যাক্ষকে বধ করে বরাহ অবতার ছানা-পোনা নিয়ে ছিলেন। আত্মবিস্মৃত হয়ে তাদের মাই দিচ্ছিলেন**। ভগবান কখন আত্মবিস্মৃত হন না, কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী যেহেতু, কাহিনী

রূপে আমাদের ধরে নিয়ে এগোতে হয়। **দেবতারা পরামর্শ করে শিবকে পাঠিয়ে দিলেন** ভগবানকে স্বধামে নিয়ে আসার জন্য। **শিব শূলের আঘাতে বরাহের দেহ ভেঙে দিলেন; তবে তিনি স্বধামে চলে গেলেন। শিব জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি আত্মবিস্মৃত হয়ে আছ কেন'? তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমি বেশ আছি'**। এখানে আবার বলে দেওয়া দরকার, এগুলো পৌরাণিক কাহিনী, পৌরাণিক কাহিনীতে অনেক সময় টুইস্ট দেওয়া হয়; আসলে ভগবান কখন আত্মবিস্মৃত হন না। বক্তব্য হল, ''পঞ্চভূতের ফাঁদের, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে''। এই বিশ্বসংসার শক্তির এলাকা, শক্তির কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, নমস্কার করতে হয়, তা নাহলে তিনি দরজা ছাড়বেন না।

অধরের বাটী হইয়া এবার ঠাকুর রামের বাটীতে গমন করিতেছেন। সেখানে কথক-ঠাকুরের মুখে উদ্ধব-সংবাদ শুনিলেন। রামের বাটীতে কেদারাদি ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় ভক্তমন্দিরে –শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ি কীর্তনানন্দে

অধরের বাড়িতে কীর্তন শেষে ঠাকুর আবার চললেন সিমুলিয়া মধু রায়ের গলি। সেখানে প্রচুর লোকজনের সমাগম হয়েছে। অনেক বর্ণনা আছে, আমরা আর বর্ণনার মধ্যে যাচ্ছি না।

আজ রামচন্দ্রের বাড়িতে বিরাট উৎসব। **রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা চলিতে লাগিল**। ছোটবেলা থেকে হিন্দুরা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী মোটামুটি জানেন। খুব সংক্ষেপে কাহিনী হল, রাজা হরিশ্চন্দ্র ছিলেন সূর্য বংশীয় রাজা। পুরাণে ভারতের এই দুটো বংশের বর্ণনা আছে –সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ। সূর্যবংশের রাজপুরোহিত হলে বশিষ্ঠ মুনি। বশিষ্ঠ মুনি আর বিশ্বামিত্রের সাথে প্রায়শই ঝগড়া লেগে থাকত; খুব নামকরা ঝগড়া। বিশ্বমিত্র সব সময় বশিষ্ঠকে নিজের থেকে ছোট দেখাবেন, তাঁর যজমানদের কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কেড়ে নিয়ে তাকে কষ্ট দেবেন। ওই করতে গিয়ে তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে চলে গেলেন রাক্ষসরা যাতে যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপন্ন না করতে পারে।

যাই হোক, বিশ্বামিত্র একবার হরিশ্চন্দ্রকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, তোমার সমস্ত সাম্রাজ্য আমাকে দাও। হরিশ্চন্দ্র বলে দিলেন, ঠিক আছে। ব্যস্ পরের দিন বিশ্বামিত্র হাজির হয়ে গেলেন। তুমি তো সমস্ত রাজ্য দিয়েছিলে, এবার আমাকে রাজ্য দাও। রাজা হরিশ্চন্দ্র দিয়ে দিলেন। বলছেন, দান তো করলে, দানের একটা দক্ষিণাও তো দিতে হবে। খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা। আমরা ছোটবেলা যখন শুনেছিলাম, আমরা এমন জায়গায় বড় হয়েছি, সেখানে আমরা জিনিসগুলো বুঝতে পারতাম, খুব কঠিন বলে মনে হয়নি। আজকালকার দিনে আপনারা বুঝতে পারবেন না। যখনই কোন যজ্ঞ হয়, সাধুদর্শন করা এটাও একটা যজ্ঞ, বিগ্রহদর্শন এটা একটা যজ্ঞ। যজ্ঞ হলে একটা দক্ষিণা দিতে হয়। দক্ষিণা আবশ্যিক, দক্ষিণা না হলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না। বিশ্বামিত্র বললেন, দক্ষিণা দাও। রাজা সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীকে বলছেন, খাজানা থেকে এনাকে উপযুক্ত দক্ষিণা দাও। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বামিত্র আটকে দিলেন – সাবধান রাজা! এই খাজানাটা এখন আর তোমার নয়, এর টাকা-পয়সা সব আমার, আমি রাজা। এখন তো হরিশ্চন্দ্র দান করে দিয়েছেন, দান করার পর দক্ষিণা দিতে হবে। দক্ষিণাটা বাকি থেকে যাচ্ছে, আর দক্ষিণা না দেওয়া পর্যন্ত দান পূর্ণাঙ্গ হবে না। হরিশ্চন্দ্র ত্রিলোকের রাজা। দান করে দেওয়ার পর হরিশ্চন্দ্রের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কারণ দান করে দেওয়ার পর সবটাই এখন হয়ে গেল বিশ্বামিত্রের। অনেক ভেবে ঠিক হল যে, কাশী হল শিবের স্থান, ওই স্থান কারুর রাজ্য নয়। তুমি এখন কাশীতে গিয়ে থাকতে পার। হরিশ্চন্দ্র এখন কাশীতে চলে গেলেন। দেবতারা বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে এমন মার খেয়েছে যে, বিশ্বামিত্রের ভয়ে এখন হরিশ্চন্দ্রকে কেউ চাকরি দিতে চাইল না। শেষে এমন পরিস্থিতি হল যে, হরিশ্চন্দ্রকে চণ্ডালের চাকরি নিতে হল।

এখনও কাশীতে সেই ঘাটগুলো রয়েছে যেখানে শবদাহ করা হয়। ভাবা যায় কবেকার এই কাশী! কিছু বছর আগেও আমরা কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে যেতাম। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলি, কাহিনীগুলো টুকটাক আমি জানি, কাশী দেখে কষ্ট হত। স্টেশনে নেমে রিক্সা নিয়ে যাবেন, রিক্সা আর চলতে চায় না, রাস্তাগুলো এমন। কবেকার এই কাশী নগরী, হিন্দু ধর্মের হৃদয়ের রানী এই কাশী নগরী। কাশীর শ্মশানে রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের চাকরি নিয়ে এখন শবদাহ করছেন, সেখান থেকে দুটো পয়সা পাবেন, সেই পয়সায় বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দেবেন। রাজার যে স্ত্রী শৈব্যা আর তাঁর পুত্র রোহিতাশ্ব, তাঁরা আর-এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে চাকরি করছে। দেবতা বলুন, ঋষি বলুনল; এনাদের এমনই লীলা যে, ভোরবেলা ফুল তুলতে গিয়ে রোহিতাশ্ব সর্পদংশনে মারা যান।

রোহিতাশ্বের মৃতদেহকে নিয়ে মা শ্মশানে এসেছেন দাহ করাবার জন্য। হরিশ্চন্দ্র দেখে বুঝতে পেরেছেন, নিজের স্ত্রী তাঁর মৃতপুত্রকে সৎকার করতে নিয়ে এসেছেন। হরিশ্চন্দ্র বলছেন, এখানে মূল্য না দিয়ে দাহ করানো যাবে না। শৈব্যা কোথা থেকে মূল্য দেবে। তখন তিনি যে শাড়িটা পরে আছেন, তার অর্দ্ধেক ছিঁড়ে ওটাই হরিশ্চন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। ওই সব দৃশ্য দেখে দেবতারা ধন্য ধন্য করে সব আটকে দিলেন। বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ঠের ঝগড়া এমন পর্যায়ে চলে যেত যে, মাঝে মাঝে ইন্দ্রকে এসে ঝগড়া থামাতে হয় –বন্ধ করুন তো আপনাদের এই ছেলেমানুষী। সাধারণ লোকের লড়াই একটু পরে থেমে যায়, কিন্তু পণ্ডিতদের লড়াই থামতে চায় না। এখনও নাকি ওনারা এক অপরকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছেন। সত্যবাদী হরিশ্চন্দ্র, এই শব্দটা আমরা সবাই শুনে থাকি, জনগণের মধ্যে একটা প্রবাদ হয়ে গেছে। স্বপ্নে দান করেছেন, একেবারে শেষ পর্যন্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র দাঁড়িয়ে থাকলেন সত্যের উপর। যার জন্য এই সূর্যবংশে পরে যখন শ্রীরামচন্দ্র এলেন, তিনিও একই রকম; *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*, রাম কখন দু-রকম কথা বলে না। মহাত্মা গান্ধী ছোটবেলায় হরিশ্চন্দ্র নাটক দেখেছিলেন, ওই ছোটবেলাতেই তিনি ঠিক করে নিলেন, জীবনে আমি সত্যবাদী হব। পরে একটু বয়স হয়ে যাওয়ার পর তিনি সত্যে দৃঢ় হয়ে গেলেন, বই লিখলেন My Experinece in Truth। এটা ওনার কম বয়সে লেখা। এই দুটো জিনিস আমি ছোট্ট বয়স থেকে জানি, হরিশ্চন্দ্র আর গান্ধীজী হরিশ্চন্দ্র নাটক দেখেছিলেন। তবে সেইভাবে আমার ভিতরে ওই ভাব জাগেনি। ছোটবেলা একটা কোন নাটক দেখে বা সিনেমা দেখে ভিতরে একটা ভাব জাগা, এটা সবারই হয় না।

এই কাহিনীটা এখানে বিস্তারে চলছে। যখন এই কাহিনী চলছে, খুব ইমোশান কিনা; সেইজন্য মাস্টারমশাই নিজে মন দিয়ে শুনছেন আর দেখছেন, ঠাকুর কি করছেন। মাস্টারমশাইয়ের জীবনে প্রচুর দুঃখ ছিল, একবার তো আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিলেন। শ্মশানের সেই রাতের অন্ধকারে শৈব্যা ক্রন্দন করছেন, মাস্টারমশাই তার খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন –**সে ক্রন্দন-বর্ণনা শুনিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কোন্ দেহধারী জীবের হৃদয় বিগলিত না হয়?**

ঠাকুর কি করিতেছেন? স্থির হইয়া শুনিতেছেন –একবারে স্থির –একবার মাত্রচক্ষের কোণে একটি বারিবিন্দু উদ্গত হইল, সেইটি মুছিয়া ফেলিলেন। অস্থির হইয়া হাহাকার করিলেন না কেন? কারণ ভাব যখন অত্যন্ত গভীরে চলে যায়, তখন চোখে জল আসে না। দ্বিতীয় কথা ঠাকুর ইমোশানে যাবার লোক নন। মাস্টারমশাই কথামৃত লিখছেন, সব করছেন, কিন্তু এই জিনিসটা বোঝার, ঠাকুর ইমোশানসে যেতেন না। কিন্তু অন্য দিকে গোপীদের কথা, শ্রীমতির কথা বলতে গিয়ে, গান করতে গিয়ে চোখ দিয়ে অবিরল জল ফেলছেন –এই চোখের জল আধ্যাত্মিক জল, ইমোশানাল জল না। এই ধরণের নাটক দেখতে গিয়ে, কথকতা শুনতে গিয়ে আমাদের যে চোখে জল আসে, এটা ইমোশানাল জল। **কথা সাঙ্গ হইলে তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন**।

ঠাকুর হয়ত বুঝেছিলেন, হরিশ্চন্দ্রের এই কাহিনীটা ভক্তদের জন্য ইমোশানাল হয়ে গেছে, সেইজন্য হয়ত বলছেন, **"কিছু উদ্ধব-সংবাদ বল"**। ভাগবতের দশম ও একাদশ খণ্ডে উদ্ধব-সংবাদ

আছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে এসেছেন। অনেকদিন হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে চলে এসেছেন। বৃন্দাবনের সবাই কেমন আছেন, গোপীরা কি ভাবছেন, তাঁদের খবর নেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবন পাঠালেন।

কথক বলিলেন, যখন উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন, রাখালগণ ও ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই জিজ্ঞাস করেলেন, শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন। তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন? তিনি কি আমাদের নাম করেন? এই বলিয়া কেহ কাঁদিতে লাগিল। কেউ কেউ বিভিন্ন জায়গায় দেখিয়ে বলছেন, এখানে কৃষ্ণ এই লীলা করেছেন, এখানে এই অসুরকে বধ করেছিলেন, ইত্যাদি। উদ্ধব তখন বলছেন, **'আপনারা কৃষ্ণের জন্য অত কাতর হইতেছেন কেন? তিনি সর্বভূতে আছেন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি ছাড়া কিছুই নাই'। গোপীরা বলিলেন, 'আমরা ও-সব বুঝিতে পারি না। আমরা লেখাপড়া কিছুই জানি না। কেবল আমাদের বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে জানি, যিনি এখানে নানা ক্রীড়া করিয়া গিয়াছেন'**। যে যাকে ভালবাসে সে তার ঐশ্বর্যকে নিয়ে ভাবে না, ভালবাসার পাত্রের ঐশ্বর্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

কানপুরের একটা ঘটনা আমি জানি, সেখানে আমি বেশ কয়েক বছর ছিলাম। কানপুরে একটা পরিবারকে জানতাম, যাদের পরিবারের সবাই ডাক্তার। বাড়ির বৌমা ছিলেন আই সার্জন। তিনি ফেকো অপারেশনের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। তার একটা চার বছরের বাচ্চা মেয়ে, সেও সঙ্গে গেছে। একদিন হল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল। তারপর একদিন ওই চার বছরের বাচ্চা রেগে গিয়ে বলছে, ফেকো কো ফেকো, অব্ ঘর চলো। কি করবে, একা একা ওর ওখানে ভাল লাগছে না। তার মা অত বড় একজন ডাক্তার, কত নামডাক; তাতে মেয়েটির কি আসে যায়! তুমি আমার মা, আমার জন্য তোমাকে চব্বিশ ঘন্টা আমার সঙ্গে থাকতে হবে। আপনি যদি বেশি নিজের কেরিয়ারের পিছনে দৌড়ান, তারপর আপনার যখন বয়স হবে তখন আপনার সন্তানও আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে ফেলে দিয়ে কেরিয়ারের জন্য বেরিয়ে যাবে। এমনিতেই বেরিয়ে যায়, এতে তো আরও বেরোবে।

উদ্ধব আবার বলছেন, **'তিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁকে চিন্তা করিলে আর এ-সংসারে আসিতে হয় না, জীব মুক্ত হয়ে যায়'। গোপীরা বলিলেন, 'আমরা মুক্তি –এ-সব কথা বুঝি না। আমরা আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে দেখিতে চাই'**।

এবার কিন্তু ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনলেন, ওটা একটা এ্যথিকাল জিনিস। কিন্তু যেমনি উদ্ধবের কথা এলো, আধ্যাত্মিক জিনিস এসে গেল। সাহিত্য পড়ে, যে কোন সাহিত্যই হোক, যদি দেখেন ওতে আপনি রস পাচ্ছেন, আপনার চোখে যদি জল আসে, বুঝবেন আপনার এখন অনেক সময় লাগবে। নাটক, সিনেমা দেখে, সাহিত্য পড়ে আপনার মন যদি বিভোর হয়ে যায়, বুঝবেন আপনাকে এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। এমনকি ঠাকুর, শ্রীশ্রীমায়েরও কথা যেখানে আছে, যেখানে ওনাদের লীলার বর্ণনা করা হয়েছে; সেখানেও যদি আপনি ঠাকুর মায়ের ভাবে চলে যান তবেই সেটার দাম। কিন্তু সেখানে যে ঘটনাগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে, ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালবাসতেন, মা এক জায়গায় মুরি কড়াইশুঁটি খাচ্ছেন, সেখান থেকে কড়াইশুঁটি দেখলেই যদি মায়ের কথা মনে পড়ে, জিলিপি দেখলেই যদি ঠাকুরের কথা মনে পড়ে, তাহলে বুঝবেন আপনার জীবনটা সার্থক হচ্ছে। কিন্তু যদি এর উল্টোটা হয়, শুধু জিলিপি কেনার জন্য কামারপুকুর গেলেন, জিলিপি কিনতেই ব্যস্ত, আপনারও হবে, একদিন না একদিন অবশ্যই হতে হবে, কিন্তু সময় লাগবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এ্যক্সপ্রেস ধরে নিয়েছেন, যতই ট্রেন দাঁড়াক, যতই চেন টানা হোক, ট্রেনকে একটা না একটা সময় যেতে তো হবে, না গিয়ে উপায় নেই। ট্রেন যাবেই যাবে, আপনি ট্রেনে বসে থাকুন, দাঁড়িয়ে থাকুন, লটকে থাকুন, যেভাবেই থাকুন রামকৃষ্ণ এ্যক্সপ্রেস আপনাকে ঠিক নিয়ে যাবে। তবে যতটা আপনি গভীরে যাবেন, যত ভিতরে ঢুকতে সক্ষম হবেন, তত জিনিসটা আপনার তাড়াতাড়ি হবে। তাড়াতাড়ি

হবে, কি পরে হবে, তাতেও কিছু আসে যায় না। পাঁচ জন্ম পরেই যদি মুক্তি হয়, তাতে কি অসুবিধা আছে! কিন্তু সংসারের এই যে জ্বালা-যন্ত্রণা কত হাজার হাজার জন্ম ধরে ভোগ করে আসছেন, একবার তো বলুন, অনেক হয়েছে, আমার আর এই সংসার লাগবে না।

আমার বন্ধুরা সবাই এখন একে একে রিটায়ার হচ্ছেন, বয়স হচ্ছে কিনা। সবাই নিজের নিজের ক্ষেত্রে খুব বড় হয়েছেন। এখন তাদের যখন দেখি সবাই নাতি-নাতনিদের নিয়ে স্কুল যাচ্ছে, কোচিংএ নিয়ে যাচ্ছে, জিমে নিয়ে যাচ্ছে, দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে যাই; আজ যদি আমি সন্ন্যাসী না হতাম, আমাকেও এ-সব করতে হত। তবে লোকেরা বলে, যে যেটাতে থাকে সেটাতেই মজে যায়, হয়ত আমিও মজে যেতাম। এই আতঙ্কে থেকে যদি বাঁচতে চান, তাহলে আর মনোরঞ্জনে মজে যাবেন না। মনোরঞ্জন পাওয়ার ভাব থাকলে আপনার ট্রেনকে অনেকবার সিগনালে দাঁড়াতে হবে, অনেকবার চেন-পুলিং হবে। এবার চেষ্টা করুন ট্রেনের চেন-পুলিংটা যেন বন্ধ হয়।

ঠাকুর তখন বলছেন –**গোপীরা ঠিক বলছেন**। এখান থেকে ভক্তির কথা শুরু হয়। আমাদের বেদে অনেক মন্ত্র আছে যেখানে ভগবানকে শিশু রূপে দেখা হয়, কোন কোন মন্ত্রে ভগবানকে সুসজ্জিত কন্যা রূপে দেখান হচ্ছে, আবার অনেক মন্ত্রে ভগবানকে আপনজন রূপে দেখা হচ্ছে। পুরাণ মানেই ভক্তিশাস্ত্র, এটাকে ভাগবত ধর্ম বলা হয়। কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তির ব্যাপারে বেদের সামনে এনারাও ফ্যাকাসে। ভালবাসা এমন একটা জিনিস, যেটা সবারই ভিতর থাকবে। একজন মানুষের কর্মক্ষমতা না থাকতে পারে, তার জ্ঞান না থাকতে পারে, মন একাগ্র না থাকতে পারে, কিন্তু ভালবাসা থাকবেই। একটা ছোট্ট শিশু সেও মাকে ভালবাসে। আর যে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, সে নিজেকে ভালবাসে, ভালবাসা জিনিসটা সবার মধ্যে থাকবেই। পশুপাখিরাও নিজেদের ভালবাসে, এমনকি একটা ফড়িং, সেও নিজেকে ভালবাসে; সেইজন্যই তো কেউ মরতে চায় না। এই ভালবাসাতে এত শক্তি ভাবাই যায় না, আর এই ভালবাসাকে যদি ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে কি হবে? ঠাকুর কথককে সেই কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কথকের প্রতি) –গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি; অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠাভক্তি।

একই শব্দ। ব্যাভিচারিণী ভক্তি মানে, যখন ভালবাসা আরও চারজনের বা চার রকম জিনিসের দিকে থাকে। অব্যভিচারিণী হল, ভালবাসা একই রকম থাকে। **ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জানো? জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। যেমন কৃষ্ণই সব হয়েছেন**।

এখানে সাবধান করে দেওয়ার জন্য একটা কথা বলে দেওয়া দরকার। আমি আচার্য। আচার্য বলতে কোন শিক্ষক না; আচার্য মানে শাস্ত্র রয়েছে, শাস্ত্রের কথা ব্যাখ্যা সহ পরিবেশন করছি। আমি যতটুকু যেমন বুঝেছি, সেই অনুসারে ব্যাখ্যা করছি। কিছু কিছু জিনিস আমি ভুল বুঝে থাকতে পারি, সম্ভবনা রয়েছে। কারণ আমি কোন জ্ঞানী পুরুষ না। তবে সাধুসঙ্গ প্রচুর করেছি, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি; সেইজন ভরসা করে বলতে পারি, আমার কথায় কখন অদাচিৎ ভুল থাকতে পারে, বেশি ভুল হওয়ার কথা না। এখানে আপনাদের সামনে শাস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে কিছু আপনাদের সাবধান করে দেওয়াটো আমি কর্তব্য বলে মনে করি। ঠাকুর এখানে যে কথাগুলো বলছেন,এগুলো অত্যন্ত উচ্চমানের কথা, এসব কথা আমার আপনার মত লোকের জন্য নয়। আমরা এখন অনেক নীচে অবস্থান করছি। আমরা এখন ওই অবস্থায় আছি, যেখানে বলছন –মহারাজ কি সুন্দর গান করেন, আপনি আরও বেশি বেশি প্রবচন দিন যাতে আমাদের মঙ্গল হয়। অব্যভিচারিণী ভক্তি, প্রেমাভক্তি, ব্যভিচারিণী ভক্তি, এই কথাগুলো অত্যন্ত উচ্চমানের কথা। আপনাদের কাছে অনুরোধ, এগুলোকে নিয়ে আপনি চিন্তন করতে পারেন, কিন্তু কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে নেই। যেমন গুরুমন্ত্র নিয়ে কারুর সাথে আলোচনা করতে নেই, জিনিসটা অত্যন্ত খেলো হয় যায়। ওই মহিলাকে আমি হাতজোড় করে বললাম, এখানে এসেছেন, ছোট্ট একটা উপদেশ নিয়ে যান –খেলো কর্ম কক্ষণ করবেন না, খেলো কথা কক্ষণ চিন্তন করবেন না, জীবনটাকে খেলো করবেন না।

এই যে বলা হয় –এ-কথা তোমার মুখে সাজে না; আসলে বলতে চাইছেন, উঁচু কথা। যার জন্য আমার কাছে এসে কেউ ধর্মীয় কথা বলতে গেলে বিরক্ত হয়ে যাই। আপনার প্রস্তুতি নেই, পাত্রতা নেই; আপনার নিজের কি সমস্যা বলুন। শাস্ত্রের কথায় আসতে আপনার সময় লাগবে। আপনাকে খুশি করা, মনোরঞ্জন করা আমার কাজ না। সে তো অনেকেই করছেন। একজন তো অন্তত বলে দিন যে, আসল জিনিসটা কি।

এখানে ব্যভিচারিণী ভক্তিকে ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। ঠাকুর যখন বলছেন, প্রেমাভক্তি, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি, তখন বুঝতে হয় যে, যাঁর অত্যন্ত গভীর মন, যিনি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরে মন দিয়ে রেখেছেন, এই কথাগুলো তাঁদের জন্য। আমাদের ঈশ্বর ভজনা হল উড়ো খই গোবিন্দায় নম। সেইজন্য বলছি, দয়া করে এগুলোকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন না। যার জন্য ঠাকুর এই কথাগুলো বলার সময় দেখে নিতেন আশেপাশে অন্য কেউ আছে কিনা। এই কথাগুলোকে খেলো করতে নেই।

জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি কি? বলছেন, **যেমন, কৃষ্ণই সব হয়েছেন**। এই কথার আমরা কি বুঝব বলুন। তারপরেই বলছেন, **তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি**। এটাকে বলছেন ব্যভিচারিণী ভক্তি। যাঁরা ভক্তিশাস্ত্রের লোক, তাঁরা এটাকে নিচু মনে করেন। আসলে কিন্তু এটাই হিন্দুদের ভাব। কিন্তু যিনি ভক্ত পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁর কাছে তাঁর ইষ্টই সব কিছু। অন্য যে সমস্ত রূপ আছে, সেগুলো তাঁর ইষ্টেরই রূপ, কিন্তু তাঁর লাগবে না। যিনি কৃষ্ণ ভক্ত, তিনি জানেন কৃষ্ণ যা, রামও তাই; কিন্তু কৃষ্ণ ছাড়া তিনি আর কিছু চান না। এই জিনিসটার উপর পুষ্পদন্তের খুব সুন্দর কাহিনী আছে। পুষ্পদন্ত একজন গন্ধর্ব, তিনি শিব ভক্ত। তাঁকে শিবনগরী কাশী থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। পুষ্পদন্ত কেঁদে কেঁদে আকুল। শিবের উপর তাঁর খুব সুন্দর স্তুতি রয়েছে –শিবমহিম্নস্তোত্র। সেখানে তিনি বলছেন, কবে সেই দিন আসবে, যেদিন অমরতটিনী অর্থাৎ গঙ্গার তীরে বসে কপালে হাত নিয়ে বলব, হে শিব, হে শিব। এগুলো অত্যন্ত উচ্চমানের ভাবের কথা।

তবে শাস্ত্র বোঝাতে গেলে সব রকম কথাই আমাদের বলতে হয়। শ্রেষ্ঠ কথাও আসে, অত্যন্ত উচ্চমানের কথাও আসে আবার সাধারণ কথাও আসে, সবটাই শুনে রাখতে হয়। তারপর নিজেকে বিচার করে দেখতে হয়, আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি; সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিজেকেই উঠতে হয়। তবে কি, শাস্ত্রে সব রকম স্তরের লোকেদের জন্যই কথা আছে। যাঁরা আমাদের ক্লাশগুলো শুনছেন, আপনাদের মধ্যেও অনেক রকম ভাবের লোকেরা আছেন, হরিবোল করলেই হবে এই ধরণের লোকও আছে আবার অন্য ভাবের লোকেরাও আছেন। শাস্ত্রে সব রকম কথাই আছে। ঠাকুর বলছেন, শুনে রাখতে হয়। আমি শুধু সাবধান করে দিই।

এরপর ঠাকুর একটা গল্প বলছেন, এগুলো এমনি কাহিনী। **দ্বারকায় হনুমান এসে বললে, 'সীতা-রাম দেখব'। ঠাকুর রুক্মিণীকে বললেন, 'তুমি সীতা হয়ে বস, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই'**। এটাকে বলে ইষ্টপ্রীতি; আমি জানি আপনিই তিনি, কিন্তু এই রূপ আমার লাগবে না। আবার একটা কাহিনী বলছেন, **পাণ্ডবের যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন যত রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম করতে লাগল। বিভীষণ বললেন, 'আমি এক নারায়ণকে প্রণাম করব, আর কারুকে করব না'। তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন**। যুধিষ্ঠির সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের দাদা হন কিনা। **তবে বিভীষণ রাজমুকুটসুদ্ধ সাষ্টাঙ্গ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করে**।

ইসলামে কাহিনী আছে, আল্লা যখন সৃষ্টি করলেন তখন তিনি বলে দিলেন, মানুষ শ্রেষ্ঠতম। সবাইকে বললেন, মানুষের সামনে মাথা ঝোঁকাও। ইবলিশ তখন বলল, আল্লা ছাড়া আমি আর কারুর সামনে ঝুঁকব না। ইবলিশের উপর আল্লা রেগে গেলেন। ইবলিশ আল্লাকে ভালবাসে, কিন্তু আল্লার কথা

অমান্য করছে। এই নিষ্ঠাভক্তি থেকে অনেক সময়, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি এগুলো এসে যায়। গোঁড়ামি থেকে আসে হিংসার ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণও গোঁড়ামির ব্যাপারে বলেছেন, গল্পগুলো পরে আসবে। কিন্তু যখন রাধার কাহিনী আসে, মীরাবাঈয়ের কথা আসে, মীরাবাঈয়ের কাহিনীগুলি তো সত্য কাহিনী – সেখানে ওই এক, ওই এককে ছাড়া আর কাউকে জানেনই না।

সেই একের সঙ্গে কিরকম সম্পর্ক? ঠাকুর একটা উদাহরণ দিচ্ছেন। **কিরকম জানো? যেমন বাড়ির বউ! দেওর, ভাশুর, শ্বশুর, স্বামী –সকলকে সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, পিঁড়ে পেতে দেয়, কিন্তু এক স্বামীর সঙ্গেই অন্যরকম সম্বন্ধ**।

আবার বলছেন, **এই প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস আছে। 'অহংতা' আর 'মমতা'**। অহংতা আর মমতা সাধারণত হয় মানুষের নিজের ব্যাপারে। **যশোদা ভাবতেন, আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তাহলে গোপালের অসুখ করবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না;** কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে অনেকবারই নিজের স্বরূপ দেখিয়েছেন। যশোদার ভাব –তুমি ভগবান কি ভগবান না, ওসবে আমার লাগবে না। আর 'মমতা' –আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। আমার জ্ঞান এতটুকুই, এর বেশি চাই না। উদ্ধব যশোদাকে বোঝাতে গেছেন –**'মা! তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ চিন্তামণি। তিনি সামান্য নন। যশোদা বললেন, –'ওরে, তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি –চিন্তামণি না, আমার গোপাল'**।

গোপীদের কি নিষ্ঠা। মথুরায় দ্বারীকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে সভায় ঢুকল। দ্বারী কৃষ্ণের কাছে তাদের লয়ে গেল। কিন্তু পাগড়ি-বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তারা হেঁটমুখ হয়ে রইল। পরস্পর বলতে লাগল, 'এ পাগড়ি-বাঁধা আবার কে! এঁর সঙ্গে আলাপ কল্লে আমরা কি শেষে দ্বিচারিণী হব! আমাদের পীতধরা, মোহনচূড়া-পরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়'! সেই শ্রীকৃষ্ণে গোপীরা একেবারে ডুবে আছেন।

দেখেছ, এদের কি নিষ্ঠা! বৃন্দাবনের ভাবই আলাদা। শুনেছি, দ্বারকার কাছে লোকেরা অর্জুনের কৃষ্ণকে পূজা করে। তারা রাধা চায় না। স্বামীজী বারবার বলছেন, আমরা বৃন্দাবনের কৃষ্ণ চাই না, কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকে চাই। কারণ দেশের জন্য দরকার একটা নূতন আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, তিনি অবতার, তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যেমন তেমনটি বলবেন। স্বামীজী আচার্য, তিনি আমাদের জন্য ওই কথা বলছেন। একজন ভক্ত তখন জিজ্ঞেস করছেন।

ভক্ত –কোন্‌টি ভাল, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি, না প্রেমাভক্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ –ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয় না।

এই জিনিসটাকে আমাদের মাথায় বসিয়ে নিতে হবে –ঈশ্বরে প্রচুর ভালবাসা না এলে প্রেমাভক্তি হয় না, তা নাহলে গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা চলে আসবে। আজকে ধর্মে ধর্মে যে এত মারামারি কাটাকাটি শুধু এই গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতার জন্য হচ্ছে। এদের মধ্যে কিসের প্রেমাভক্তি? প্রেমাভক্তি হলে কেউ কি কারুর গলা কাটে, কারুর ক্ষতি করতে ইচ্ছে হবে? প্রেমাভক্তি যাঁর মধ্যে এসেছে, তিনি তো ঈশ্বর ছাড়া কিছু দেখতেই পাচ্ছেন না। রাবেয়াকে বলা হচ্ছে, 'রাবেয়া, তোমাকে তো কখন শয়তানের নিন্দা করতে দেখি না'? রাবেয়া তখন বলছেন, 'হ্যাঁ, আমারও তো শয়তানের নিন্দা করতে খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু আমার সময় কোথায়; আমার আল্লাকে নিয়ে আমি এত ব্যস্ত যে, শয়তানের চিন্তা করব সেটারই ফুসরৎ পাই না, এরপর আবার নিন্দা করার জন্য সময় দিতে হবে'। কাফেরদের নিয়ে তোমার যে এত চিন্তা হচ্ছে, তার মানেই কিছু একটা গোলমাল আছে তোমার মধ্যে। আর যাই হোক এটাকে কোন ভাবেই প্রেমাভক্তি বলা যায় না।

আর 'আমার' জ্ঞান। 'আমার' জ্ঞান কি রকম?

ঠাকুর উদাহরণ দেওয়ার জন্য আবার একটা খুব প্রচলিত কাহিনীকে নিয়ে আসছেন। **তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বললে, 'ভাই! আমরা সব মারা গেলুম'! একজন বললে, 'কেন? মারা যাব কেন? এস ঈশ্বরকে ডাকি'। আর-একজন বললেন, 'না, তাঁকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে? এস, এই গাছে উঠে পড়ি'**। আমরা ঈশ্বরকে কেন কষ্ট দেব, আপনজনকে কি কেউ কষ্ট দেয়, মা কি নিজের সুবিধার জন্য কখন ছেলেকে কষ্ট দেয়?

ঠাকুর এবার এই ছোট্ট উদাহরণের ব্যাখ্যা করছেন –**যে লোকটি বললে, 'আমরা মারা গেলুম', সে জানে না যে ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছেন। যে বললে, 'এস আমরা ঈশ্বরকে ডাকি', সে জ্ঞানী; তার বোধ আছে যে, ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব করছেন। আর যে বললে 'তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস, গাছে উঠি', তার ভিতরে প্রেম জন্মেছে। তা প্রেমের স্বভাবই এই –আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে**।

এই ভাবেরই পরিপুষ্ট প্রকাশ দেখা আমাদের হিন্দু ধর্মে নাড়ুগোপাল, রামলালার পূজার মধ্যে। এগুলো এত উচ্চমানের কথা যে, মানুষকে কোন ভাবেই বুঝিয়ে ধারণা করানো যাবে না। যাদের মধ্যে প্রচুর ইমোশান অর্থাৎ মাথায় যাদের ছিট আছে, তারা মনে করবে বুঝেছি, এটাই তো আমি চাই, কিন্তু এদের তাতে কোন কাজের কিছু হয় না। সুস্থ মস্তিষ্ক এবং খুব উচ্চমানের ভক্তি না হলে, এই জিনিসগুলিকে বোঝা মুশকিল আর জীবনে লাগানো অত্যন্ত কঠিন।

ঠাকুর বলছেন, **পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা যে, যাকে সে ভালবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে**। ভক্তিশাস্ত্রে বর্ণনা আছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন যাচ্ছেন, শ্রীরাধা তাঁর সূক্ষ্ম শরীরকে কৃষ্ণের পায়ের তলায় রেখে দিচ্ছেন, যাতে পায়ে কাঁটা না ফোটে। এই হচ্ছে ভালবাসা। এই প্রেমাভক্তি হলে তবে গিয়ে ঈশ্বরকে পায়। আজ আমরা এখানেই আমাদের আলোচনা শেষ করছি।